তফসীরে নূরুল কোরআন

অষ্টাদশ পারা

১৮

মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম

অষ্টাদশ খন্ড

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

তফসীরে নূরুল কোরআন

অষ্টাদশ খন্ড

১৮

অষ্টাদশ পারা

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, মাসিক আল-বালাগ, তফসীরকার রেডিও বাংলাদেশ, প্রাক্তন সদস্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বোর্ড অফ গভর্ণরস, সদস্য বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ড, সাবেক ইমাম ও খতীব লালবাগ শাহী মসজিদ এবং বহু দ্বীনি গ্রন্থ প্রণেতা

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রহ.)

আল-বালাগ পাবলিকেশন্স

ঢাকা

تفسير نور القرآن

للعلامة محمد امين الاسلام

الجزء الثمانى عشر

চতুর্থ প্রকাশ ঃ অক্টোবর ২০১০
কার্তিক -১৪১৭
জিলকদ-১৪৩১

প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম
১২/১৭ স্যার সৈয়দ আহমদ রোড
মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭

সর্বস্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণে ঃ নিউ এস. আর. প্রিন্টার্স
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০

হাদীয়া ঃ ৩৫০.০০

প্রাপ্তিস্থান

আল-বালাগ কার্যালয়
১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড,
মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল ঃ ০১৭১৩০১৪৮৮৯

আন-নূর পাবলিকেশন্স
৫২, বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১১৭৩৭২১

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা

গাউসিয়া পাবলিকেশন্স
১১, বাংলাবাজার (ইসলামী টাওয়ার)
ঢাকা-১১০০ ফোন-৯৫৫৮৯১৩

Tafseer-e Nurul Quran (18): By Hazrat Moulana Mohammed Aminul Islam. Published by Al-Balag Publications, 12/17, Sir Sayed Ahmed Road, Mohammedpur, Block-A, Dhaka-1207
Mobile : 0173014889. Price : 300.00 Tk.$ 20

ভূমিকা

পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে সেজদায়ে শোকরানা আদায় করি যে তিনি তফসীরে নূরুল কোরআনের অষ্টাদশ খন্ড পেশ করার তৌফিক দান করেছেন, এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পাকের বিশেষ নেয়ামত এবং অসাধারণ অনুগ্রহ। তাঁর এ নেয়ামতের জন্যে শোকর-গুজারীর সাধ্য আমার নেই, তাই এর জন্যে তাঁর সমীপে তওফিক চাই, এ তৌফিকও আল্লাহ্ পাকের একটি বিরাট নেয়ামত, তাঁর তৌফিক বিনা কেউ কোন কল্যাণকর কাজ করতে পারেনা। বস্তুতঃ দয়াময় আল্লাহ পাকই দয়া করে নেক আমলের তওফিক দান করেন, পুনরায় দয়া করে ঐ নেক আমলের সওয়াবও দান করেন, তিনিই মহান দাতা, তিনিই অনন্ত অসীম দয়াময়।

অগণিত দরুদ ও সালাম রহমতুললিল আলামীন, সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, যাঁর নেক নজরের বরকতে আল্লাহ্ পাক তফসীর নূরুল কোরআন পেশ করার তৌফিক দান করেছেন। যাঁর সৌজন্যে আল্লাহ্ পাকের রহমতের বারিধারা বর্ষিত হচ্ছে অহরহ। হে আল্লাহ্! দরুদ পেশ কর তোমার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি হুকুম এবং হেকমতের নবী, যিনি নবুওয়তের আকাশের সূর্য, যিনি মহান চরিত্র মাধুর্যের অধিকারী, যিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল, যিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, যিনি সমগ্র মানব জাতির জন্যে একমাত্র আদর্শ, তাঁর আল-আওলাদের প্রতি এবং তাঁর সকল সাহাবায়ে কেরামের প্রতিও।

খ্রীষ্টিয় ছয়শ' শতাব্দী মানব জাতির ইতিহাসের এক কলংকময় অধ্যায়। যখন সমগ্র বিশ্ব ছিল গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যখন সারা পৃথিবী মরণাপন্ন মানবতার বিরহ-জ্বালায় ছিল শোকাচ্ছন্ন, যখন পিতা-মাতা তাদের কন্যা সন্তানকে স্বহস্তে করতো সমাধিস্থ। যখন নম্রতা, ভদ্রতা, উদারতা, মহানুভবতা এক কথায় যাবতীয় মানবিক গুণাবলী ছিল বিলুপ্ত, যখন মানুষ ছিল শুধু আকৃতিতে, প্রকৃতিতে ছিল জন্তুর চেয়েও অধম। অজ্ঞতার আঁধার, ধর্মহীনতার ব্যাপ্তি, কুসংস্কার আর পথভ্রষ্টতায় সমগ্র পৃথিবী হয়েছিল চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন, কোথাও ন্যায়-নীতি নেই, ন্যায় বিচার নেই, মানবতা নেই, নৈরাশ্য, নৈরাজ্য ও জুলুম অত্যাচার ছিল সর্বত্র বিরাজমান।

মানবতার এ চরম দূর্দিনে, বিশ্ব মানবের এমনি এক সংকটময় মুহূর্তে আগমন করেছিলেন বিশ্বনবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, স্রষ্টার মহত্তম সৃষ্টি তিনি, তাঁর প্রতি নাজিল হল বিশ্বগ্রন্থ পবিত্র কোরআন। প্রিয়নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব এবং পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে মৃত প্রায় মানব দেহে নব জীবনের স্পন্দন অনুভূত হল। ইতিহাসের ধারা পরিবর্তন হয়ে গেল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভ এবং পবিত্র কোরআনের আলোকে অন্ধকার পৃথিবী আলোয় ঝলমল করে উঠলো। পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণের বরকতে শুধু যে রোগী আরোগ্য লাভ করেছে তাই নয়; বরং যে ছিল রোগী সে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মর্যাদা লাভ করেছে। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম পবিত্র কোরআনের মশাল হাতে নিয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েন এবং জ্ঞানের আলো বিতরণ করেন। সমগ্র বিশ্ববাসী লাভ করে তাঁদের নিকট থেকে সভ্যতার প্রথম সবক, মানবতার তালীম। বিশ্ববাসী বিস্ময়াভিভূত হয়ে পবিত্র কোরআনের আলো গ্রহণ করে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের অনুসরণে অনুপ্রাণিত হয়।

এটি শুধু আমাদের ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাস নয়; বরং ঐতিহাসিক সত্য। পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হবার পূর্বের এবং পরের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই এ সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

আজকের পৃথিবীতে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা বিস্মৃত করা হয়েছে, পুনরায় বর্বরতার যুগ ফিরে এসেছে। পবিত্র কোরআনের শিক্ষা বিবর্জিত এ পৃথিবীতে মানবতার অবমাননা কিভাবে হয় তা আমরা দেখতে পাই বসনিয়া, প্যালেস্টাইন সহ পৃথিবীর আরো বহু স্থানে। বর্তমান অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি পেতে হলে বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধন করতে হলে, বিশ্বনবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের অনুসরণ করতে হবে এবং বিশ্বগ্রন্থ পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার প্রচার-প্রসার এবং প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। পবিত্র কোরআনের আলোকে নিজেকে আলোকিত করতে হবে এবং দিকে দিকে এই আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। শুধু এভাবেই আসবে শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সার্বিক কল্যাণ।

মূলতঃ এ উদ্দেশ্যেই তফসীরে নূরুল কোরআনের সাধনা শুরু হয় প্রায় এক যুগ পূর্বে।

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ পাকের মহান দরবারে অগণিত শোকর যে তিনি আজ এ মহাগ্রন্থের অষ্টাদশ খন্ড পেশ করার তৌফিক দান করেছেন। হে আল্লাহ! কবুল কর তফসীরে নূরুল কোরআনকে এবং তা সম্পূর্ণ করার তৌফিক দান কর, হে আল্লাহ! তোমার নৈকট্য লাভের তৌফিক দান কর। আমাদের সকলের প্রতি তোমার রহমত নাজিল কর, আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামীন

বিনীত

মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

১৭/১১/৯০

সূচী পত্র

১৮ খন্ড

১।	সূরা আল মুমেনুন প্রসঙ্গে	১
২।	পরম সাফল্য	৫
৩।	মানব সৃষ্টির ইতিকথা	২০
৪।	আল্লাহ পাকের কয়েকটি বিশেষ নেয়ামত	২৬
৫।	হযরত নূহ (আঃ)-এর নাম	৩৪
৬।	মানব জীবনের উদ্দেশ্য	৪৫
৭।	আয়াতের মর্মকথা	৫৬
৮।	কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী	৬০
৯	সুখ-সম্পদ নিশ্চিন্ত হওয়ার উপকরণ নয়	৬১
১০।	প্রকৃত মুমেনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য	৬৩
১১।	নেককার মুমেনদের শুভ পরিণতির ঘোষণা	৬৫
১২।	আয়াতের মর্মকথা	৭৩
১৩।	তওহীদের প্রমাণ	৮৭
১৪।	প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা	৯৫
১৫।	সবর অবলম্বন করুন	৯৫
১৬।	জীবন সায়াহ্নে মানুষের অবস্থা	৯৯
১৭।	আলমে বরজখের বিবরণ	১০০
১৮।	একটি সন্দেহ ও তার জবাব	১০৫
১৯।	আমল পরিমাপের প্রক্রিয়া	১০৭
২০।	মোমেনের নেক আমলের পাল্লার বিভিন্ন স্তর	১০৯
২১।	কাফেরদের শোচনীয় পরিণতি	১১০
২২।	কাফেরদের শাস্তির ঘোষণা	১১১

২৩। উপহাসকারীদের শাস্তি ১১৭
২৪। পবিত্র কোরআনের বর্ণনা শৈলীর বৈশিষ্ট্য ১২২
২৫। এ আয়াত সমূহের ফজিলত ১২৪
২৬। সূরায়ে নূর প্রসঙ্গে ১২৫
২৭। পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক ১২৬
২৮। আলোচ্য সূরার মূল বক্তব্য ১২৭
২৯। ব্যাভিচারের শাস্তি ১৩১
৩০। পবিত্র কোরআনের বর্ণনা শৈলীর বৈশিষ্ট্য ১৩১
৩১। কঠোর সতর্কবাণী ১৩৩
৩২। বিভিন্ন অপরাধের শাস্তির ব্যাপারে ইমামগণের অভিমত ১৩৪
৩৩। ব্যাভিচারের শাস্তি সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)-এর ঘোষণা ১৩৬
৩৪। হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর যুগে রজমের শাস্তি ১৩৬
৩৫। ব্যাভিচারের শাস্তির তাৎপর্য ১৩৮
৩৬। হারানো দিনের দৃশ্য ১৩৯
৩৭। শানে নজুল ১৪৩
৩৮। আয়াতের শানে নজুল ১৪৪
৩৯। ইমামগণের অভিমত ১৪৫
৪০। শানে নজুল ১৪৮
৪১। অপবাদের ঘটনা ১৫৫
৪২। মুমেন-জননী হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর অবস্থা ১৫৮
৪৩। আত্মরক্ষার পন্থা ১৬৫
৪৪। শয়তানের অনুগামী হয়োনা ১৭৬
৪৫। শানে নজুল ১৭৯
৪৬। উদারতা মহানুভবতার আদর্শ গ্রহণের নির্দেশ ১৮০
৪৭। এ উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তি ১৮২
৪৮। আয়াত সম্পর্কে কয়েকটি কথা ১৮২

৪৯। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য ১৯০
৫০। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বিশেষ ফজিলত ১৯১
৫১। যে দোয়ার বরকতে হযরত আয়েশার (রাঃ) কষ্ট দূর হয় ১৯৩
৫২। শানে নজুল ১৯৫
৫৩। কয়েকটি জরুরী বিষয় ২০১
৫৪। শানে নজুল ২০৩
৫৫। তওবা ও এস্তেগফার ২১৬
৫৬। পবিত্র কোরআনের বৈশিষ্ট্য ২৩৫
৫৭। নূরের তাৎপর্য্য ২৩৮
৫৮। আয়াতের মর্মকথা ২৪০
৫৯। হেদায়েত আল্লাহ পাকের দান ২৪২
৬০। আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে কিছু কথা ২৪৪
৬১। নূরে মোহাম্মদীর বিবরণ ২৪৪
৬২। আয়াতের অন্য একটি ব্যাখ্যা ২৫১
৬৩। এ আয়াতের আরও একটি ব্যাখ্যা ২৫২
৬৪। মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ)-এর ব্যাখ্যা ২৫৩
৬৫। মহিলাদের উত্তম মসজিদ তাদের গৃহ ২৫৮
৬৬। এবাদত ও তেজারত পরস্পর বিরোধী নয় ২৬০
৬৭। আয়াত সম্পর্কে দু'টি কথা ২৬৮
৬৮। হযরত ওমর (রাঃ)-এর 'ফারুক' উপাধি লাভ ২৭৯
৬৯। মোনাফেকরাই জালেম ২৮০
৭০। মোমেনের কর্তব্য ২৮৫
৭১। কল্যাণের পথ ২৮৬
৭২। উম্মতে মোহাম্মদীয়ার বৈশিষ্ট্য ২৮৯
৭৩। মুসলমানদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার সুসংবাদ ২৯২
৭৪। যে ঘোষণা ঘটনায় পরিণত হয় ২৯৮

৭৫।	আয়াতের মর্মকথা	৩০২
৭৬।	সালামের মাহাত্ম	৩১২
৭৭।	শানে নজুল	৩১৬
৭৮।	সূরায়ে ফোরকান প্রসংগে	৩২৩
৭৯।	প্রিয়নবী (দঃ) একমাত্র কামেল বন্দা	৩২৬
৮০।	প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা	৩৩৮
৮১।	সবর অবলম্বনের তাগিদ	৩৪৮

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

بسم الله الرحمٰن الرحيم

نحمده ونصلى علىٰ رسوله الكريم

তফসীরে নূরুল কোরআন

অষ্টাদশ খন্ড　　　　অষ্টাদশ পারা

সূরা আল মুমেনুন

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াতঃ ১১৮ রুকুঃ ৬

সূরা আল মুমেনুন প্রসঙ্গে

ইমাম কুরতবী (রঃ) লিখেছেন, এ সূরা মক্কায় নাজিল হয়েছে। এ ব্যাপারে সকলেই একমত।

নামকরণ

যেহেতু এ সূরার প্রারম্ভে মোমেনগণের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে আল মুমেনুন।

মোমেনগণের যে বৈশিষ্ট্য এ পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, মূলতঃ এ সবই হলো ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা।[১]

এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, সূরায়ে মুমেনুন মক্কায় নাজিল হয়েছে।

নেসায়ী, তিরমিজী ও মসনদে আহমদে হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ওহী নাজিল হত, তখন মধু মক্ষিকার আওয়াজের ন্যায় আওয়াজ শ্রুত হত। একবার এমন অবস্থাই

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬০

হলো। কিছুক্ষণ পর যখন ওহী নাজিল হলো, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কেবলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে এ দোয়া করলেনঃ

اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثرنا وارض عنا وارضنا

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমাদেরকে অধিক পরিমাণে দিও, আমাদেরকে কম দিওনা, আমাদেরকে সম্মানিত করো, অপমানিত করোনা. আমাদেরকে নেয়ামত দান কর. বঞ্চিত করোনা, অন্যদের উপর আমাদের পছন্দ কর, আমাদের উপর অন্যদের পছন্দ করোনা, আমাদের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট থাক, আর আমাদেরকে খুশি করে দিও"। এরপর তিনি এরশাদ করেছেনঃ "আমার প্রতি দশটি আয়াত নাজিল হয়েছে, যে এই দশটি আয়াতে বর্ণিত গুণাবলী অর্জন করলো সে জান্নাতী হয়ে গেল"। এরপর তিনি এই সূরার প্রথম দশটি আয়াত তেলাওয়াত করেন।[১]

ইমাম বোখারী (রঃ) আদাবুল মুফরাদে, নেসায়ী, এবনুল মুনজের, হাকেম, এবনে মরদবিয়া, বায়হাকী প্রমুখ এজিদ এবনে বাবনুসের বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, আমরা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান পূতঃপবিত্র চরিত্র মাধুর্যের বর্ণনা দিন। তিনি বললেন, তাঁর চরিত্র মাধুর্য হলো কোরআনে করীম। এরপর তিনি বললেন, তোমরা কি সূরা মুমেনুন পাঠ কর? এরপর তিনি এ সূরার প্রথম দশটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন। এরপর বললেন, এ ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চরিত্র মাধুর্যের বৈশিষ্ট্য।

এবনে জরীর তাবারী (রঃ) লিখেছেন, ইমাম কাতাদা (রঃ) হযরত কা'ব (রাঃ) এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, আল্লাহ পাক শুধু তিনটি বস্তু স্বীয় দস্তে মোবারকে সৃষ্টি করেছেন। (১) আদম (আঃ) কে স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন। (২) তৌরাত গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। (৩) জান্নাতে আদন। এরপর জান্নাতকে বলেছেন, তুমি কথা বল, জান্নাত তখন এই সূরার প্রথম আয়াত সমূহ পাঠ করেছে।

আল্লামা সয়ুতী (রঃ) হযরত আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে এ বর্ণনার আংশিক উল্লেখ করেছেন।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-১
তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-১

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরার শেষে নেক আমল করার নির্দেশ ছিল। এরশাদ হয়েছেঃ
وَافْعَلُوا الْخَيْرَ এর শুভ পরিণতি স্বরূপ সাফল্য লাভের সুসংবাদ ছিল।
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ অর্থাৎ হয়তো তোমরা সাফল্য মন্ডিত হবে। আর এ আয়াতের শুরুতেই সেই ভাগ্যবান লোকদের বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, যারা জীবন-সংগ্রামে সাফল্য মন্ডিত হয়েছে।[১]

তাই এরশাদ হয়েছেঃ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانٍ عَشْرَةَ آيَةً وَسِتُّ رُكُوعَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ○

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ① الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
خَاشِعُونَ ② وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ③ وَالَّذِينَ هُمْ
لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ④ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ⑤ إِلَّا عَلَىٰ
أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ⑥ فَمَنِ ابْتَغَىٰ
وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ⑦ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ
وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ⑧ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ⑨
أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ⑩ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ⑪

তরজমা

(১) অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মোমেনগণ।

(২) যারা তাদের নামাজে বিনয় প্রকাশ করতে থাকে।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬০

(৩) যারা অযথা বিষয় থেকে বিরত থাকে।

(৪) যারা যাকাত আদায় করে থাকে।

(৫) যারা নিজেদের কামনার স্থানকে সংযত রাখে।

(৬) তবে তাদের পত্নি অথবা বাঁদী দাসীদের বেলায় নয়, এতে তারা নিন্দনীয় হবেনা।

(৭) কেউ যদি এদের ব্যতীত অন্যকে কামনা করে, তবে তারা হবে সীমালংঘনকারী।

(৮) এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।

(৯) এবং যারা নিজেদের নামাজের ব্যাপারে যত্নবান থাকে।

(১০) তারাই হবে উত্তরাধিকারী।

(১১) তারা হবে উত্তরাধিকারী জান্নাতুল ফেরদৌসের, যাতে তারা চিরদিন বাস করবে।

তফসীরুল কোরআন

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ

নিশ্চয় সে মোমেনগণই জীবন-সাধনায় সফলকাম হয়, যারা তাদের নামাজে ভীত-সন্ত্রস্ত এবং বিনয়াবনত অবস্থায় হাজির হয়।

শানে নজুল

হাকেম হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাজের অবস্থায় কখনও আসমানের দিকে দেখতেন, তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আর নামাজের অবস্থায় আসমানের দিকে তাকাননি।

এবনে মরদবিয়ার সূত্রে বর্ণিত আছে যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাজের অবস্থায় আসমানের দিকে এদিক সেদিক তাকাতেন, তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাজিল করলেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম নামাজের অবস্থায় আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখতেন। তখন

এ আয়াত নাজিল হয়। এরপর থেকে তাঁরা সেজদার স্থানে নজর করতেন।

এবনে আবি হাতেম এবনে সিরিনের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে সাহাবায়ে কেরাম নামাজের অবস্থায় আসমানের দিকে চোখ তুলে দেখতেন, তখন আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত নাজিল করলেন।

الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ

অর্থাৎ সে মোমেনগণই সফলকাম হবে, যারা তাদের নামাজে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় হাজির হয়।[১]

افلاح শব্দটি فلاح থেকে নিস্পন্ন। আর فلاح অর্থ সাফল্য। কোন প্রকার ভয়ের বস্তু থেকে নাজাত পাওয়া, কল্যাণকর কাজে ব্যাপৃত হওয়া। فلاح বা সাফল্য দু'প্রকার হতে পারে। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের সাফল্য এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সাফল্য। আলোচ্য আয়াতে আখেরাতের সাফল্যই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

পরম সাফল্য

মানব জীনের পরিপূর্ণ সাফল্য হলো, সর্ব প্রকার আজাব থেকে নাজাত লাভ করা ও কেয়ামতের কঠিন মুহূর্তে, পুলসেরাত অতিক্রমকালে এক কথায় সর্ব প্রকার আজাব থেকে নাজাত লাভই হলো পরম সাফল্য। এই নাজাতের পর জান্নাতে প্রবেশ করা, পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভে ধন্য হওয়া এবং আল্লাহ পাকের দীদার নসিব হওয়া- এ সবই হলো মানব জীবনের পরম বা পরিপূর্ণ সাফল্য।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, পরিপর্ণ সাফল্যের জন্যে ঈমান পূর্বশর্ত। কেননা, ঈমান ব্যতীত কোন সৎ কাজই আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য হয়না। অতএব যে প্রকৃত মোমেন সে সফলকাম হয়, অবশ্য অন্তরে আল্লাহ পাকের প্রতি যে বিশ্বাস রয়েছে তার বহিঃপ্রকাশ হতে হবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কৃত আমলে। এজন্যে এরশাদ হয়েছেঃ

الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝٢

সফলকাম সে মোমেনগণ যারা তাদের নামাজে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় হাজির হয়।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-৪
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৬১

خشعون শব্দটি خشوع থেকে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) خشعون শব্দটির তরজমা করেছেন خائفون অর্থাৎ ভীত সন্ত্রস্ত। আর কেউ কেউ এর তরজমা করেছেন, ساكنون অর্থাৎ যারা নামাজের মধ্যে ধীর স্থির থাকে।

তফসীরকারগণ বলেছেন, কারো সম্মুখে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় হাজির হওয়া এবং তাঁর সম্মানে এবং ভয়ে সম্পূর্ণ ভীত ও নীরব থাকার নামই হলো "খুশু"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে خشعون শব্দ দ্বারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা নামাজে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ভীত-সন্ত্রস্ত এবং বিনয়াবনত অবস্থায় হাজির হয়।

হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় বিদ্যমান রয়েছে, তাদেরকে خشعون বলা হয়েছে।

আর তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, যারা বিনয়ী, যারা কাকুতি-মিনতি করে, তারাই হলো خشعون

আর তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, যারা নিচের দিকে নজর রাখে এবং যারা নিজের আওয়াজকে ছোট করে এবং বিনীত হয়ে দরবারে এলাহীতে হাজির হয় خشعون তারাই।

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, নামাজে এদিক সেদিক না তাকানই হলো خشوع

আর সায়ীদ এবনে জুবায়ের (রঃ) বলেছেন, নামাজে এমন অবস্থায় দন্ডায়মান হওয়া যে ডানে বাঁয়ে কে আছে তার খবরও না রাখা, আর ডানে বাঁয়ে দৃষ্টিপাত না করা, এরই নাম خشوع

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অথ সেজদার স্থান থেকে দৃষ্টিকে না সরানো।

বর্ণিত আছে, হযরত আবুবকর (রাঃ) যখন নামাজে দন্ডায়মান হতেন তখন মনে হতো যে একটি মৃত শুস্ক বৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে, অথবা একটি প্রাণহীন কাষ্ঠখন্ড দন্ডায়মান রয়েছে।

হযরত আলী (রাঃ) যখন নামাজের জন্যে অজু করতেন, তখন তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থর থর কম্পমান থাকতো। অজু করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের ভয়ে তাঁর চেহারার বর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে যেত। মোট কথা, যখন অন্তরে خشوع থাকে তথা আল্লাহর ভয় বিদ্যমান থাকে, আর বন্দা এ সত্য উপলব্ধি করে যে সে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের

মহান দরবারে হাজির হয়েছে, তিনি তাকে দেখছেন, সে উপলব্ধিকেই خشوع বলা হয়। এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর একটি মানদন্ড নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

ان تعبد الله كانک تراه فان لم تكن تراه فانه يراك

অর্থাৎ তুমি এভাবে আল্লাহ পাকের এবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ, যদি তোমার এমন অবস্থা না হয় তথা যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পার তবে একথার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখ যে তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, নামাজে خشوع হলো, মনের একাগ্রতা। আল্লাহ পাকের দিকে পরিপূর্ণভাবে মনোনিবেশ করা, অন্য কোন দিকে মন আকৃষ্ট না হওয়া আর রসনা দ্বারা যে শব্দগুলো উচ্চারিত হয় তার মর্মবাণীর প্রতি লক্ষ্য রাখা, এদিক সেদিক দেহ মনের পরিবর্তন না হওয়া, ডানে বাঁয়ে দৃষ্টিপাত না করা, নামাজ বিরোধী কোন প্রকার কাজ না করা।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেছেন, নামাজে خشوع এর তাৎপর্য হলো, পরিপূর্ণ এখলাস বা আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে দন্ডায়মান হওয়া, পরিপূর্ণ একীন এবং পূর্ণ একাগ্রতার সঙ্গে হাজির হওয়া।

বিখ্যাত আরবী অভিধাণ গ্রন্থ কামুসে خشوع শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে বিনয়, خشوع এমন একটি অবস্থায় নাম যা দেহ মনের সাথে সম্পর্কিত। মন আল্লাহ পাকের ভয়ে-ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা বিনয় প্রকাশ পাবে। স্বর হবে নিম্নে আর চক্ষু থাকবে নিচের দিকে নিবদ্ধ। আর সারা দেহ ধীর স্থির থাকবে, আর বিনয় প্রকাশ পাবে সর্বাঙ্গ দ্বারা।

হযরত আবুজর (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যতক্ষণ বন্দার মন আল্লাহ পাকের দিকে নিবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ পাক বন্দার দিকে রহমতের নজরে দেখেন। পক্ষান্তরে, যখন বন্দার মন এদিক সেদিক চলে যায়, তখন আল্লাহ পাক তাঁর রহমতের নজর সরিয়ে নেন। (আহমদ, আবুদাউদ, নেসায়ী, দারেমী)

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করেছি যে, নামাজের মধ্যে মন এদিক সেদিক চলে যায়, এর কারণ কি? তখন তিনি এরশাদ করেছেন, এটি শয়তানের আক্রমণ, শয়তান বন্দাকে নামাজ থেকে হঠাৎ সরিয়ে নেয়।

হযরত আনাস এবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ লোকেরা নামাজে রত অবস্থায় আসমানের দিকে চোখ কেন তোলে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মানুষের এমন অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত, নতুবা তাদের দর্শন শক্তি ছিনিয়ে নেয়া হতে পারে। (বগভী)

মুসলিম ও নেসায়ী হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন, এরশাদ হয়েছেঃ নামাজে দোয়ার সময় আসমানের দিকে চক্ষু উত্তোলন করা থেকে লোকদের বিরত হওয়া উচিত নতুবা তাদের দেখার শক্তি ছিনিয়ে নেয়া হতে পারে।

হযরত জাবের এবনে সামুরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, নামাজের অবস্থায় আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করা থেকে মানুষের বিরত থাকা উচিত, এমন যেন না হয় যে তাদের দেখার শক্তি ফিরে না আসে। (এবনে মাজা, মুসলিম, আবু দাউদ, আহমদ)

হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে নামাজ রত অবস্থায় তার দাড়ির সাথে খেলা করে (দাড়ি নাড়াচাড়া করে)। তখন তিনি এরশাদ করলেন, যদি তার অন্তরে خشوع থাকতো তবে তা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারাও প্রকাশ পেত।

হযরত আবুবকর (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমরা মোনাফেকী খুশু থেকে আত্মরক্ষা করি। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, মোনাফেকী খুশু কেমন হয়? তিনি এরশাদ করলেন, দেহে খুশু এবং মনে মোনাফেকী (অর্থাৎ মন অন্য দিকে ব্যস্ত, আর প্রকাশ্যে দেহ নামাজে মশগুল হওয়াকে মোনাফেকী খুশু বলা হয়)।

মুজাহেদ (রঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে জুবায়ের যখন নামাজে দন্ডায়মান হতেন, তখন মনে হতো একটি কাষ্ঠ নির্মিত মূর্তি স্বস্থানে দন্ডায়মান রয়েছে। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর নামাজের অবস্থাও অনুরূপ ছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কন্যা হযরত আসমা (রাঃ) বর্ণনা করেন, তাঁর মাতা হযরত উম্মে রোমান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) আমাকে নামাজের অবস্থায় এদিক সেদিক ঝুকতে দেখে এমন ধমক দিয়েছেন যে আশংকা ছিল যে আমি নামাজ ছেড়ে দেই। এরপর তিনি বলেন যে, আমি নিজে শুনেছি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নামাজে দন্ডায়মান হয়, তখন তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শান্ত ও ধীর স্থির থাকতে হবে।

ইহুদীদের ন্যায় এদিক সেদিক করবে না। নামাজে হাত পা শান্ত থাকা নামাজের অঙ্গ। হযরত আবুল আহওয়াস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নামাজে দন্ডায়মান হয় সে যেন পাথর খন্ড না সরায়। (সে যুগে মসজিদে নব্বীতে পাথর খন্ড পড়ে থাকত)। কেননা, আল্লাহ পাকের রহমত তার সম্মুখেই থাকে (যদি সে নামাজের মধ্যে এদিক সেদিক মন দেয়, তবে আল্লাহ পাকের রহমত তার নিকট থেকে দূরে সরে যাবে)।

বগভী, আহমদ, নেসায়ী, এবনে মাজা এই হাদীস হযরত আবুজর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, তুমি সেজদার স্থানে তোমার দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখবে। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে একথাও বর্ণিত আছে, নামাজে এদিক সেদিক দেখা থেকে আত্মরক্ষা কর, কেননা নামাজের মধ্যে এদিক সেদিক দেখা নামাজের ধ্বংসের কারণ হয়। একান্ত মজবুরী হলে নফলে এমন করতে পারে, ফরজে নয়।

ইমাম রাজী (রঃ) খুশু'র ব্যাখ্যায় বলেছেন, তত্ত্বজ্ঞানীগণ এর ব্যাখ্যায় একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাদের মধ্যে কারো কারো মত হলো, এটি অন্তরের কাজ। নামাজীর অন্তরে আল্লাহ পাকের প্রতি ভয়-ভীতি থাকার নামই "খুশু"। আর কারো কারো মতে, এটি অঙ্গ-প্রতঙ্গের কাজ। অর্থাৎ নামাজে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধীর স্থির থাকবে। এদিক সেদিক তাকাবে না। আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার উভয় মতকে একত্রিত করেছেন। অর্থাৎ "খুশু" দেহ ও মন উভয়েরই কাজ। মন যেমন ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে, এর পাশাপাশি দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধীর স্থির থাকবে অর্থাৎ মনে যে ভয়-ভীতি বা বিনয় রয়েছে তার বহিঃপ্রকাশ হতে হবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে। আর এ অবস্থাকেই "খুশু" বলা হয়।

হাসান বসরী (রঃ) এবং এবনে সিরিন (রঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বে মুসলমানগণ নামাজের অবস্থায় আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখতেন। এমনকি, কখনও স্বয়ং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও এমন করেছেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর তিনি আর নামাজের অবস্থায় আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করেননি।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৬৩-৬৫
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-৩-৪

এখন প্রশ্ন হতে পারে তবে কি নামাজে খুশু ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য?

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, আমাদের মতে তা ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য, কোরআনে করীমেই রয়েছে এর দলীল। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

"তারা কি কোরআনে করীম সম্পর্কে চিন্তা করেনা? নকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ রয়েছে"? আর কোন বিয়য়ে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করা ব্যতীত চিন্তা চর্চা অচিন্তনীয়।

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

"এবং কোরআন পাঠ কর ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দর ভাবে"। আর এ অবস্থা খুশু ব্যতীত সম্ভব নয়। আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেছেনঃ

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

"এবং তোমরা নামাজ আদায় কর আমার স্মরণের জন্যে"। আর যে ব্যক্তি নামাজের অবস্থায় আল্লাহ পাককে স্মরণ করে তথা তাঁর স্মরণে তন্ময় থাকে তার নামাজই খুশু'র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। এমনিভাবে আল্লাহ পাক আরও এরশাদ করেছেনঃ

وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

"আর তোমরা গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা"।

অতএব, যার নামাজে "খুশু" থাকেনা সে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। অন্য একখানি আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, কি অবস্থা হলে নামাজে "খুশু" আছে বলে প্রমাণিত হবে,

حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

অর্থাৎ নামাজের অবস্থায় তোমরা যা মুখে উচ্চারণ করছো তা যদি জানতে পার, গাফলতের অবস্থায় যেন কোন কিছু উচ্চারিত না হয়। এ অবস্থাকে "খুশুর" মানদন্ড বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীস বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, তিনি এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তির নামাজ তাকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখেনা, সে আল্লাহ পাকের দরবার থেকে দূরে সরে যায়। কেননা, যে ব্যক্তি

গাফেল অবস্থায় নামাজ আদায় করে তার নামাজ তাকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখেনা।

অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কত লোক নামাজে দন্ডায়মান হয় কিন্তু তার দন্ডায়মান হওয়ায় ক্লান্তি ব্যতীত সে কিছুই পায়না।

ইমাম গাজ্জালী (রঃ) লিখেছেন, নামাজী ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাথে চুপে চুপে কথা বলে। কিন্তু যদি নামাজে "খুশু"র অভাব হয় তথা যদি গাফলতের অবস্থায় নামাজ হয় তবে তাতে আল্লাহ পাকের দরবারে চুপে চুপে কথা বলার বা মুনাজাত করার কথা চিন্তাও করা যায় না। এর দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে নামাজে "খুশু" থাকা একান্ত জরুরী।[১]

মোমেনদের মধ্যে যারা জীবন-সাধনায় সফল হয়, তাদের গুণাবলীর মধ্যে নামাজের উল্লেখ সর্ব প্রথম করা হয়েছে। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, মোমেনের জীবনে নামাজের গুরুত্ব সর্বাধিক। আর সেই নামাজ হতে হবে গাফলতমুক্ত "খুশু" বিশিষ্ট।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন,"খুশু" ব্যতীত নামাজ শুদ্ধ হয় কি-না এ সম্পর্কে তাদের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। তবে নামাজ কবুল হওয়ার জন্যে "খুশু" থাকা অনিবার্য শর্ত।

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝٣

আর যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে, অর্থাৎ যারা অহেতুক কথা বা কাজ থেকে বিরত থাকে তারা জীবন-সাধনায় সফলকাম হয়।

তফসীরকার আতা (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের اللغو শব্দ দ্বারা শেরক উদ্দেশ্য করা হয়েছে অর্থাৎ যারা শেরক থেকে দূরে থাকে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো গুণাহ ও নাফরমানীর কাজ, অর্থাৎ যারা যাবতীয় পাপাচার পরিহার করে চলে, তারা জীবন-সংগ্রামে সফলকাম হয়।

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-৭৭
তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৬৯৫

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, যে কাজ বা যে কথা আখেরাতের জীবনে উপকারী হবে না اللغو শব্দ দ্বারা তাই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

অতএব, যারা শেরক থেকে, যাবতীয় পাপকার্য থেকে এবং আখেরাতের ক্ষতিকর কাজ থেকে বিরত থাকে, অহেতুক কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকে তারাই জীবন-সাধনায় সফলকাম হবে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হলো কাফেরদের মোকাবেলায় যারা গালি দেয়না, বরং গাল-মন্দ পরিহার করে চলে, এ বাক্য দ্বারা তাদেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[১]

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ﴿٤﴾

"যারা যাকাত আদায় করে থাকে"।

আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে এর অর্থ হলো, যারা নিয়মিত যাকাত আদায় করতে থাকে। অর্থ-সম্পদ আল্লাহ পাকেরই দান, এই দানের পবিত্রতা অর্জনের জন্যেই প্রবর্তন করা হয়েছে যাকাতের বিধান। আর এ যাকাতের মাধ্যমে সমাজের দারিদ্র-প্রপীড়িত মানুষের ব্যাপারে দায়িত্ব পালনেরও সুযোগ আসে।

আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে زكوة অর্থ হলো, নেক আমল অর্থাৎ যারা নিয়মিত নেক আমল করে তাদের জীবন-সাধনাই হয় সার্থক, সুন্দর।[২]

যেমন, কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا

"নিশ্চয় সে সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পবিত্র করেছে"।

এমন অবস্থায় মানুষের দৈহিক আর্থিক এক কথায় সর্ব প্রকার পবিত্রতা অর্জনই হবে এর অর্থ যেমন, অন্য আয়াতেও আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি তাদের অর্থ-সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, যা

১। তফসীরে তবরী, খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-৪

২। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-৫

তাদেরকে পবিত্র করবে এবং তাদেরকে সংশোধন করবে। আলোচ্য আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। যাঁরা একথা বলে যে যাকাতের বিধান মদীনা শরীফে প্রবর্তন করা হয়েছে, তাঁদের জবাব দিয়েছেন বিখ্যাত তফসীরকার আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ)। তিনি বলেছেন, প্রকৃত অবস্থা এই যে যাকাত মক্কা শরীফেই ফরজ বলে ঘোষিত হয়, তবে তার নিয়ম-কানুন হিজরতের পর মদীনা শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝٥

"যারা নিজেদের কামনার স্থানকে হেফাজত করে"।

অর্থাৎ যারা নিজেদের স্ত্রী বা বাঁদীদের ব্যতীত আর কারো সাথে কামাচারে লিপ্ত হয়না। কামাচারের জন্যে শরীয়ত যে বিধান পেশ করেছে, কখনও তার বরখেলাফ করেনা, তথা ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়না, তারাই জীবন-সাধনায় সফলকাম হয়।

فَمَنِ ابْتَغَىٰ

কিন্তু যারা শরীয়তের এ কঠোর নির্দেশ সত্ত্বেও ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়, তারাই সীমা লংঘনকারী, তাদের শাস্তি অবধারিত, তাদের জীবন-সাধনা ব্যর্থ। কেননা, তাদের কর্ম নিন্দনীয়, ঘৃণ্য এবং তাদের দেহ মন অপবিত্র। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুতয়াহ বৈধ ছিল, কোন লোক যদি সফরে থাকতো, কোন শহরে উপস্থিত হতো, তবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে বিবাহ করে নিত, যাতে করে সফরের সময়ে তার দ্বারা খেদমত নিতে পারে, সেই স্ত্রী তার খাবার তৈরী করতো, তার আসবাপত্রের হেফাজত করতো।

কিন্তু যখন আলোচ্য আয়াত إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ নাজিল হলো, তখন মুতয়াহ-বিবাহ হারাম হয়ে গেলো (তিরমিজী শরীফ)। শুধু শিয়া ফেরকা এ বাতিল প্রথাকে বৈধ মনে করে।[১]

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝٨

"এবং যারা আমানত এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে থাকে"।

অর্থাৎ যারা কারো আমানতে খেয়ানত করেনা, যদি কেউ তাদেরকে বিশ্বাস করে স্বীয় ধন-সম্পদ তাদের নিকট আমানত রাখে, তবে তারা তাতে বিশ্বাসঘাতকতা

১। মুতয়াহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, তফসীরে নূরুল কোরআন, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫-৭।

করেনা। একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মোনাফেকদের তিনটি চিহ্ন রয়েছে। (১) যখন কথা বলে তখন মিথ্যা কথা বলে, (২) যখন কোন বিষেয়ে অঙ্গীকার করে তখন বরখেলাফ করে, (৩) যখন তার নিকট আমানত রাখা হয় তখন খেয়ানত করে।

আমানত সম্পর্কে কোরআনে করীমেও বিশেষ তাগিদ রয়েছে।

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا (সূরা নেছা)

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক আদেশ দিতেছেন যে তোমরা আমানতকারীর আমানত ফিরিয়ে দাও"। আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ (সূরা আল-এমরান)

"এবং যে ব্যক্তি খেয়ানত করেছে, সে কেয়ামতের দিন খেয়ানত করা বস্তু নিয়ে হাজির হবে"। আরও এরশাদ হয়েছেঃ

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ

(সূরা বাকারা)

"যদি তোমাদের কোন ব্যক্তি কারো নিকট কিছু আমানত রাখে, তবে আমানত গ্রহীতা ব্যক্তি যেন আমানত করা বস্তু যথারীতি ফেরত দেয়। আর সে যেন তার প্রতিপালককে ভয় করে"।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমানতদারীর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে বলেছেন, মোমেনের প্রকৃতিতে সকল গুণাহই থাকতে পারে, কিন্তু আমানতে খেয়ানত ও মিথ্যা কথা মোমেনের সীমানার অনেক দূরে।

হযরত হাসান (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, দাগাবাজ ও আমানতে খেয়ানতকারীর স্থান দোজখে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমানতদারীর গুণ অর্জনের জন্যে কত, গুরুত্বারোপ করতেন তা তাঁর একটি কথা দ্বারা বোঝা যায়। তিনি প্রায় তাঁর প্রত্যেকটি ভাষণে যে কথাটি বলতেন তা হলোঃ

الا لا ايمان لمن لا امانة لو لا دين لمن لا عهد له

"সাবধান! যার মধ্যে আমানতদারী নেই, তার মধ্যে ঈমানও নেই, আর যে ব্যক্তি

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনা, তার মধ্যে দ্বীনও নেই"।

এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ

অর্থাৎ যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেনা।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত عهد ওয়াদা, অঙ্গীকার দু' প্রকার হয়।

সেই অঙ্গীকার যা আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের থেকে গ্রহণ করেছেন, আর বন্দাগণ সেই অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে। যেমন, নামাজ রোজা ও অন্যান্য সকল এবাদত। আর দ্বিতীয় অঙ্গীকর হলো, যা মানুষ মানুষের সঙ্গে করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে উভয় প্রকার অঙ্গীকর রক্ষা করা প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। তবে শর্ত হলো, কোন পাপকার্য তথা আল্লাহর নাফরমানীর অঙ্গীকার হবেনা।

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝٩

"এবং যারা নিজেদের নামাজের ব্যাপারে যত্নবান থাকে"।

অর্থাৎ যারা যথা নিয়মে যথা সময়ে তথা সঠিকভাবে নামাজ আদায় করে, নামাজের ব্যাপারে কোন প্রকার গাফলত করেনা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়, আল্লাহ পাকের দরবারে সবচেয়ে প্রিয় আমল কি? তখন তিনি এশাদ করেন, সঠিক সময়ে নামাজ আদায় করা। প্রশ্ন করা হয়, এরপর কি? তিনি এরশাদ করেন, পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করা। জিজ্ঞাসা করা হয়, এরপর কি? তিনি এরশাদ করেন, আল্লাহর রাহে জেহাদ করা। (বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)

হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নিজে শুনেছি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন সর্ব প্রথম নামাজের হিসাব হবে, যদি নামাজ ঠিক হয়ে যায় তবে বন্দা সফলকাম হবে। আর যদি নামাজের হিসাব ঠিক না হয়, তবে বন্দার জীবন-সাধনা ব্যর্থ হয়। যদি ফরজ নামাজ আদায়ের ব্যাপারে ত্রুটি পাওয়া যায় তবে করুণাময় আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, আমার বন্দার নফল এবাদতের প্রতি লক্ষ্য কর। যদি কিছু নফল এবাদত থাকে, তবে তা দ্বারা ফরজের যে ত্রুটি রয়েছে তা পূর্ণ করা হবে। এরপর

অন্যান্য আমলের একই অবস্থা হবে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এরপর যাকাতের হিসাব হবে। এভাবেই সমস্ত আমলের হিসাব হবে। (আবু দাউদ)

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, সূরার শুরুতেও নামাজের কথা বলা হয়েছে, আর সফলকাম মোমেনদের গুণাবলীর বিবরণে সর্বশেষ কথাও নামাজের ব্যাপারেই রয়েছে। তবে পার্থক্য এই, প্রথম আয়াতে এরশাদ হয়েছে নামাজে "খুশু" থাকতে হবে তথা নামাজীর অন্তরে ভয়-ভীতি এবং বিনয় থাকতে হবে। আর এ আয়াতে সঠিকভাবে নামাজ আদায়ের তথা নামাজের হেফাজত করার তাগিদ করা হয়েছে।

যে সব ভাগ্যবান মোমেনগণ পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে সফলকাম হবেন তাদের ছয়টি গুণ আলোচ্য আয়াত সমূহে বর্ণিত হয়েছে।

(১) যে প্রকৃত মোমেন হবে এবং তার নামাজ "খুশু" মন্ডিত হবে তথা সে নামাজে ভীত-সন্ত্রস্ত ও বিনয়াবনত থাকবে।

(২) বাজে কথা ও বাজে কাজ বর্জন করে চলবে।

(৩) যথানিয়মে যাকাত আদায় করবে এবং দেহ-মনের পবিত্রতা অর্জন করবে

(৪) নিজেদের কামনার স্থানকে সংযত রাখবে।

(৫) আমানতে খেয়ানত করবেনা এবং কথা দিয়ে কথা রক্ষা করবে।

(৬) এবং নামাজের হেফাজত করবে।

أُولَٰٓئِكَ هُمُ الْوَٰرِثُونَ ⑩

"এরাই সেই সব ভাগ্যবান লোক যারা জান্নাতুল ফেরদৌসের উত্তরাধিকারী হবে"।

অর্থাৎ জীবন সংগ্রামে তারা হবে সফলকাম এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে তারা জান্নাতুল ফেরদৌসের উত্তরাধিকারী হবে। الورثون শব্দটির কারণে প্রশ্ন হতে পারে যে ওয়ারিশ হওয়ার তাৎপর্য হলো, ইতিপূর্বে জান্নাতুল ফেরদৌস কারো ছিল, এরপর মুসলমানদেরকে দেয়া হয়েছে। অথচ এমন অবস্থা নয়। তফসীরকারগণ এ প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন, হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে দু'টি গৃহ রয়েছে, একটি জান্নাতে আর একটি দোজখে। যদি কোন

লোক মৃত্যুর পর তার কুফরী ও নাফরমানীর কারণে দোযখী হয় তবে জান্নাতবাসীগণ ঐ ব্যক্তির জান্নাতের গৃহের উত্তরাধিকারী হয় অর্থাৎ কাফেরদের জন্য নিদৃষ্ট গৃহগুলোর উত্তরাধিকারী হয় মোমেনগণ। আর আল্লাহ পাকের এই ফরমান أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ এর এটিই হল অর্থ।

(এবনে মাজা, এবনে জরীর, এবনুল মুনজের, এবনে আবি হাতেম এবনে মরদবীয়া এবং বায়হাক্কী)।

আবদুর রাজ্জাক, আবদ এবনে হোমায়েদ এবং এবনে জরীর হাদীস সংকলন করেছেন যার অর্থ হল, জান্নাতবাসীগণ নিজেদের জান্নাতী মহলের অধিকারী তো হবেনই, আর যারা আল্লাহ পাকের নাফরমানীর কারণে জান্নাতের অধিকারী হতে পারেনি তাদের জন্য নির্মিত গৃহগুলোরও উত্তরাধিকারী হবেন।

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

অর্থাৎ যারা পূর্বল্লোখিত গুণাবলী অর্জন করবে, তারা চিরদিন জান্নাতুল ফেরদৌসে বাস করবে, কখনও তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করা হবেনা এবং জান্নাতে তাদের মৃত্যুও হবেনা।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন তোমরা আল্লাহ পাকের নিকট জান্নাত চাও তখন তাঁর নিকট জান্নাতুল ফেরদৌসের জন্য আরজী পেশ কর, তা সর্বোচ্চ জান্নাত। সেখানে থেকেই জান্নাতের সকল নহর প্রবাহিত হয় আর তার উপরই রয়েছে আল্লাহ পাকের আরশ।

পূর্বে উল্লেখিত প্রশ্নের জবাবে তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, জান্নাতীগণ যখন তাদের জান্নাতের স্থান গ্রহণ করেন, তখন তাদের জন্য দোযখে যে স্থান থাকে তা বাতিল হয়ে যায়। আর অনুরূপভাবে দোযখী যখন দোযখে তার নিদৃষ্ট স্থান গ্রহণ করে, তখন তার জন্যে জান্নাতের স্থানটি মোমেনদেরকে প্রদান করা হয়। কাফেরদের জন্য যে নেয়ামত জান্নাতে ছিল, তা মোমেনদেরকে দেয়া হয়। আর এ অর্থেই বলা হয়েছে, মোমেনগণ জান্নাতুল ফেরদৌসের উত্তরাধিকারী হয়।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, কোন কোন মুসলমান পাহাড়ের ন্যায় উচু উচু গুণাহ নিয়ে আসবে, যেগুলোকে আল্লাহ ইহুদী নাসারাদের উপর ফেলে দিবেন এবং তাকে মাফ করে দিবেন।

আর একথাও এরশাদ হয়েছে যে আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন প্রত্যেক মুসলমানকে এক এক জন ইহুদী বা নাসারা দিয়ে বলবেন, এ হল দোযখে তোমার ফিদিয়া।

হযরত ওমর এবনে আবদুল আযীয যখন এই হাদীস শুনলেন, তখন এই হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আবু বরদা (রাঃ)-কে শপথ করতে বললেন, বর্ণনাকারী হযরত আবু বরদা (রাঃ) তিনবার শপথ করে এই হাদীস বর্ণনা করলেন। আর একথাও পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছেঃ

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا

সেই জান্নাত,যার উত্তরাধিকারী করবো আমার বন্দাদের থেকে কিছু লোককে।১

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾
ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً
فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ
لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾
ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾
وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾

তরজমা

(১২) এবং নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান থেকে।

(১৩) এরপর আমি তাকে শুক্র বিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ স্থানে।

(১৪) এরপর ঐ বিন্দুকে আমি জমাট রক্ততে পরিণত করি, পুনরায় এই জমাট রক্তকে গোশত পিন্ডে রূপান্তরিত করি, পরে ঐ পিন্ড থেকে অস্থি তৈরী করি আর ঐ অস্থিকে ঢেকে দেই গোশত দ্বারা এরপর তাকে অন্য এক সৃষ্টি রূপে গড়ে তুলি অতএব, সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ পাক,তিনি কত মহান।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৮, পৃষ্ঠা-৫

(১৫) এরপর তোমাদের সকলকে অবশ্যই মৃত্যু বরণ করতে হবে।

(১৬) আবার তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন পুনরুত্থিত করা হবে।

(১৭) আর নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উপরে সাতটি স্তর তৈরী করছি, আর আমি সৃষ্টি সম্পর্কে বেখবর নই।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে জীবন-সংগ্রামে সফলকাম, ভাগ্যবান লোকদের বৈশিষ্ট এবং গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে মানব জাতির সৃষ্টির ইতিকথা বর্ণিত হয়েছে। কিভাবে মানুষ অস্তিত্ব লাভ করে, আর অবশেষে কি হবে তার পরিণতি এর বিবরণ স্থান পেয়েছে।

অথবা

বিষয়টিকে এভাবেও বলা যায়, পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে জীবন-সাধনায় সফলকাম মোমেনদের জন্যে পরকালীন জিন্দেগীতে জান্নাতুল ফেরদৌস লাভের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কিন্তু যারা পরকালীন জিন্দেগীতেই বিশ্বাস করেনা তাদের উদ্দেশ্যে আলোচ্য আয়াতে মানব সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থার বিবরণ দেয়া হয়েছে, যার দ্বারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের কথা প্রমাণিত হয় এবং কেয়ামতের দিন মানব জাতির পুনরুত্থানের দলীল প্রমাণ প্রকাশিত হয়। আর মানুষ তার বৈশিষ্ট সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হয় এবং মানুষকে তার জীবনের শুরু এবং শেষ অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়। এভাবে তারা হেদায়েত লাভ করতে পারে, আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপন করে তার জন্য সম্বল সংগ্রহে স্বচেষ্ট হতে পারে।

অথবা

বিষয়টিকে এভাবেও বর্ণনা করা যায়, পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাক মানুষকে তাঁর বন্দেগীর আদেশ দিয়েছেন। আর একথাও ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের বন্দেগীর উপরই মানব জাতির জীবন-সাধনার সাফল্য নির্ভর করে।

আর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের দলীল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে, যার দ্বারা প্রতিটি মানুষ আল্লাহ পাকের মারেফত হাসিল করতে পারে।১

ইমাম রাজী (রঃ) পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এই আয়াত সমূহের সম্পর্কের বিবরণ এভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাকের এবাদতের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ পাকের মারেফত হাসিল করা ব্যতীত তাঁর এবাদত বন্দেগী করা সম্ভব হয়না। মূলতঃ এ কারণেই আলোচ্য আয়াত সমূহে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের দলীল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক কিভাবে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তার এক বিস্ময়কর ধারাবাহিক বিবরণ স্থান পেয়েছে আলোচ্য আয়াতে। মানুষ আজ যত ক্ষমতা এবং যত শক্তির অধিকারীই হোক না কেন সে যেন এই সত্য ভুলে না যায় যে সে মাটির মানুষ, আল্লাহ পাক তাকে মাটি থেকেই সৃষ্টি করেছেন। হযরত আদম (আঃ) কে আল্লাহ পাক সরাসরি মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করেছেন। আর আদম সন্তানদের সৃষ্টির মূলেও রয়েছে মাটির উপাদানই। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ⑫

এবং নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান থেকে।

অতএব, মানুষের কর্তব্য হ'ল, এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা, তাঁর শোকরগুজার থাকা এবং তাঁর বন্দেগী করা। কালবী (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের طِيْن শব্দ দ্বারা হয়ত আদম (আঃ) কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তফসীরকার কাতাদা (রঃ)ও এই একই মত পোষণ করেন।

আর একরামা (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের سُلٰلَةٍ শব্দ দ্বারা সেই পানি উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা মানুষের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়-তথা শুক্র বিন্দু।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে سُلٰلَةٍ শব্দটির অর্থ হল পানির নির্যাস।

মানব সৃষ্টির ইতিকথা

এরপর আমি তাকে শুক্র বিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ স্থানে!

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬৪

এরপর ঐ শুক্র বিন্দুকে আমি জমাট রক্ততে পরিণত করি, পুনরায় এই জমাট রক্তকে গোশত পিন্ডে রূপান্তরিত করি, পরে ঐ গোশত পিন্ড থেকে অস্থি তৈরী করি, আর ঐ অস্থিকে ঢেকে দেই গোশত দ্বারা এরপর তাকে অন্য এক সৃষ্টি রূপে গড়ে তুলি।

এ আয়াতে মানব সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায়ের ধারাবাহিক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। কিভাবে মানুষের বিকাশ ও উন্মেষ ঘটে, কিভাবে মানুষকে আল্লাহ্ পাক সৃষ্টি করেন, তার বিবরণ স্থান পেয়েছে, যাতে করে মানুষ তার স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান আনে ও আনুগত্য প্রকাশ করে, তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ না হয়।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে মসনদে আহমদ সংকলিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে এক মুষ্ঠি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যা সারা পৃথিবী থেকে বাছাই করে নেয়া হয়েছে। আর এ কারণেই আদম সন্তানদের বর্ণ হয়েছে বিভিন্ন। কেউ লাল, কেউ সাদা, কেউ কালো, কেউ অন্য কোন বর্ণের। আর তাদের মধ্যে কেউ নেক, কেউ বদ। মানব সৃষ্টির সূচনাতেই এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় পরিবর্তন করা হয়। এই পর্যায়ে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীস বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি এরশাদ করেছেনঃ মানুষের সারা শরীর পঁচে যায় শুধু পৃষ্ঠের হাড় পচেনা। ঐ হাড়ের উপর ভীত্তি করেই সৃষ্টি কর্ম অব্যাহত থাকে। আর হাড়ের উপর গোশতের আস্তরণ রাখা হয়, যাতে তা গোপন এবং শক্তিশালী থাকে। এরপর তার মধ্যে রূহ্ ফুঁকে দেয়া হয়, তখন সে জীবন্ত মানুষে রূপান্তরিত হয়।১

আল্লাহ্ পাকের কুদরতের কি মহিমা! তাঁর সৃষ্টি নৈপূন্যের এক অপূর্ব নিদর্শণ হলো মানুষ, কিন্তু কি আশ্চার্য! যে মানুষ পৃথিবীতে অহংকার করে, যুদ্ধ বিগ্রহ করে, অন্য মানুষের উপর জুলুম অত্যাচার করে, সে তার অতীত ইতিহাস স্মরণ করেনা। তাই আত্ম বিস্মৃত মানুষকে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক স্মরণ করে দিয়েছেন, হে বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট মানুষ! এই সত্য ভুলে যেওনা যে তোমাকে আল্লাহ্ পাক অপবিত্র পানি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, আর ঐ অপবিত্র পানি বা শুক্র বিন্দু পর্যায় ক্রমে প্রথমে জমাট রক্ত, গোশত, অস্থি হয়, এবং অস্থির উপর গোশতের আস্তরণ দেয়া হয়। এরপর আল্লাহ্ পাকের বিস্ময়কর কুদরত হেকমতে সে মানুষের আকৃতি ধারণ করে।২

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দূ), পারা-১৮, পৃষ্ঠা-৬

২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দূ), পারা-১৮, পৃষ্ঠা-৫-৬

ثُمَّ أَنْشَأْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ

"এরপর তাকে আমি অন্য এক সৃষ্টি রূপে গড়ে তুলি।"

অর্থাৎ যে দেহটি পর্যায়ক্রমে তৈরী হয়, তার মধ্যে আল্লাহ পাকের নির্দেশ ক্রমে রূহ্ ফুঁকে দেয়া হয় ফলে একটু পূর্বে যা ছিল জড় পদার্থ, তা এক জীবন্ত সৃষ্টি রূপে পরিণত হয়। আর একথাই অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ

অস্থির উপর যখন গোশত প্রদান করা হয়, তখন ঐ গোশত পিন্ডের উপর রূহ ফুঁকে দেয়া হয়। মানুষ যখন ভুমিষ্ট হয়, তখনও তার মধ্যে অনেক পরিবর্তন দেয়া দেয়। শৈশব, কৈশোর, যৌবন এবং বার্ধ্যকের নামে এ সব পরিবর্তন হয়। এজন্য অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَفِيْ أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُوْنَ

আর তোমাদের নিজেদের মধ্যেই আল্লাহ পাকের সৃষ্টি নৈপুন্যের বহু বিস্ময়কর নিদর্শন রয়েছে, তবুও কি তোমরা দেখনা? আলোচ্য আয়াতে خلق اخر বা অন্য সৃষ্টির যে কথা বলা হয়েছে, ইমাম কাতাদা (রঃ) এর তাৎপর্য বলেছেন, এর অর্থ হল, ঐ নবজাতক শিশুর দাঁত ও চুল বের হওয়া।

আর এবনে জোরায়েজ (রঃ) হযরত মুজাহেদ (রঃ) এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে এর তাৎপর্য হল পরিপূর্ণ যৌবন লাভ করা।

হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, خلق اخر এর তাৎপর্য হল, নর বা নারী হওয়া। উফী (রঃ) হযরত আব্দুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন خلق اخر এর তাৎপর্য হ'ল, মানব জীবনের বিভিন্ন পরিবর্তন। যেমন, ভূমিষ্ট হওয়ার পর দুধ পান করা, ধীরে ধীরে বসা, এর আরও কিছুদিন পর দন্ডায়মান হওয়া। এরপর পায়ে পায়ে হাটার চেষ্টা করা, এরপর দুধ ছেড়ে দেয়া এবং অন্যান্য খাবার গ্রহণ করা। এরপর শৈশব থেকে যৌবনে প্রবেশ করা, এ সবই হল, خلق اخر অন্য সৃষ্টির বাস্তবরূপ।

فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ⑭

অতএব, সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ পাক, তিনি কত মহান।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের শান, তাঁর মহিমা সর্বোচ্চে। মানব সৃষ্টির যে বিবরণ এই মাত্র প্রদান করা হল, তা এ কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে আল্লাহ পাকের কোন শরীক নেই, তাঁর কোন শরীক হওয়া সম্ভবই নয়, তিনিই একমাত্র স্রষ্টা, আর সব কিছুই তাঁর সৃষ্টি।

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾

"এরপর নিশ্চয়ই তোমরা মৃত্যু বরণ করবে।"

অর্থাৎ মানুষ যেন তার এই জীবন নিয়ে ভুল ধারণা না করে, এ জীবন চিরস্থায়ী নয়; ক্ষণস্থায়ী। মৃত্যুর অলংঘনীয় বিধানে তার জীবনের অবসান ঘটবে, এ জীবনের যবনিকাপাত হবে, পৃথিবীর কোন সৃষ্টি তাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। যিনি দান করেছেন, এ জীবন, তাঁরই আদেশ ক্রমে হবে মৃত্যু। তিনি যখন ইচ্ছা, যেখানে ইচ্ছা এবং যে অবস্থায়, ইচ্ছা মৃত্যুর ফরমান জারি করেন। সে ফরমান কার্য্যকর হয় সঙ্গে সঙ্গে অনতিবিলম্বে। এতে বাধা দেয়ার শক্তি কারোরই নেই, যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ

হে রসূল! নিশ্চয়ই আপনি মৃত্যু পথের যাত্রী আর তারাও মৃত্যু বরণ করবে।

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾

আবার তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন হাজির করা হবে।

অর্থাৎ এ জীবন ও মৃত্যুই শেষ নয়; বরং এরপর আসবে আর একটি জীবন তথা পরকালিন চিরস্থায়ী জীবন, প্রতিটি মানুষকে মহান আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির করা হবে এবং প্রত্যেককে তার জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের জন্য জবাবদিহী করতে হবে, প্রথমবার যিনি সৃষ্টি করেছেন, দ্বিতীয়বার তিনিই সৃষ্টি করবেন, এ জীবনে মানুষ যা করবে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে তাই ভোগ করবে। এ জীবন স্বার্থক হয়েছে কিনা, তা মূল্যায়ন করা হবে পরজীবনে। তাই এ জীবন হল সাধনার জীবন, কঠোর পরিশ্রমের জীবন। যারা এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের সীমিত সময়ে এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনে তাঁর যাবতীয় বিধান মেনে চলবে তারা চির সুখী হবে, চিরদিন আল্লাহ পাকের নেয়ামত লাভ করতে থাকবে। পক্ষান্তরে যারা এ জীবনকে হেলায় উড়িয়ে দিবে, এখানে সময়ের সদ্ব্যবহার করবে না, এ জীবনে পরজীবনের জন্য সম্বল সংগ্রহ করবে না, তারা হবে চির বিপদগ্রস্থ। কোরআনে করীমের অন্য আয়তে রয়েছে এর সুস্পষ্ট ঘোষণাঃ

সূরা মুয্যাম্মিল وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ

আর তোমরা যা কিছু ভাল কাজ করবে, তার শুভ পরিণতি অবশ্যই আল্লাহ পাকের নিকট পাবে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾

আর আমি তোমাদের উপর সাতটি আসমান তৈরী করেছি এবং আমার সৃষ্টির কল্যাণ সম্পর্কে আমি বেখবর নই।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের طَرَائِقَ শব্দ দ্বারা আসমানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ স্তর সমূহ অর্থাৎ আসমানে সাতটি স্তর রয়েছে একটির উপর আর একটিকে স্থাপন করা হয়েছে। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ পথ অর্থাৎ সাতটি আসমানে ফেরেশতাদের যাতায়াতের জন্য সাতটি পথ রয়েছে।

وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যেভাবে বিশাল বিস্তৃত আসমান সৃষ্টির করেছেন, ঠিক তেমনি ভাবে প্রত্যেকটি সৃষ্টির পরিচালনা, শৃঙ্খলা হেফাজত ও সংরক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেও আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল, সব কিছুই রয়েছে তাঁর নখদর্পণে। হে মানব জাতি! তোমাদের রিজিক তথা তোমাদের সকল প্রয়োজনের আয়োজন এক আল্লাহ পাকই করে থাকেন। তোমাদের সকল অবস্থা সম্পর্কে তিনি ওয়াকেফহাল। অতএব, তোমরা শুধু তাঁরই বন্দেগী কর এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের সাধনায় রত হও।

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ
ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿١٨﴾ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَ
أَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَجَرَةً
تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ ﴿٢٠﴾ وَ
إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا
مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

তরজমা

(১৮) এবং আমি আসমান থেকে পরিমিত পরিমাণেই বারি বর্ষণ করি, এরপর তা আমি মাটিতে সংরক্ষণ করি। আমি তাকে অপসারণ করতেও সক্ষম।

(১৯) এরপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্যে খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি তাতে তোমাদের জন্য প্রচুর পরিমাণ ফল রয়েছে, আর তা থেকে তোমরা খেয়ে থাক।

(২০) আর আমি সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ যা সীনাই পাহাড়ে জন্মে থাকে। আহারকারীদের জন্য তা তৈল ও তরকারী নিয়ে উৎপন্ন হয়।

(২১) আর নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও। তাদের উদরে যা আছে তা থেকে তোমাদেরকে আমি পান করাই এবং তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকারীতা, আর তা থেকে তোমরা আহার করেও থাক।

(২২) ঐ চতুষ্পদ জন্তুর উপর এবং নৌকায় তোমরা আরোহনও করে থাক।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরত হেকমতের উল্লেখ রয়েছে এবং এ জীবনের পর যে আরও একটি জীবন আসবে এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। এই পর্যায়ে মানব জাতির বিকাশ ও উন্মেষের উল্লেখ করে এরশাদ হয়েছে যে

আল্লাহ পাক কোন দৃষ্টান্ত ব্যতীত এক বিন্দু অপবিত্র পানি দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করতে পারেন। অসহায় নবজাত শিশুকে চলন্ত বলন্ত, শক্তিশালী মানুষে রূপান্তরিত করতে পারেন। তিনি মানুষের মৃত্যুর পর কেয়ামতের দিন তাদের পুনরুত্থান কেন করতে পারবেন না? এরপর সাত আসমানের সৃষ্টির কথা উল্লেখকরে আল্লাহ পাকের পরিপূর্ণ এলমের কথা ঘোষণা করেছেন যে বিশাল বিস্তৃত পৃথিবীর তথা সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির সব কিছুই আল্লাহ পাকের নখ দর্পনে রয়েছে, কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টির আড়ালে নেই।

আল্লাহ পাকের কয়েকটি বিশেষ নেয়ামত

আলোচ্য আয়াতে মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের কয়েকটি বিশেষ নেয়ামতের উল্লেখ রয়েছে, আর এই নেয়ামত সমূহ মানুষের জীবনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় এবং আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমত উপলব্ধি করার জন্য বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ

আল্লাহ পাক পরিমিত পরিমানে আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন।

বস্তুতঃ মানব জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের নেয়ামত অনন্ত অসীম। তন্মধ্যে পানি এক বিশেষ নেয়ামত। পানির অপর নাম প্রাণ। এই পানি আল্লাহ পাকেরই দান। আল্লাহ পাকই আসমান থেকে পরিমিত পরিমানে বারি বর্ষণের মাধ্যমে এই পানি অবতরণ করেন।

بِقَدَرٍ নির্দৃষ্ট পরিমাণে।

অর্থাৎ তিনি মানুষের প্রয়োজন মোতাবেক আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন তবে, এত বেশী নয় যে পানির কারণে মানুষের জীবন দূর্বিষহ হযে যায় এবং উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্য ধ্বংস হয়ে যায়। আর এত কমও নয় যে পানির অভাবে জমিনে খাদ্য দ্রব্য উৎপন্নই না হয়। তাই নিদৃষ্ট পরিমাণে আসমান থেকে আল্লাহ পাক দয়া করে বারি বর্ষণ করেন। যে পরিমান বৃষ্টিপাত হলে জমিন শস্য শ্যামলীমায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে, সে পরিমাণই বৃষ্টিপাত করা হয়। যেখানে অধিক পরিমাণে পানির প্রয়োজন সেখানে অধিক পরিমাণেই বৃষ্টিপাত হয়।.আর যেখানে কম প্রয়োজন, সেখানে কমই বৃষ্টিপাত

হয়। এটি নিঃসন্দেহে দয়াবান আল্লাহ্ পাকের দয়া ব্যতীত আর কিছুই নয় যে তিনি মানুষের নিত্য প্রয়োজনের জন্যে তাদের প্রয়োজন মোতাবেক আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন।

فَأَسْكَنَّٰهُ فِى ٱلْأَرْضِ

এরপর তা আমি মাটিতে সংরক্ষণ করি। বৃষ্টিপাতের পর মাটি সেই পানিকে আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ মোতাবেক নিজের মধ্যে সংরক্ষণ করে। মানুষ পরে কূপ খনন করে বা নল বসিয়ে বের করে এবং নিজেদের প্রয়োজণে ব্যবহার করে। এতে কিন্তু পানির উপর আল্লাহ্ পাকের ক্ষমতা হ্রাস পায় না; বরং তখনও তা আল্লাহ্ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে, এরশাদ হয়েছেঃ

وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍۭ بِهِۦ لَقَٰدِرُونَ ﴿١٨﴾

আমি তাকে অপসারণ করতেও সক্ষম, অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক যেভাবে মানুষকে পানি দিয়ে থাকেন, ইচ্ছা করলে তা বন্ধও করে দিতে পারেন। যেমন, কখনও খরা দেখা দেয়, পুকুরগুলো শুকিয়ে যায়। হাজার হাজার ফিট মাটি খুড়েও পানি পাওয়া যায় না। এমনিভাবে দেখা যায় সমুদ্রের পানি পর্য্যাপ্ত, কিন্তু লবনাক্ত। তাই পান করার অযোগ্য। এ সব কিছু আল্লাহ্ পাকের কুদরত হেকমতের বিস্ময়কর নিদর্শন। এসব দেখেই মানুষকে আল্লাহ্ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পন করতে হয় এবং তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামতের জন্যে শোকর গুজার হতে হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ্ পাক জান্নাত থেকে চারটি নহর নাজিল করেছেন। সাইহুন, জাইহুন, দিজলা ও ফোরাত। আল্লামা বগভী (রঃ) এ কথাও লিখেছেন, ইমাম হাসান এবনে সুফিয়ান একরামা (রঃ) এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্ পাক জান্নাতের একটি ঝরণা থেকে যা জান্নাতের নিচু এলাকায় ছিল, পাঁচটি নহর জীব্রাঈল (আঃ) এর দুই হাতের মধ্যে নাজিল করেছেন, সাইহুন, জাইহুন, দিজলা, ফোরাত ও নীল। জীব্রাঈল (আঃ) আমানত স্বরূপ এই নহর সমূহকে পাহাড়কে সর্পোদ করেন এবং পৃথিবীতে প্রাবাহিত করেন এবং মানুষের জন্য উপকারী করেন। আলোচ্য আয়াত

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ

দ্বারা এদিকে ইংগীত করা হয়েছে।

এরপর যখন ইয়াজুজ মাজুজ বের হয়ে আসবে তখন আল্লাহ পাক জীব্রাঈল (আঃ) কে প্রেরণ করে পৃথিবী থেকে কোরআনে করীম, সমস্ত দ্বীনি এলম, হ'জ'র আসওয়াদ, মাকামে ইব্রাহীম এবং মুসা (আঃ) এর তাবুত এবং তাতে সংরক্ষিত যাবতীয় বস্তু ও উপরোল্লিখিত পাঁচটি নহরকে আসমানের দিকে তুলে নেবেন। আর আলোচ্য আয়াত

وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ

(আর নিশ্চয়ই আমি তা অপসারণ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম) এর এটিই অর্থ।

আর যখন উপরোল্লিখিত পবিত্র নিদর্শন সমূহ পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নেয়া হবে তখন বিশ্ববাসী সর্ব প্রকার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।১

فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ

এরপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি, তাতে তোমাদের জন্য প্রচুর পরিমাণ ফল রয়েছে আর তা থেকে তোমরা খেয়ে থাক।

যে পানি আল্লাহ পাক আসমান থেকে বর্ষণ করেন তা দ্বারাই পৃথিবীতে মানুষের প্রয়োজনের আয়োজনেফল উৎপাদিত হয়।পৃথিবী শষ্য-শ্যমলীমায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে এই পানিরই বরকতে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَأَنشَأْنَا لَكُم

অর্থাৎ এ পানি দ্বারাই তোমাদের জন্যে আমি খেজুর আঙ্গুরের বাগান তৈরী করি, এতে থাকে প্রচুর পরিমাণ ফল, যা তোমরা খেয়ে থাক। নিঃসন্দেহেএসব কিছু আল্লাহ পাকের মহান দান। তাছাড়া খেজুর ও আঙ্গুর ব্যতীত অন্যান্য ফলও রয়েছে যা সময় ও কালের ব্যবধানে উৎপাদিত হয়ে থাকে।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, যেহেতু আরব দেশে খেজুর ও আঙ্গুর অধিক পরিমাণে হয়, এজন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিশেষভাবে এ দু'টির উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আল্লাহ পাকের দান স্বরূপ রকমারী ফলমূল পাওয়া যায়। আমাদের দেশের আম, লিচু, কাঠাল, তরমুজ, কলা, আমরুজ, বেল প্রভৃতি আল্লাহ পাকের রহমত ব্যতীত আর কিছুই নয়। এমনিভাবে অন্য দেশে আপেল, কিসমিস মুসাম্বি আরও কত ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হচ্ছে। আল্লাহ পাকের

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -১৭৮

দানে ধন্য হয়েই মানব জাতি এ সব ফল ভোগ করছে। অতএব, প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হল আল্লাহ পাকের দরবারে শোকর গুজার হওয়া।

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَآءَ

আর আমি সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ, যা সীনাই পাহাড়ে জন্মে থাকে।

আর এ পানি থেকেই আল্লাহ পাক জইতুন বৃক্ষ সৃষ্টি করেন, যা বিশেষভাবে তুর পাহাড়ে উৎপাদিত। জইতুনের তেলের অসাধারণ উপকারীতা রয়েছে। আর তরকারী হিসাবেও তা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছেঃ জইতুনের তৈল খাও এবং ব্যবহার কর, তা অত্যন্ত মোবরক বৃক্ষ থেকে বের হয়ে আসে।

বর্ণিত আছে যে আশুরার রাত্রে খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) এর বাড়ীতে একজন মেহমান এসেছিল। তিনি ঐ মেহমানকে উটের গোশত ও জইতুন দ্বারা আপ্যায়ন করেছিলেন এবং বলেছিলেন, এ হল সেই বরকতময় বৃক্ষের তৈল, যার কথা স্বয়ং আল্লাহ পাক তাঁর নবীর নিকট উল্লেখ করেছেন।১

আলোচ্য আয়াতের سَيْنَآءَ শব্দটির একাধিক অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে।

বিখ্যাত তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল, বরকত। অর্থাৎ বরকতময় পাহাড় থেকে আমি জইতুনকে সৃষ্টি করেছি।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) জাহ্যাক (রঃ) এবং একরামা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল উত্তম ও সুন্দর।

কালবী (রঃ) বলেছেন, এ শব্দটির অর্থ হল, বৃক্ষ তরুলতা পূর্ণ।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, হিব্রু ভাষায় যে স্থানে অনেক বৃক্ষ তরুলতা থাকে তাকে سِيْنَآءَ বলা হয়।

আর মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, যে পাহাড়ের উপর অধিক সংখ্যক ফলের বৃক্ষ থাকে তাকে سِيْنَآءَ বলা হয়।

মুজাহেদ (রঃ) থেকে আর একটি বিবরণ রয়েছে, তিনি বলেছেন سِيْنَآءَ এক বিশেষ পাথর হয়, আর ঐ পাথর তুর পাহাড়ে অধিক পরিমানে পাওয়া যায়। তাই তাকে طُوْرِ سِيْنَآءَ বলা হয়েছে।

এবনে জায়েদ (রাঃ) বলেছেন, طُوْرِ سَيْنَآءَ আসলে ঐ পাহাড়ের নাম যা মিসর ও আইলার মধ্যস্থলে অবস্থিত। যেখান থেকে হযরত মুসা (আঃ) কে ডাক দেয়া

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৮, পৃষ্ঠা-৯

হয়েছিল এবং তাঁকে নবুওয়ত দান করা হয়েছিল। সেখানেই আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম তাঁর সাথে কথা বলে ছিলেন।

تَنۢبُتُ بِالدُّهۡنِ وَصِبۡغٍ لِّلۡاٰكِلِیۡنَ ۝

"আহারকারীদের জন্য তা তৈল ও তরকারী নিয়ে উৎপন্ন হয়।"

অর্থাৎ জইতুনে দু'টি উপকার রয়েছে। তাতে রয়েছে তৈল, যা মালিশ করা হয় এবং যার দ্বারা প্রদীপ প্রজ্বলিত করা হয়। আর এটি তরকারী হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, صِبۡغٍ সেই তরকারীকে বলা হয়, যাতে রুটি ডুবিয়ে খাওয়া হয় আর রুটির মধ্যে তার বর্ণ প্রকাশ পায়।

মুকাতেল (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক এই বৃক্ষকে মানুষের তরকারী রূপে তৈরী করেছেন এবং তৈল রূপেও। তফসীরকার মুকাতেল (রঃ) একথাও বলেছেন, তূর পাহাড়ে সর্ব প্রথম জইতুন বৃক্ষ উৎপাদিত হয়। আর একথাও বলা হয়েছে যে নূহ (আঃ) এর তুফানের পর পৃথিবীতে সর্ব প্রথম জাইতুনের বৃক্ষই উৎপন্ন হয়।১

আল্লামা সয়ুতী (রঃ) লিখেছেন, এবনে জরীর ও এবনে আবি হাতেম জাহ্যাক (রঃ) এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে তূরে সাইনা হল সেই পাহাড় যেখান থেকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হযরত মুসা (আঃ) কে ডাকা হয়েছে।

এবনে জরীর, এবনে মুনজের, এবং এবনে আবি হাতেম, এ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে জইতুন এমন এক সুস্বাদু খাদ্য যাতে তৈলও থাকে।

আর কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক তাতে তৈল ও তরকারী উভয়ই রেখেছেন।২

وَاِنَّ لَكُمۡ فِى الۡاَنۡعَامِ لَعِبۡرَةً ؕ

আর নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও। তাদের উদরে যা আছে তা থেকে তোমাদেরকে আমি পান করাই এবং তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকারীতা, আর তা থেকে তোমরা আহার করেও থাক।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -১৭৯-৮০

২। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৯

আল্লাহ পাক মানব জাতির উপকারার্থে শুধু যে বারি বর্ষণ করেন তাই নয়; বরং চতুষ্পদ জীব জন্তুতেও রখেছেনমানুষের অনেক উপকার। এতে রয়েছে তোমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয়। আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরতের একটি জীবন্ত নিদর্শন হল এই যে তোমরা এ জীব জন্তুর দুগ্ধ পান কর। আল্লাহ পাক গোবর ও রক্তের মধ্য দিয়ে তোমাদের জন্যে এই চতুষ্পদ জন্তুর উদর থেকে দুধ বের করে আনেন, যা অত্যন্ত সুস্বাদু এবং শক্তি বর্ধক। কিন্তু বিস্ময়কর বিষয় এই দুধ গোবর ও রক্তের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসলেও দুধ কখনও রক্ত বা গোবরের সাথে মিশ্রিত হয়না। মানব জাতির জন্য এটি আল্লাহ পাকের কত বড় মেহেরবাণী তা চিন্তা করেও শেষ করা যায়না। এতদ্ব্যতীত, তোমরা এই চতুষ্পদ জন্তুগুলোর গোশত খেয়ে থাক এবং এগুলোর উপর আরোহন করে থাক, আর এ চতুষ্পদ জন্তুগুলো তোমাদের মাল পত্রও বহণ করে থাকে। নিঃসন্দেহে এ সব হল আশরাফুল মাখলুকাত মানব জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের মহান দান।

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ

"ঐ চতুষ্পদ জন্তুর উপর এবং নৌকায়ও তোমরা আরোহন করে থাক।"

অর্থাৎ যেভাবে তোমরা চতুষ্পদ জন্তুর উপর আরোহন কর, ঠিক তেমনিভাবে নৌকার উপরও আরোহন করে থাক। এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের একটি দয়া যে মানুষ সমুদ্রের উত্তলে তরঙ্গ ভেদ করে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যাতায়াত করে নৌকায় আরোহন করে। যদি আল্লাহ পাকের একান্ত মেহেরবাণী না হত তবে সমুদ্রের পর্বত সমান তরঙ্গ মালার মোকাবেলা করে ভ্রমণ করা সম্ভবই হতনা।

অতএব, চতুষ্পদ জন্তু এবং তার দুধ আল্লাহ পাকের খাস নেয়ামত। ঐ দুধ দিয়ে হয় ঘি; আর তা দ্বারা রকমারী সুস্বাদু খাদ্য তৈরী হয়। আর চতুষ্পদ জন্তুর পশম দ্বারা মানুষের গরম পোশাক তৈরী হয়। মানুষ এ সব জন্তুর উপর আরোহন করে। এ সব শক্তিশালী জন্তুকে আল্লাহ পাকই দুর্বল মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন উত্তাল তরঙ্গ মোকাবেলা করে মানুষ নৌকায় আরোহন করে আল্লাহ পাকেরই কুদরতে হেকমতে এবং তাঁর দানে ধন্য হয়ে। মানুষের কর্তব্য হল আল্লাহ পাকের সমস্ত দানের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।১

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত–আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–৬৭
তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৮, পৃষ্ঠা –১৮০

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ
مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ
قَوْمِهٖ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ
اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۚۖ مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٤﴾ اِنْ هُوَ
اِلَّا رَجُلٌۢ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ
بِمَا كَذَّبُوْنِ ﴿٢٦﴾ فَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَ
وَحْيِنَا فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ
زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ
مِنْهُمْ ۚ وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ﴿٢٧﴾

তরজমা

(২৩) আর নিশ্চয়ই আমি নূহকে তাঁর জাতির নিকট প্রেরণ করি। তিনি বলেন, হে আমার জাতি! তোমরা এক আল্লাহ পকের বন্দেগী কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মাবুদ নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবেনা?

(২৪) তাঁর জাতির কাফের নেতারা তখন বললো, এ আবার কি? তোমাদের ন্যায় একজন মানুষই তো, সে তোমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। আর আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে ফেরেশতাই প্রেরণ করতেন। আমরাতো আমাদের পূর্ব পুরুষদের নিকট এমন কথা শ্রবণ করিনি।

(২৫) এতো এমন লোক যাকে উন্মত্ততা পেয়ে বসেছে, অতএব, তাঁর সম্পর্কে কিছু কাল অপেক্ষা কর।

(২৬) নূহ বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর, কেননা তারা আমাকে মিথ্যাবাদী জ্ঞান করছে।

(২৭) এরপর আমি তাঁর নিকট প্রত্যাদেশ প্রেরণ করলাম, তুমি আমার তত্ত্বাবধানে এবং আমার প্রত্যাদেশ মোতাবেক একটি নৌযান তৈরী কর, এরপর যখন আমার আদেশ আসবে ও উনান উথলিয়ে উঠবে তখন নৌযানের মধ্যে

প্রত্যেকটি বস্তুর এক এক জোড়া করে এবং তোমার পরিবার পরিজনকে তুলে নাও। তবে তাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে পূর্বাহ্নে স্থির সিদ্ধান্ত রয়েছে তাদের কথা সতন্ত্র। আর এই পাপীষ্ঠদের সম্পর্কে আমাকে কিছু বলোনা, নিশ্চয়ই তারা নিমজ্জিত হবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে তৌহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের অনেক দলীল প্রমাণের উল্লেখ রয়েছে। এরপর আলোচ্য আয়াত থেকে তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরাম যে অক্লান্ত সাধনা করেছেন তার বিবরণ স্থান পেয়েছে।১

দ্বিতীয়তঃ পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ পাকের কুদরতে ও রহমতে নৌযানে আরোহন করে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে থাক। এ পর্যায়ে আলোচ্য আয়াতে হযরত নূহ (আঃ) এর ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে। কেননা, হযরত নূহ (আঃ) এর যুগ থেকেই নৌকা নির্মাণের শিল্প আরম্ভ হয়। এরপর অন্যান্য নবীগণের উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা এ সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে যে নবী রসূলগণ যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ ও পরিবেশে মানুষকে তৌহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানিয়েছেন। যারা এই আহবানে সাড়া দেয়ার স্থলে আম্বিয়ায়ে কেরামকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে, তাদের পরিণাম কত ভয়াবহ হয়েছে তারও উল্লেখ রয়েছে, যাতে করে অনাগত ভবিষ্যতের মানুষ এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

তৃতীয়তঃ এই সূরার প্রারম্ভে আল্লাহ পাক প্রকৃত মোমেনদের বৈশিষ্ট এবং অবস্থা বর্ণনা করেছেন যা ঈমান এবং একীনের দিকে মানব মনকে আকৃষ্ট করে। এরপর আলোচ্য আয়াত থেকে অবাধ্য কাফেরদের অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে। তাই আলোচ্য আয়াত থেকে হযরত নূহ (আঃ) ও তাঁর নাফরমান জাতির অবস্থার বিবরণ স্থান পেয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ

১। তফসীরে কবীর, খন্ড- ২৩, পৃষ্ঠা-১০

আর নিশ্চয়ই আমি নূহকে তার জাতির নিকট প্রেরণ করি।

হযরত নূহ (আঃ) এর নাম

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, হযরত নূহ (আঃ) এর আসল নাম ছিল ইয়াশকর। কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন কারণে তিনি নূহ নামে পরিচিত হন।১

হযরত নূহ (আঃ) সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর যাবত তাঁর জাতিকে তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান করেছেন।

فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۲۳﴾

তিনি বলেছেনঃ

হে আমার জাতি! তোমরা এক আল্লাহর বন্দেগী কর তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মাবুদ নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবেনা?

কিন্তু হযরত নূহ (আঃ) এর জাতি শুধু যে তৌহীদের উপর বিশ্বাস করেনি এবং হযরত নূহ (আঃ) কে আল্লাহর নবী হিসাবে মেনে নেয়নি; তাই নয়, বরং তারা তাঁর প্রতি অকথ্য নির্যাতন করতে থাকে। সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর ধরে তাদের নির্যাতন তিনি সহ্য করতে থাকেন। অবশেষে আল্লাহ্ পাকের দরবারে তিনি তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করেন। এর ফলে, তারা কোপগ্রস্থ হয়। নেমে আসে তাদের উপর আসমানী গজব হিসাবে প্রলয়ংকরী বন্যা এবং ঐ কাফেররা সকলেই ধ্বংস হয়। পরে হযরত নূহ (আঃ) তাঁর বদদোয়ার জন্য আক্ষেপ করেন এবং আল্লাহ্ পাকের দরবারে কাঁদতে থাকেন, আর এজন্যে তিনি নূহ নামে পরিচিতি হন।

দ্বিতীয়তঃ তিনি তাঁর কাফের পুত্রের জন্যে আল্লাহ্ পাকের দরবারে আরজী পেশ করেছিলেন, যা গ্রহণযোগ্য হয়নি। এ জন্যও তিনি আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে কান্নাকাটি করেছিলেন, এ কারণেও তাঁকে নূহ বলা হয়।

তৃতীয়তঃ একটি কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ কুকুর তাঁর পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করার সময় হযরত নূহ (আঃ) তাকে বলেছিলেনঃ "তুই আমার নিকট থেকে দূর হয়ে যা।" আল্লাহ্ পাকের দরবার থেকে তাঁর উদ্দেশ্যে এ ব্যাপারে সতর্ক বাণী উচ্চারিত হয় এই মর্মে "তুমি যে তাকে দূর হও বললে, আমিই যে তাকে সৃষ্টি করেছি"। হযরত নূহ (আঃ) এ কারণেও আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত কান্নাকাটি করেছিলেন। এ কারণেও তিনি নূহ নামে খ্যাতি অর্জন করেন।২

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -১৮১

২। তফসীরে কবীর, খন্ড- ২৩, পৃষ্ঠা-১১

যাহোক, হযরত নূহ (আঃ) তাঁর জাতিকে তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানিয়ে বলেছিলেন, তোমরা শুধু এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মাবুদ বা উপাস্য নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবেনা?

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর যে পূজা করছো এবং আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের না শোকরী করছো, তোমরা কি ভয় করোনা যে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে প্রদত্ত সম্পদ যে কোন সময় ছিনিয়ে নিতে পারেন এবং তোমরা তাঁর সাথে যে শেরক করছো তার জন্যে তিনি তোমাদেরকে যে কোন সময় শাস্তি দিতে পারেন।

فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ

হযরত নূহ (আঃ) এর জাতির তথাকথিত নেতারা বললো, এ আবার কি? সে তো তোমাদের ন্যায় একজন মানুষই, তোমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায়, যদি তোমাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ পাক কোন রসূল প্রেরণ করা পছন্দ করতেন, তবে কোন ফেরেশতা অবশ্যই প্রেরণ করতেন, আমরা এমন কথা ইতিপূর্বে কখনও পূর্ব পুরুষদের নিকট শুনিনি।

হযরত নূহ (আঃ) এর জাতির সর্দার মাতবররা হযরত নূহ (আঃ) এর তৌহীদের আহবানে সাড়া দেয়াতো দুরের কথা; বরং তারা তাকে অস্বীকার করে বললো, লোকটিতো আমাদের ন্যায় রক্ত মাংসের মানুষই। এ সব কথা বলে সে তোমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়। কেননা, যদি আল্লাহ পাক রসূল প্রেরণ করতে ইচ্ছা করতেন, তবে আমাদের মত রক্ত মাংসের মানুষ নূহকে প্রেরণ করতেন না; বরং এ উদ্দেশ্যে কোন ফেরেশতা প্রেরণ করতেন। আমাদের ন্যায় রক্ত মাংসের মানুষ আল্লাহর রসূল হতে পারেন এমন আজগুবি কথা আমরা ইতিপূর্বে কখনও শুনিনি এবং আমাদের দেব-দেবীকে বাদ দিয়ে এক আল্লাহর বন্দেগী করতে হবে, এমন কথাও আমরা কখনও শুনিনি। আলোচ্য আয়াতের الْمَلَؤُا শব্দটির অর্থ হল, জাতির সর্দার। তারা পরস্পর বললো, অথবা জনসাধারণকে বললো যে নূহতো তোমাদেরই ন্যায় মানুষ, তোমাদেরই ন্যায় পানাহার করে, সে আল্লাহর প্রেরিত রসূল কি করে হতে পারে? নূহ (আঃ) এর জাতির বিশ্বাস ছিল পাথরও আল্লাহর শরীক হতে পারে কিন্তু কোন মানুষ আল্লাহর রসূল হতে পারেনা। আর হযরত নূহ (আঃ) যে নিজেকে আল্লাহর রসূল বলে দাবী করেছেন, তারা এর কারণ বলেছে যে সে তোমাদের সকলের নেতা হতে চায় এবং তোমাদের উপর প্রভাব

প্রতিপত্তি বিস্তার করতে চায় এবং তোমাদের সকলের উপর মর্যাদাবান হওয়ার উচ্ছা রাখে।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۖ

যদি আল্লাহ পাকের মর্জি হত যে আল্লাহ পাক ব্যতীত কারো বন্দেগী না করা হোক, অথবা তিনি যদি কোন রসূল প্রেরণ করার ইচ্ছা করতেন তবে কোন ফেরেশতা প্রেরণ করতেন।

مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٤﴾

আর নূহ যে কথার দাবী করে, যেমন মাবুদ বা উপাস্য এক আল্লাহ পাকই, আর কেউ নয়, আল্লাহ পাক মানুষকে নবী রূপে প্রেরণ করেন, মানুষকে মৃত্যুর পর পুনঃ জীবন দেয়া হবে এবং তাদেরকে কেয়ামতের দিন জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব নিকাশের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির করা হবে এ সব কথা ইতিপূর্বে আমরা কখনও শুনিনি।

اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌۢ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٢٥﴾

আসলে লোকটির মাথায় ছিট, রয়েছে। কেননা, দুনিয়াতে যে কথা নেই সে এমন কথা বলে। অতএব, তোমরা একটি নিদৃষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা কর, হয়তো এর মৃত্যু হয়ে যাবে, অথবা তার পাগলামির অবসান ঘটবে।

হযরত নূহ (আঃ) যখন উপলব্ধি করলেন, তার পথভ্রষ্ট জাতি পথে আসবে না, সূদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর চরম মেহনত এবং অক্লান্ত সাধনা করেও তাদেরকে হেদায়েত করা সম্ভব হলনা, তখন তিনি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দোয়া করলেন। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ﴿٢٦﴾

নূহ বললেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমাকে সাহায্য কর, কেননা, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে।

হযরত নূহ (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে আরজী পেশ করলেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমার কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর, তাদের মোকাবেলায় আমাকে জয় যুক্ত কর। অথবা এর অর্থ হল, আমি কাফেরদেরকে যে আযাবের ভয় প্রদর্শন করেছি, তা নাজিল কর এবং তাদেরকে ধ্বংস কর।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, হযরত নূহ (আঃ) এই দোয়া তখন করেছিলেন, যখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাঁকে অবগত করানো হয়েছিল যে তাঁর জাতির যে অল্প সংখ্যক লোক ঈমান এনেছে, তাদের পর আর কেউ ঈমান আনবেনা।

মূলতঃ হযরত নূহ (আঃ) যখন দেখলেন, সাড়ে নয়শত বছর সর্বাত্বক চেষ্টা করার পরও তাঁর পাপীষ্ঠ জাতি হেদায়েত কবুল করলো না, প্রতি দিনই তারা তাঁকে প্রহার করতো এবং তাঁর বিরোধীতায় তারা সীমা অতিক্রম করতো এবং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তিনি জানতে পারলেন যে তারা হেদায়েত কবুল করবেনা, তখন তিনি এই দোয়া করলেন, "হে আমার প্রতিপালক! এই দুরাত্মা পাপীষ্ঠদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর, তারা পথে আসবার নয় এবং তারা কখনও সত্যদ্রোহীতা বর্জন করবেনা

فَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ

তখন আমি তাঁর নিকট ওহী প্রেরণ করলাম এবং তার দোয়া কবুল করলাম।

اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا

অর্থাৎ আমার তত্ত্বাবধানে এবং নির্দেশ মোতাবেক তুমি একটি নৌযান তৈরী কর, যাতে করে কেউ তার কোন ক্ষতি করতে না পারে।

فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ

অবশেষে যখন আমার আজাবের আদেশ আসলো এবং উনান উথলে উঠলো, আমি আদেশ দিলাম, প্রত্যেক শ্রেণীর জোড়ের দু'টি করে আর তোমার পরিবার বর্গ সহ সকল মোমেনকে নৌকায় উঠাও। হযরত নূহ (আঃ) এর জাতির প্রতি আজাব আপতিত হওয়ার লক্ষণ বলা হয়েছে যখন উনানের নিম্নদেশ থেকে পানি উথলে উঠবে, তখন বুঝতে হবে যে আজাব শুরু হয়ে গেছে। (হযরত নূহ (আঃ) এর বাড়ী ছিল কুফায়। যে উনানের নিম্নদেশ থেকে প্রথম আজাবের পানি উথলে উঠেছিল তা এখনও বিদ্যমান রয়েছে। এখনও কিছু পানি সেখানে দেখা যায়।) হযরত নূহ (আঃ) এর স্ত্রী যখন উনানের পানি দেখার সংবাদ তাঁকে দিল, তখন সঙ্গে সঙ্গে তিনি মোমেনদেরকে নিয়ে নৌযানে আরোহন করলেন।

اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ

অর্থাৎ যাদের ব্যাপারে পূর্বাহ্নেই আজাবের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

তফসীরকারগণ বলেছেন, তারা হল হযরত নূহ (আঃ) এর স্ত্রী ও পুত্র কেনান। তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি বলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়।

আর ঐ পাপীষ্ঠদের সম্পর্কে আমার নিকট কোন সুপারিস করবে না, নিশ্চয়ই তারা নিমজ্জিত হবে তাদের ধ্বংস অবধারিত হয়ে আছে। হযরত নূহ (আঃ) এর এই ঘটনা বিস্তারিত ভাবে সূরায়ে হুদ এ বর্ণিত হয়েছে।১

فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ
الَّذِىْ نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٨﴾ وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا
وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿٢٩﴾ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ وَّاِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ ﴿٣٠﴾
ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ﴿٣١﴾ فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا
مِّنْهُمْ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۭ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٣٢﴾

তরজমা

(২৮) এরপর যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীগণ নৌযানে আসন গ্রহণ করবে তখন বল, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের জন্যে যিনি আমাদেরকে জালেম সম্প্রদায়ের হাত থেকে উদ্ধার করেছেন।

(২৯) আর বল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করাও যা হবে কল্যাণকর, আর তুমি উত্তম অবতারণকারী।

(৩০) নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিদর্শন, আমিতো তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম।

(৩১) পুনরায় তাদের পর অন্য এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম।

(৩২) এরপর তাদের মধ্যে তাদেরই মাঝ থেকে একজন রসূল প্রেরণ করি। (সে বলেছিল) তোমরা এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মাবুদ নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবেনা?

১এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন, খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৬০-৬৮

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রলয়ংকরী বন্যা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে একটি নৌযান নির্মাণ করার আদেশ ছিল। আর এ আয়াতে হযরত নূহ (আঃ) নির্মিত ঐ নৌযানটি সম্পর্কে কিছু আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে। (১) হযরত নূহ (আঃ) কে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌযানে আরোহণ করবে, তখন তোমাদের কর্তব্য হল আল্লাহ পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কেননা, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা করেছেন। আর শোকর গুজারীর যে ভাষা হবে তাও আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾

অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের যিনি আমাদেরকে জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে নাজাত দিয়েছেন। (২) আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এই দোয়া কর।

وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿٢٩﴾

আর বল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমন ভাবে অবতরণ করাও যা হবে কল্যাণকর, আর তুমি উত্তম অবতারণকারী।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, নৌযানে বরকতময় অবতরণের তাৎপর্য হল, আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আঃ) ও তাঁর সঙ্গী মোমেনদেরকে দুশমনদের জুলুম থেকে নাজাত দিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ পাকের এবাদতে মশগুল থাকার একটি সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছেন। আর জমিনে বরকতের সাথে অবরতণের তাৎপর্য হল এই যে আল্লাহ পাক নিমজ্জিত হওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আঃ) এর বংশধর রক্ষা করেছেন এবং তাঁর বংশধরদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন ও অধিক পরিমানে রিজিক বৃদ্ধি করেছেন এবং নিশ্চিন্ত মনে আল্লাহ পাকের এবাদত করার সুযোগ দিয়েছেন।

এ দোয়া করার হুকুম হয়েছে একমাত্র হযরত নূহ (আঃ) এর প্রতি, তাঁর নিজের জন্য ও সাথীদের জন্য। দু'টি কারণে (১) এর দ্বারা হযরত নূহ (আঃ) এর মাহাত্মের বহিঃপ্রকাশ হয়েছে। (২) এর দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইংগীত করা হয়েছে যে হযরত নূহ (আঃ) এর দোয়া তাঁর সাথীদের জন্য যথেষ্ট, তাদের দোয়া করার কোন প্রয়োজন নেই।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ

নিশ্চয়ই এ ঘটনায় অনেক নিদর্শন রয়েছে।

وَّاِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ ۝٣٠

আর এ নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করে আমি অবশ্যই আমার বন্দাদের পরীক্ষা করবো।

لَاٰيٰتٍ

অর্থাৎ এতে রয়েছে অনেক এমন নিদর্শন সমূহ যা আল্লাহ্‌ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতকে প্রমাণ করে, আর এ কথা প্রকাশ করে যে তিনি মোমেনদের প্রতি দয়া করেন, আর কাফেরদের প্রতি গজব নাজিল করেন। আর এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য রয়েছে শিক্ষণীয় বিষয়।

وَّاِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ

এ বাক্যের اِنْ শব্দটি আসলে اِنَّ ছিল। অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি নূহ (আঃ) এর সম্প্রদায়কে বিপদগ্রস্থ করবো। অথবা এর অর্থ হল নিশ্চয়ই আমি আমার বন্দাদের পরীক্ষা করবো। আর কোন কোন তফসীরকার এই বাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, হযরত নূহ (আঃ) কে নবী মনোনিত করে প্রেরণ করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর জাতিকে পরীক্ষা করা।

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ۝٣١

পুনরায় তাদের পর অন্য এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম।

অর্থাৎ নূহ (আঃ) এর জাতিকে নিমজ্জিত করার পর আর একটি জাতি সৃষ্টি করেছিলাম। এরপর তাদের নিকটও তাদেরই মধ্য থেকে রসূল প্রেরণ করেছি।

আলোচ্য আয়াতের قَرْنًا اٰخَرِيْنَ দ্বারা আদ জাতি বা সামুদ জাতিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন এর দ্বারা আদ জাতিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, হযরত নূহ (আঃ) এর জাতির ধ্বংসের পর আদ জাতিকেই সৃষ্টি করা হয়েছিল, যাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ পাক রসূল প্রেরণ করেছিলেন। আর এই রসূল হলেন হযরত হুদ (আঃ)। আর যদি সামুদ জাতি উদ্দেশ্যে করা হয় তবে رسول শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে হযরত সালেহ (আঃ)।

اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝٣٢

(সে বলেছিল) তোমরা এক আল্লাহ্‌ পাকের বন্দেগী কর, তিনি **ব্যতীত** তোমাদের কোন মাবুদ নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবেনা? হযরত নূহ (আঃ) তাঁর জাতিকে সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর ধরে উপদেশ দিয়েছিলেন, আল্লাহর আজাবের

ভয় দেখিয়েছিলেন, আল্লাহর দ্বীন গ্রহণের জন্য তাদের প্রতি আহবান জানিয়েছিলেন। কিন্তু তারা সেই আহবানে সাড়া দেয়নি; বরং তারা বলেছিল, এ লোকটি আমাদেরই ন্যায় মানুষ, তার এমন কি বৈশিষ্ট রয়েছে যার জন্যে আমরা তার কথা মেনে চলবো।

হযরত নূহ (আঃ) বলেছিলেন, এই জীবনের অবসান ঘটবে মৃত্যুর মাধ্যমে, কিন্তু কথা এখানেই শেষ নয়; বরং মানুষকে পুনঃর্জীবন দেয়া হবে এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাজির করা হবে এবং প্রত্যেকটি মানুষকে তার সারা জীবনের কৃত কর্মের হিসাব দিতে হবে। এর জবাবে তার জাতি বলেছে, এই লোকটি এ সব কথা শুধু নিজের ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তারের জন্যই বলছে। তার কথা মানার অর্থ নিজেদেরকে অপমান করা যা আমরা কখনও মেনে নিতে পারিনা।

হযরত নূহ (আঃ) এর জাতি মনে করতো, দুনিয়ার এ বর্তমান জীবনই চির সত্য। অতএব, এ জীবনকে ভোগ কর। তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার কারণেই তারা হযরত নূহ (আঃ) এর প্রতি বিশ্বাস করেনি; বরং তাঁর প্রতি জুলুম ও অকথ্য নির্যাতন করেছে, অবশেষে আল্লাহর গজবে তারা ধ্বংস হয়েছে। আর এজন্যই হযরত নূহ (আঃ) পূর্বেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন।

أَفَلَا تَتَّقُونَ

তবুও কি তোমরা ভয় করোনা, তবুও কি তোমরা সাবধান হওনা?

অর্থাৎ তোমাদের কল্পনা বিলাসী হওয়া উচিত নয়; বরং পরিণামদর্শী, বাস্তববাদী হওয়া উচিত।

হযরত নূহ (আঃ) এর জাতি আখেরাতকে অস্বীকার করে যে সব কথা বলতো, আধুনিক কালের অনেক লোকও এ ধরণের কথা বলে। যেমন হযরত নূহ (আঃ) এর পর আদ জাতি ও সামুদ জাতি তাদের নিকট প্রেরিত আম্বিয়ায়ে কেরামের কথা শ্রবণ করেনি, অবশেষে তারাও ধ্বংস হয়েছে।

১। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, তফসীরে নূরুল কোরআন ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৮৪-২৮৯

وَقَالَ
الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ
وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا
لَخَاسِرُونَ ﴿٣٤﴾ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ
مُخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا
حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾ إِنْ هُوَ
إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ
رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٣٩﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿٤٠﴾
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿٤٢﴾

তরজমা

(৩৩) তাঁর জাতির যে প্রধানরা আল্লাহ পাকের অবাধ্য হয়েছে এবং আখেরাতে হাজির হওয়াকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে দান করেছিলাম অনেক ভোগ-সম্পদ, তারা বলেছিল, এ-তো তোমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ, তোমরা যা আহার কর সে তাই আহার করে এবং তোমরা যা পান কর সেও তাই পান করে।

(৩৪) যদি তোমরা তোমাদেরই ন্যায় একজন মানুষের অনুগত হও তবে (এমন অবস্থায়) অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

(৩৫) সে কি তোমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতিই দেয় যে যখন তোমরা মৃত্যুর পর মাটিতে ও অস্থিতে পরিণত হবে তখন তোমাদেরকে পুনরুত্থান করা হবে?

(৩৬) অসম্ভব, তোমাদেরকে যে সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা কখনও হবার নয়।

(৩৭) দুনিয়ার জীবনই আমাদের জীবন, এখানেই আমাদের জীবন মরণ, আমাদিগকে কখনও পুনরায় উঠতে হবেনা।

(৩৮) সে-তো এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ পাকের উপর মিথ্যা রচনা করছে আর আমরা তাকে বিশ্বাস করবার নই।

(৩৯) আল্লাহর নবী বলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর, তারা আমাকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে।

(৪০) আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ অচিরেই তারা আক্ষেপ করবে।

(৪১) এরপর সত্য সত্যই তাদেরকে ভয়ংকর গর্জন আঘাত করলো এবং আমি তাদেরকে তরঙ্গ-তাড়িত আবর্জনার ন্যায় করে দিলাম। তাই পাপীষ্ঠ সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গেল।

(৪২) তাদের পরে আবার আমি অন্যান্য জাতি সৃষ্টি করি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে হযরত নূহ (আঃ) এর জাতির সলিল সমাধির পর আল্লাহ পাক অন্য জাতিকে সৃষ্টি করেন। এর দ্বারা কোন্ জাতিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? এ সম্পর্কে কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, তারা ছিল আদ জাতি। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এমতই পোষণ করতেন।১

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, তারা ছিল সামুদ জাতি। আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েতের জন্য স্বীয় রসূল প্রেরণ করেন। আদ জাতি হলে হযরত হুদ (আঃ) এবং সামুদ জাতি হলে হযরত সালেহ (আঃ)। তাঁরা নিজ নিজ জাতিকে আল্লাহ পাকের নাফরমানী থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন এবং এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করার ও তাঁর বন্দেগী করার আহবান জানান। কিন্তু তারা আল্লাহর নবীর আহবানে সাড়াদিতে অস্বীকৃতি জানায়। হযরত নূহ (আঃ) এর জাতির ধ্বংস দেখেও তারা কোন প্রকার শিক্ষা গ্রহণ করেনি। সরল সঠিক পথে আসার জন্যে তারা প্রস্তুত হয়নি; বরং তারা আল্লাহ পাকের নাফরমান হয়েছে, তাঁর প্রেরিত নবীকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, তাই তাদের নেতারা অন্যায়, অসুন্দর ভীত্তিহীন কথা বলেছে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

১। তফসীরে কবীর, খন্ড- ২৩, পৃষ্ঠা-১৭

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا

তাঁর জাতির যে প্রধাণরা আল্লাহ পাকের অবাধ্য হয়েছে এবং আখেরাতে হাজির হওয়াকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে দান করেছিলাম অনেক ভোগ সম্পদ, তারা বলেছিল, এ-তো তোমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ, তোমরা যা আহার কর সে তাই আহার করে এবং তোমরা যা পান কর, সেও তাই পান করে।

অতএব, তার এমন কোন বিশেষত্ব নেই যার কারণে আমরা তার কথা মেনে চলবো। ঐ পথভ্রষ্ট জাতির প্রধানরা অত্যন্ত ঔধ্বত্বপূর্ণ কথা বলে তারা একথাও বলে, যদি এর কথা তোমরা মেনে চল তবে তোমরা হবে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ, তোমরা হবে অপমাণিত। অতএব, অযথা কেন অপমাণিত হবে, অকারণে কেন নিজেদের অপমান ডেকে আনবে?

তফসীরকারগণ বলেছেন, তারা ছিল অত্যন্ত বোকা, মুর্খ। কেননা, তারা তাদের ন্যায় একজন মানুষকে আল্লাহর রসূল হিসাবে মেনে নিতে রাজি হয়নি এবং এ কাজকে নিজের জন্য অপমানজনক মনে করেছে। অথচ প্রাণহীন পাথরকে পূজা করতে অথবা হাতের বানানো মূর্তির সম্মুখে মাথা নত করতে অপমাণিত বোধ করেনি। ঐ ভাগ্যহত জাতির প্রধানরা এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকেই প্রকৃত জীবন মনে করতো। এরপর যে আরও একটি জীবন আসবে এবং সে জীবনে বর্তমান জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব নিকাশ দিতে হবে একথা তারা কোন ভাবেই বিশ্বাস করতে রাজি হতনা। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾

সে কি তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে যখন তোমরা মৃত্যুর পর মাটিতে ও অস্থিতে পরিণত হবে, তখন তোমাদেরকে পুনরুত্থান করা হবে?

আল্লাহর নবী আখেরাতের তথা চিরস্থায়ী জীন্দেগীর কথা বলতেন। কিন্তু তারা আখেরাতে বিশ্বাস করতো না। তারা বলতো, মরণের পর পচে গলে যখন অস্থি চূর্ণ হয়ে যাবে মানুষ মাটির সাথে মিশে যাবে, তার পরে আবার জীবিত হবে একথা কি করে বিশ্বাস করতে পারি।

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾

অসম্ভব, তোমাদেরকে যে সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে (তা কখনও হবার নয়)।

অর্থাৎ তারা পূনঃর্জীবন লাভের কথা–তথা পরকালীন জিন্দেগীর কথা অসম্ভব অকল্পনীয় মনে করতো। তারা আরও বলেছে, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا

একমাত্র এ দুনিয়ার জীবনই প্রকৃত জীবন। এখানেই আমাদের জীবন মরণ, আর আমাদেরকে কখনও উঠতে হবেনা। বর্তমান জীবনই প্রকৃত জীবন, এরপর আর কিছুই নেই। তাদের এই মূর্খতা প্রসূত ধারণা যে সম্পূর্ণ ভীত্তিহীন এই সত্য পবিত্র কোরআন বারে বারে ঘোষণা করেছে।

نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾

এই পৃথিবীতে আমাদের কারো মৃত্যু হয়, আর কেউ জন্ম গ্রহণ করে, আমাদেরকে পুনঃর্জীবন দিয়ে উঠানো হবেনা। ঐ কাফেররা পুনঃর্জীবন ও পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতো না তারা মনে করতো এ জীবনই সব কিছু এরপর আর কিছুই নেই। অথচ কোরআন এই সত্য ঘোষণা করেছে যে, এ জীবনের পরে আসবে আর একটি জীবন। এ জীবনের কৃতকর্মের ফল বা পরিণতি ভোগ করতে হবে। প্রতিটি মানুষকে তার জীবনের প্রতিটি কর্মকান্ডের জন্য হিসাব নিকাশ দিতে হবে। এজন্য কোরআন এ প্রশ্ন উথাপন করেছেঃ

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا

তোমরা কি মনে করেছো যে আমি তোমাদেরকে অযথা উদ্দেশ্য-বিহীন সৃষ্টি করেছি? অবশ্যই নয়।

মানব জীবনের উদ্দেশ্য

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য রয়েছে, সেই উদ্দেশ্য সফল করার মাধ্যমেই জীবন সাধনাকে স্বার্থক করতে হবে। যে সেই উদ্দেশ্যকে সফল করবে না, তার জীবন সাধনা হবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত। সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আর আমি জ্বীন ও মানুষকে এজন্য সৃষ্টি করেছি যেন তারা আমার বন্দেগী করে, যেন তারা আমার মারেফত হাসিল করে। অতএব, আল্লাহ্ পাকের বন্দেগী করাই হল জীবনের উদ্দেশ্য। যারা আল্লাহ্ পাকের বন্দেগী করেনা, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেনা, তাঁর বিধান মেনে চলেনা তাদের জীবন সাধনা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾

সেতো এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ্ পাকের উপর মিথ্যা রচনা করছে, আর আমরা তাকে বিশ্বাস করবার নই।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর তরফ থেকে রসূল হওয়ার দাবী করছে এবং মানুষের পুনঃজীবন পুনরুত্থান ও কেয়ামতের কথা বলছে, এ সব কথার দ্বারা সে আল্লাহ্ পাকের উপর মিথ্যা রচনা করছে, আমরা এ সব কথা বিশ্বাস করবো না কেননা, সে তো আমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ।

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٣٩﴾

আল্লাহর নবী বলেন, হে আমার প্রতিপাক! আমাকে সাহায্য কর, তারা আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করছে। কাফেররা যখন আল্লাহ্ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে অস্বীকৃতি জানায় এবং কেয়ামতের দিনের কথাও অমান্য করে, আল্লাহর নবীকে মিথ্যা জ্ঞান করে, তখন তিনি আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে ফরিয়াদ করেন এই বলে, হে পরওয়ারদেগার! আমাকে সাহায্য কর, অর্থাৎ তাদের প্রতি আযাব নাজিল কর এবং এ কাফেরদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ কর। কেননা, তারা আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করছে। যখন আল্লাহর নবীগণ তাঁদের জাতির হেদায়েতের সর্বাত্মক চেষ্টা করার পরও তারা সত্য বিরোধীতায় মত্ত থাকে তখন তাঁরা আল্লাহ্ পাকের সাহায্য কামনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে দোয়া কবুল হয় এবং জবাব আসে

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿٤٠﴾

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেন, অচিরেই তারা আক্ষেপ করবে। অর্থাৎ তাদের আযাব অতি নিকটবর্তী। অচিরেই তারা নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করবে এবং অল্প সময় পরেই তারা নিজেদের কৃত কর্মের জন্য অনুতাপ করতে থাকবে। অর্থাৎ যখন স্বচক্ষে আল্লাহর আজাব দেখবে, তখন তারা আক্ষেপ করতে থাকবে, কিন্তু সেই আক্ষেপ তাদের জন্য উপকারী হবেনা, আর ঐ সময় আসবে অনতিবিলম্বে।

فَاَخَذَتۡهُمُ الصَّيۡحَةُ بِالۡحَقِّ فَجَعَلۡنٰهُمۡ غُثَآءً ۚ

এরপর সত্য সত্যই তাদেরকে ভয়ংকর গর্জন আঘাত করলো এবং আমি তাদেরকে তরঙ্গ তাড়িত আবর্জনার ন্যায় করে দিলাম।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের صيحة শব্দটির অর্থ হল, ধ্বংস। আরবী ভাষার বিখ্যাত গ্রন্থ কামুসে صيحة শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে, প্রচন্ড গর্জন। আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, صيحة শব্দটি আজাব অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এভাবে অবাধ্য কাফের সম্প্রদায় আল্লাহ পাকের রহমত থেকে বঞ্চিত হয়। খড় কুটোর ন্যায় আল্লাহ পাকের আজাবে তারা ভেসে যায়।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এই বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে এই ঘটনাটি সামুদ জাতিরই। কেননা, প্রচন্ড গর্জন দ্বারা তাদেরকেই ধ্বংস করা হয়।১

আর আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয় প্রচন্ড ঝড় তুফান দ্বারা, যা সাত দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল এবং আদ জাতি ঐ তুফানে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।২

فَبُعۡدًا لِّلۡقَوۡمِ الظّٰلِمِيۡنَ ﴿٤١﴾

তাই পাপীষ্ঠ সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গেল। তারা ছিল জালেম তারা তাদের জুলুমেরই শাস্তি ভোগ করেছে, আল্লাহ পাক তাদের প্রতি জুলুম করেননি, প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পরিণতি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। অতএব, আল্লাহ পাকের প্রিয় রসূলের বিরোধীতা থেকে প্রত্যেকেরই বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য। যে এই কর্তব্য পালনে অবহেলা করবে তার শাস্তি হবে অবধারিত।

ثُمَّ اَنۡشَاۡنَا مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ قُرُوۡنًا اٰخَرِيۡنَ ﴿٤٢﴾

তাদের পরে আবার আমি অন্যান্য জাতি সৃষ্টি করি। যেমন সামুদ জাতি, লূত (আঃ) এর সম্প্রদায় এবং শোয়াইব (আঃ) এর সম্প্রদায় প্রভৃতি।

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৪৪৭

২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৮৭

مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُوْنَ ﴿٤٣﴾ ثُمَّ اَرْسَلْنَا
رُسُلَنَا تَتْرَا ۖ كُلَّمَا جَاءَ اُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ
بَعْضًا وَّجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٤٤﴾ ثُمَّ
اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٥﴾
اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ ﴿٤٦﴾ فَقَالُوْٓا
اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ ﴿٤٧﴾ فَكَذَّبُوْهُمَا
فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ﴿٤٨﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ
يَهْتَدُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗٓ اٰيَةً وَّاٰوَيْنٰهُمَآ اِلٰى
رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ ﴿٥٠﴾

তরজমা

(৪৩) কোন জাতিই তার জন্যে নির্ধারিত সময়কে ত্বরান্বিত করতে পারেনা, বিলম্বিতও করতে পারেনা।

(৪৪) এরপর আমি একের পর এক আমার রসূল প্রেরণ করেছি, যখনই কোন জাতির নিকট আমার রসূল এসেছেন, তখনই তারা মিথ্যাবাদী বলেছে। এরপর আমি তাদেরকে একের পর এক ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে কিচ্ছা-কাহিনীতে পরিণত করে দিয়েছি। অতএব, অবিশ্বাসীরা ধ্বংস হোক।

(৪৫) এরপর আমি আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণ সহ মুসা ও তাঁর ভাই হারুণকে প্রেরণ করলাম।

(৪৬) ফেরাউন ও তার দলনেতাদের নিকট। কিন্তু তারা অহংকার করলো, আর তারা ছিল অত্যন্ত দাম্ভিক সম্প্রদায়।

(৪৭) তারা বলে, আমরা কি আমাদেরই ন্যায় দু'টি লোকের প্রতি বিশ্বাস করবো, আর যাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করে?

(৪৮) এরপর তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বললো, এর পরিণতিতে তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হল।

(৪৯) আর নিশ্চয়ই আমি মুসাকে কিতাব দান করেছিলাম, যাতে তারা সরল সঠিক পথ লাভ করে।

(৫০) এবং আমি মরিয়ম পুত্র এবং তার জননীকে একটি নিদর্শন করি, তাদেরকে আমি আশ্রয় দিয়েছিলাম এক নিরাপদ ও প্রস্রবন বিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হযরত সালেহ (আঃ) হযরত লূত (আঃ), হযরত শোয়াইব (আঃ) প্রমুখ আম্বিয়ায়ে কেরামের ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। এরপর আদ জাতি বা সামুদ জাতির ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর এরশাদ হয়েছে যে আরও অনেক জাতিকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি স্বরূপ যথা সময়ে ধ্বংস হয়েছে।

আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যে জাতির ধ্বংসের জন্য আল্লাহ পাক যে সময় নিদৃষ্ট করে রেখেছিলেন, সে জাতি সে নিদৃষ্ট সময়েই ধ্বংস হয়েছে, এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি এবং তাদের ধ্বংসকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি।

সূরা আরাফে আদ ও সামুদ জাতির ঘটনা এবং হযরত লূত (আঃ) এর সম্প্রদায়ের কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে।১

ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا

এরপর আমি একের পর এক আমার রসূল প্রেরণ করেছি।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, تترا শব্দটি মূলতঃ وترا ছিল। আর تواتر বলা হয় কোন বস্তু একের পর এক আসা তথা অনবরত আসাকে। হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) বর্ণিত একখানি হাদীসে রয়েছে।

لا باس بقضاء تترا

১। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, তফসীরে নূরুল কোরআন ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৮৫-৩১৮

অর্থাৎ রমজানের যে সব রোজা কাযা হয়েছে, সেগুলো বিভিন্ন ভাবে আদায় করায় কোন ক্ষতি নেই। আর এজন্যেই خبر متواتر সেই হাদীসকে বলা হয়, যা ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়, যাদের কোন অসত্যের উপর একমত হওয়া সম্ভব নয়।

تترا শব্দটির এই ব্যাখ্যা গ্রহণের পর ثم ارسلنا আয়াতের অর্থ হবে, এরপর আমি একটি জাতি সৃষ্টি করি এবং তাদের হেদায়েতের জন্য একজন রসূল প্রেরণ করি। এরপর আমি অন্য একটি জাতি সৃষ্টি করি এবং তাদের হেদায়েতের জন্য অন্য একজন নবী সৃষ্টি করি।১

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ এ কথাও লিখেছেন, আল্লাহ পাক একদিকে বিভিন্ন জাতির হেদায়েতের জন্য নবী রসূলগণকে প্রেরণ করতে থাকেন, অন্যদিকে সে জাতির পাপীষ্ঠ লোকেরা আল্লাহর প্রেরিত রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করতে থাকে। এর শোচনীয় পরিণাম স্বরূপ তারা কোপগ্রস্থ হতে থাকে। তাদেরকে এভাবে ধ্বংস করা হয় যে পৃথিবীতে তাদের কোন চিহ্ন পর্যন্ত রয়নি। তাদের অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যায় ইতিহাসের পাতায়, গল্প কাহিনীর উপাখ্যানে। তাদের পরবর্তী লোকদের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে ঐ কিচ্ছা-কাহিনীগুলোই যথেষ্ট। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

كُلَّمَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم
بَعْضًا وَجَعَلْنَٰهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٤﴾

যখনই কোন জাতির নিকট আমার রসূল এসেছেন, তখনই তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছে, এরপর আমি তাদেরকে একের পর এক ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে কিচ্ছা-কাহিনীতে পরিণত করে দিয়েছি। অতএব, অবিশ্বাসীরা ধ্বংস হোক।

كَذَّبُوهُ

যেহেতু অধিকাংশ লোকই নবী রসূলগণের বিরোধিতা করতো এবং তাঁদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করতো তাই সকলের সম্পর্কে এ মন্তব্য করা হয়েছে। যদিও প্রত্যেক নবীর উম্মতের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোক নবী রসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছিল।

فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -১৮৮-৮৯

অর্থাৎ যেভাবে একের পর এক নবীগণকে প্রেরণ করেছি, ঠিক তেমনিভাবে একের পর এক দুরাত্মা কাফেরদেরকে ধ্বংসও করেছি, তাদেরকে মুলোৎপাটন করা হয়েছে।

وَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ

আর তাদের কিচ্ছা-কাহিনীগুলোকে অনাগত ভবিষ্যতের অগণিত মানুষের জন্য শিক্ষনীয় ঘটনা করে রেখেছি অর্থাৎ পরবর্তী কালের মানুষ তাদের শোচনীয় পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ

যারা নবী রসূলগণের প্রতি ঈমান আনেনি, তাঁদেরকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত সত্য নবী রসূল হিসাবে মেনে নেয়নি এবং তাঁদেরকে সত্যের আহবায়ক হিসাবে গ্রহণ করেনি তাদের ধ্বংস অনিবার্য, তারা ধ্বংস হোক।

ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٥﴾

এরপর আমি আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণ সহ মুসা ও তাঁর ভাই হারুণকে প্রেরণ করলাম।

অর্থাৎ এরপর ফেরাউন ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ পাক মুসা (আঃ) ও তাঁর ভাই হারুণ (আঃ) কে প্রেরণ করলেন। তদানীন্তন কালে ফেরাউন ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। আত্মগরিমা এবং অহংকারে এমনভাবে মেতে উঠেছিল যে ফেরাউন খোদায়ী দাবী করে ফেলেছিল এবং অহংকারের কারণে আল্লাহর নবীকে আমল দিতে রাজী হয়নি।

فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ ﴿٤٦﴾

তারা অহংকার করে এবং তরা ছিল অত্যন্ত দাম্ভিক সম্প্রদায়।

আলোচ্য আয়াতের سلطان مبين শব্দটির অর্থ হল সুস্পষ্ট দলীল এমন দলীল যা প্রতিপক্ষকে নিশ্চুপ করে দেয়। অথবা سلطان مبين শব্দ দ্বারা হযরত মুসা (আঃ)-এর সেই ঐতিহাসিক লাঠিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, ঐ লাঠিটি তাঁর সর্ব প্রথম মোজেযা। এজন্যেই তাঁর আলোচনা করা হয়েছে বিশেষভাবে, আর এজন্যে যে ঐ লাঠি দ্বারা বিভিন্ন সময় একাধিক মোজেযা প্রকাশিত হয়েছে, যেমন ঐ

লাঠিটি অজগর সর্পে পরিণত হত। যাদুকররা রশি দ্বারা যে সাপ বানিয়ে ছেড়েছিল, ঐ লাঠিটি অজগর সর্পের আকৃতি ধারণ করে যাদুকরদের ছেড়ে দেয়া সাপগুলোকে গিলে ফেলেছিল। আর ঐ লাঠির আঘাতে লোহিত সাগরের পানি দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। আর ঐ লাঠির আঘাতেই আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরতে একটি ছোট পাথর থেকে ঝরণা প্রবাহিত হয়েছিল, যার পানি ছয় লক্ষ বণী ইসরাঈলের জন্য যথেষ্ট ছিল। হযরত মুসা (আঃ) এর কাফেলা যেখানে বিশ্রাম রত হত, এ লাঠি চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে তাদের হেফাজতের দায়িত্ব পালন করতো। আর ঐ লাঠিটি অন্ধকার রাত্রে প্রদীপের কাজ করতো। আর ঐ লাঠিটি এক সময় ফলবান বৃক্ষে পরিণত হয়েছিল। আর ঐ লাঠিটি কূপ থেকে পানি উত্তোলনের জন্যে রশি ও বালতির কাজও করেছে। এ সবই ছিল হযরত মুসা (আঃ) এর মোজেযা আর মোজেযা হল নবীর নবুওয়তের দলীল।

আর কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য আয়াতের আয়াত শব্দটির অর্থ বলেছেন, মোজেযা নয়; বরং বিধান। অর্থাৎ আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আঃ) ও হারুন (আঃ) কে তাঁর বিধান ও মোজেযা সহ প্রেরণ করেছেন। কিন্তু এতদ্‌সত্বেও দুরাত্মা কাফেররা ঈমান আনেনি, কেননা, তারা ছিল অহংকারী।

فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ

কিন্তু তারা অহংকার করলো, আর তারা ছিল অত্যন্ত দাম্ভিক সম্প্রদায়।

অর্থাৎ তাদের এই অহংকারের কারণেই তারা সত্য গ্রহণে ব্যর্থ হল। তাদের অহংকার ও আত্মগরিমা সত্য গ্রহনের পথে বাধা হয়ে দাড়ালো।

فَقَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ ﴿٤٧﴾

ঐ পাপীষ্ঠ দাম্ভিক লোকেরা বললো, যারা আমাদেরই ন্যায় মানুষ, যাদের স্বজাতি আমাদের পদানত গোলাম, আমরা কি এমন দু'টি লোকের কথা মেনে চলবো? তা কখনও সম্ভব নয়।

ফেরাউন ও তার দলবলের এই অহংকারই মূলতঃ তাদের ধ্বংসের কারণ হয়।

فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ﴿٤٨﴾

এরপর তারা তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী বললো, এর পরিণতিতে তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হল।

কেননা, ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে লোহিত সাগরে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করা হয়।১

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٤٩﴾

আর আমি মুসাকে দান করি কিতাব যাতে করে তারা হেদায়েত পায়।

ফেরাউন এবং তার দলবলের ধ্বংস হওয়ার পর আল্লাহ পাক বণী ইসরাঈল জাতির হেদায়েতের জন্যে হযরত মুসা (আঃ) কে তওরাত দান করেন যেন বণী ইসরাঈল জাতি তওরাত মোতাবেক জীবন যাপন করে আল্লাহ পাকের সন্তষ্টি লাভ করতে পারে। আর একথা সর্বজন বিদিত যে যারা দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে তারাই আখেরাতে জান্নাত লাভে ধন্য হবে। আর এজন্যই তওরাত অবনতীর্ণ হয়।

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗۤ اٰيَةً

"আর আমি মরিয়ম পুত্র এবং তার জননীকে একটি নিদর্শন করি।" পিতা ব্যতীত

হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্ম নিঃসন্দেহে একটি নিদর্শন। কোন পুরুষের সংস্পর্ষ ব্যতীত গর্ভ ধারণ এবং সন্তান প্রসব এসব বিস্ময়কর নির্দশন। এসব কিছু মানুষের কাছে বিস্ময়কর এবং অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু আল্লাহ পাকের নিকট কোন কিছুই কঠিন নয়। তিনি যখন ইচ্ছা, যা ইচ্ছা করেন, তাঁর কুদরত হেকমতের কোন সীমা নেই, তাই বিশ্ববাসীর জন্যে হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্ম একটি নিদর্শন, হযরত মরিয়ম (আঃ) ও আল্লাহ পাকের একটি নিদর্শন।

وَّاٰوَيْنٰهُمَاۤ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ ﴿٥٠﴾

আর আমি তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম এক নিরাপদ ও প্রস্রবণ বিশিষ্ট উচ্চভূমিতে। رَبْوَة শব্দটির অর্থ হল উচ্চস্থান।

হযরত আব্দুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) বলেছেন এটি ছিল দামেশক। সাঈদ এবনে মুছাইয়্যেব (রাঃ) এবং মোকাতেল (রাঃ) এ মতই পোষণ করতেন।

তফসীরকার জাহ্যাক (রঃ) বলেছেন এই স্থানটি ছিল দামেশক শহরের উপকণ্ঠে।

১। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, তফসীরে নূরুল কোরআন ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৯৯-৩০৫

হযরত আবুহুরাইরাহ (রাঃ) বলেছেন, رَبْوَةٍ দ্বারা রমলাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আতা (রাঃ) এর সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর কথার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যে তিনি বলেছেন এ স্থানটি ছিল বায়তুল মোকাদ্দাস। আর কাতাদা (রঃ) এবং কাআব (রঃ) ও এ মত পোষণ করতেন।

এবনে যায়েদ বলেছেন, এটি ছিল মিশর। কেননা ইহুদী রাজা হেরদোস যখন হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করতে ইচ্ছা করে তখন হযরত মরিয়ম (আঃ) ঈসা (আঃ)-কে নিয়ে মিশর চলে যান।

আর সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, এটি ছিল ফিলিস্তীন।১

يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ
وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۭ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٥١﴾ وَاِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ
اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ﴿٥٢﴾ فَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ
زُبُرًا ۭ كُلُّ حِزْبٍۢ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَذَرْهُمْ فِيْ غَمْرَتِهِمْ حَتّٰى
حِيْنٍ ﴿٥٤﴾ اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ
لَهُمْ فِي الْخَيْرٰتِ ۭ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ
رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٨﴾

তরজমা

(৫১) হে রসূলগণ! তোমরা পূত পবিত্র বস্তু থেকে আহার কর, আর সৎকাজ করতে থাক; নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

(৫২) আর নিশ্চয়ই তারা তোমাদেরই ধর্মের লোক, সকলের ধর্মই এক আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব আমাকে ভয় কর।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -১৯১-৯২

(৫৩) কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে তাদের দ্বীনকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে। প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত।

(৫৪) অতএব, তুমি তাদেরকে এক নিদৃষ্ট কাল পর্যন্ত তাদের বিভ্রান্তিতে থাকতে দাও।

(৫৫) তারা কি মনে করে যে আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি দান করি তা দ্বারা

(৫৬) তাদের জন্যে যাবতীয় কল্যাণ তরান্বিত করছি? না, তা নয়, মূলতঃ তারা কিছুই বুঝেনা।

(৫৭) নিশ্চয় যারা থাকে তাদের প্রতিপালকের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত।

(৫৮) আর যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শন সমূহে বিশ্বাস রাখে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে নবী রসূলগণের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। নবী রসূলগণ তওহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের আহবায়ক ছিলেন, তাঁরা তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বনের তাগিদ করতেন। আর এ আয়াত সমূহে তৌহীদে বিশ্বাস এবং তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বনের পাশাপাশি হালাল খাদ্য গ্রহণের এবং নেক আমল করার আহবান রয়েছে। আর এটিই সকল নবী রসূলগণের পথ। যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরাম এ পথের হেদায়েত করেছেন।

কিন্তু অহংকারী পথভ্রষ্ট লোকেরা তাদের প্রবৃত্তির তাড়নায় নবী রসূলগণের বিরোধীতা করেছে। তাদের লোভ লালসা চরিতার্থ করার জন্যে তারা নিজেদের পছন্দনীয় ভিন্ন ধর্ম মতকে অনুসরণ করেছে। তাই আলোচ্য আয়াতে রসূলগণকে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا

হে রসূলগণ! তোমরা পুত পবিত্র বস্তু থেকে আহার কর, আর সৎ কাজ করতে থাক।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের طيبت শব্দটির অর্থ হল, হালাল বস্তু। এ কথাটির তাৎপর্য্য হল, হারাম বস্তু

আহার করোনা, শুধু হালাল বস্তুই আহার কর। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর তাৎপর্য্য হল, তোমরা হালাল ও পরিচ্ছন্ন বস্তু আহার কর, আর এমন খাবার গ্রহণ কর যার কারণে আল্লাহ পাককে ভুলে না যাও তথা আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে গাফেল না হও এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় গাফলতের আবর্তে নিপতিত না হও।

وَاعْمَلُوْا صَالِحًا

আর সৎ কাজ করার যে আদেশ রয়েছে, এর তাৎপর্য্য হল, আল্লাহ পাকের বিধি মোতাবেক আমল করা অর্থাৎ শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য কাজ করা, তার মধ্যে কোন প্রকার শেরক না থাকা, আর এমন কাজ না করা যা আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় নয়।

আয়াতের মর্মকথা

আয়াতের মর্মকথা হল এই যে, আমি প্রত্যেক যুগে মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে নবী রসূলগণ প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে আদেশ দিয়েছি যে তোমরা হালাল বস্তু গ্রহণ করো, কখনও হারাম বস্তু স্পর্শও করোনা। আর সৎকাজ করতে থাক তথা আল্লাহ পাকের বিধি নিষেধ মোতাবেক কাজ করতে থাক এবং আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় কাজ করতে থাক। তফসীরকারগণ একথাও বলেছেন, এ আয়াতে পূর্বকালের অবস্থার বিবরণ রয়েছে।

হাসান বসরী (রঃ), মুজাহেদ (রঃ), কাতাদা (রঃ), সুদ্দী (রঃ), কালবী (রঃ) সহ তফসীরকারগণের এক দলের মত হল, يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ বাক্য দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। আরবদের একটি পন্থা হল, তারা এক ব্যক্তির জন্যেও বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করে। এর দ্বারা ঐ ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম, ফজিলত ও গুরুত্বের দিকে ইংগিত করা হয়। আর একথা বোঝানো হয়েছে যে এক ব্যক্তিই একটি দলের স্থলাভিষিক্ত। অতএব, يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ বলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিশেষ মর্যাদার দিকে ইংগিত করা হয়েছে যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সমগ্র মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছে।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন যে এর দ্বারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও উম্মতের ওলামায়ে কেরামকে খেতাব করা হয়েছে। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

العلماء ورثة الانبياء

আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী হন। আর অন্য একদল তফসীরকার বলেছেন, এর দ্বারা খেতাব করা হয়েছে হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর জননীকে। যখন তারা রাবওয়াতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। পূর্ববর্তী আম্বিয়া কেরামকে যে আদেশ দেয়া হয়েছিল সেই আদেশই তাঁদেরকে দেয়া হয়েছে, যেন তাঁরা পূর্বকালের আম্বিয়ায়ে কেরামের অনুসারী হন।১

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে হালাল রুজির অন্বেষণ করা, পাপাচার থেকে আত্মরক্ষা করা এবং নেক আমল করার নির্দেশ রয়েছে। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে হালাল আহার্য নেক আমল করতে সাহায্যকারী হয়। এজন্যে নবী রসূলগণের মধ্যে সার্বিক কল্যাণ পরিপূর্ণভাবে একত্রিত হয়।

হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর জননীর শ্রমের বদলে যা অর্জিত হত, তা দ্বারা আহার করতেন। হাদীস শরীফে আছে, এমন কোন নবী আগমন করেননি যিনি বকরী চরাননি। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনিও? তিনি এরশাদ করলেনঃ হ্যাঁ আমিও, আমি সামান্য অর্থের বিনিময়ে মক্কাবাসীর বকরী চরিয়েছি। হাদীস শরীফে এ কথাও বর্ণিত আছে, হযরত দাউদ (আঃ) তাঁর নিজের হাতের মেহনতের কামাই আহার করতেন।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ পাকের দরবারে সবচেয়ে পছন্দনীয় রোজা হল হযরত দাউদ (আঃ) এর রোজা। আর পছন্দনীয় হল হযরত দাউদ (আঃ) এর রাত্রি কালের নামাজ। তিনি অর্ধেক রাত নিদ্রিত থাকতেন, এরপর রাতের তিন ভাগের একভাগ তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতেন, আর রাতের ছয় ভাগের একভাগ বিশ্রাম করতেন। একদিন রোজা রাখতেন আর একদিন রাখতেন না। জেহাদের ময়দানে কখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতেন না।

উম্মে আবদুল্লাহ বিনতে সাদ্দাদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে সন্ধ্যাকালে দুধের এক পেয়ালা প্রেরণ করলাম, যেন তিনি এর দ্বারা এফতার করেন। দিনের শেষ ভাগ ছিল, তবে রৌদ্রের কিছুটা তাপ ছিল। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুধ বাহককে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন এ কথা বলে যে যদি তোমার বকরীর দুধ হত তবে ভিন্ন কথা। উম্মে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -১৯২-৯৩

আবদুল্লাহ এই কথা শ্রবণ করে এই সংবাদ প্রেরণ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি নিজের সম্পদ দ্বারা এই দুধ ক্রয় করেছি। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তা পান করলেন। এর পরদিন তিনি খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি অত্যন্ত গরমের সময় দুধ প্রেরণ করেছি, আপনি আমার লোকটিকে ফেরত দিয়ে দিলেন। তখন তিনি এরশাদ করলেন, আমাকে বলা হয়েছে নবীগণ শুধু হালাল বস্তুই গ্রহণ করেন, আর শুধু নেক আমল করেন।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক পবিত্র, তিনি শুধু পবিত্র বস্তুই কবুল করেন।

আল্লাহ পাক মুমিনদেরকে সেই আদেশই দিয়েছেন, যা তিনি তাঁর রসূলগণকেও দিয়েছেন আর সেই হুকুম হলোঃ "হে রসূলগণ! তোমরা পাক পবিত্র বস্তু আহার করো এবং নেক আমল করতে থাকো"। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন যে সুদীর্ঘ সফর করে, আলুথালু চুল বিশিষ্ট, কিন্তু তার পানাহার হারাম পন্থায় অর্জিত ধন-সম্পদ দ্বারা হয়। সে আসমানের দিকে হাত সম্প্রসারিত করে হে পরওয়ারদেগার বলে ডাকে, কিন্তু তার দোয়া কবুল হওয়া অসম্ভব।১

إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٥١

"তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে আমি নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ অবগত," আর তোমাদের কৃতকর্ম অনুযায়ীই তোমাদেরকে বিনিময় দান করবো। আর অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ......

যে সামান্যতম নেক আমলও করবে সে অবশ্যই তার বদলা বা বিনিময় দেখতে পাবে।

পক্ষান্তরে যে সামান্যতম মন্দ কাজ করবে তার শাস্তিও সে দেখতে পাবে।

وَاِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ۝٥٢

আর নিশ্চয়ই তারা তোমাদের ধর্মের লোক, সকলের ধর্মই এক, আর আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব, আমাকে ভয় কর।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৮, পৃষ্ঠা-১৪

অর্থাৎ হে পয়গম্বরগণ! তোমাদের সকলের দ্বীন, মিল্লাত এক, ধর্ম একই, সকলের মাবুদ বা উপাস্য এক আল্লাহ পাকই। আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানানোই তোমাদের সকলের কাজ। মূলনীতিতে, ঈমান আকীদা বিশ্বাসে সকলেই এক, অভিন্ন। তবে যুগের আবর্তন বিবর্তনে নতুন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো শরীয়তের বিধানে কোন পরিবর্তন হয়েছে, তা অস্বাভাবিক নয়।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, প্রত্যেক নবীই তাঁর জাতির হেদায়েতের দায়িত্ব পালন করেছেন। অবশেষে আগমন করেছেন বিশ্বনবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তিনি সমগ্র বিশ্ব মানবের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছেন। কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষের পদচারণা হবে সকলের হেদায়েতের দায়িত্ব তাঁর প্রতিই অর্পিত হয়েছে। কেননা, তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না। পূর্ব কালের নবীগণের মধ্যে এবং তাঁর মধ্যে পার্থক্য এই যে তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ যুগের মানুষকে তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান করেছেন। আর তিনি যেহেতু সর্বশেষ নবী এবং নবীগণের দলপতি বা সাইয়েদুল মুরসালীন এবং খাতেমুন নাবেয়ীন এজন্যে তাঁর পরের সকল যুগের মানুষের জন্যে তাঁর রেসালাত এবং তৌহীদের দাওয়াত রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব কালের নবীগণের শরীয়তে এবং তাঁর শরীয়তে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।

অথবা এর অর্থ হল, হে নবী রসূলগণ! তোমরা একই দল, তৌহীদের প্রতি ঈমান, তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বন, হালাল রিজিক, সত্য কথা, নেক আমল এসব বিষয়ে তোমরা সকলেই এক এবং অভিন্ন। আর আমি তোমাদের একমাত্র প্রতিপালক। অতএব, তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর, আমার বিধি-নিষেধ পালন কর, আমার প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ কর, শুধু আমার নিকটই আশা কর। অতএব, মানুষের কর্তব্য হল এই একই দ্বীনের অনুসারী হওয়া, একই মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত থাকা; কখনও আল্লাহ পাকের নাফরমানী না করা।

فَتَقَطَّعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾

"কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে তাদের দ্বীনকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে। প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত"। অর্থাৎ একই দ্বীন ও মিল্লাতের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও লোকেরা নিজেদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। ফেরকা বন্দী করতে থাকে এবং প্রত্যেক দল নিজেদেরকে হক বা সত্য পন্থী বলে দাবী করতে থাকে। আর তারা ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও নিজের সেই ভ্রান্ত ধারণা নিয়েই নিজেদেরকে গৌরবান্বিত মনে করে।

ঈসায়ীরা তাদের ভ্রান্ত মতকেই সত্য মনে করে। ইহুদীরা কোপগ্রস্থ হওয়া সত্বেও তাদের অন্যায় অনাচারকেই সঠিক মনে করে। অগ্নি পূজকরা তাদের নিরর্থক সাধনাকে অর্থ পূর্ণ মনে করে। আর এই একই অবস্থা ছিল পৌত্তলিক, মূর্তি পূজকদের। এরা সকলেই বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট, দিশেহারা, তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ

فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٤﴾

"অতএব, হে রসূল! আপনি তাদেরকে একটি নিদৃষ্ট কাল পর্যন্ত তাদের মুর্খতার উন্মাদনায় নিমজ্জিত থাকতে দিন।"

কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী

এর মধ্যে রয়েছে কাফেরদের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সতর্কবাণী। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের কয়েকদিন তারা পানাহারে ব্যস্ত থাকুক, গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকুক, গাফলতের আবর্তে নিপতিত থাকুক, বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট থাকুক। حَتَّىٰ حِينٍ একটি নিদৃষ্ট কাল পর্যন্ত, অর্থাৎ তাদের মৃত্যু পর্যন্ত। অথবা আল্লাহ পাক আপনাকে জেহাদের অনুমতি প্রদান করা পর্যন্ত তাদেরকে এই অবস্থায় ছেড়ে দিন। জেহাদের অনুমতি যখন দেয়া হবে, তখন তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অথবা আমার তরফ থেকে তাদের প্রতি যখন আজাব আপতিত হবে, সে সময় পর্যন্ত আপনি তাদের এ অবস্থায় ছেড়ে দিন। অবশেষে তারা তাদের অন্যায় আচরণের ভয়াবহ পরিণতি স্বরূপ কঠোর শাস্তি ভোগ করবে। এজন্যে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "হে রসূল! তাদেরকে কুফর, নাফরমানী ও পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত থাকতে দিন"।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এ আয়াতে রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি সান্তনা, এই মর্মে যে, যারা তাঁর বিরোধিতা করছে তাদের শাস্তি অনিবার্য। অবশেষে তারা সেই শাস্তি অবশ্যই ভোগ করবে।১

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٥﴾

"তারা কি মনে করে যে আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি দান করি, তা দ্বারা তাদের জন্যে যাবতীয় কল্যাণ তরান্বিত করছি? না, অবশ্যই তা নয়, মূলতঃ তারা কিছুই বুঝে না।"

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -১৯৪

সুখ–সম্পদ নিশ্চিন্ত হওয়ার উপকরণ নয়

কাফেররা সুখ-সম্পদ ঐশ্বর্যের মালিক হতো এবং এ ধারণা করতো যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে ভালবাসেন বলেই তো এসব কিছু দান করেছেন, এই নির্বোধরা ধন–সম্পদকে আল্লাহ পাকের পছন্দের নিদর্শন মনে করেছে, কিন্তু এটি ছিল তাদের জন্যে পরীক্ষা এবং আখেরাত সম্পর্কে গাফলতের উপকরণ। তারা সুখ-সামগ্রী নিয়ে মুগ্ধ থাকার কারণে আখেরাত সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়; বরং ঐশ্বর্যের কারণে স্বেচ্ছাচারিতার নির্বিঘ্ন অবকাশ পেয়েছে এবং তাদের পাপাচারের ঘট ষোলকলায় পরিপূর্ণ হয়েছে। আর এটিই হয়েছে তাদের জন্যে কাল। তাই আলোচ্য আয়াতে পাপীষ্ঠদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে অর্থ–সম্পদ, ক্ষমতা, প্রভাব প্রতিপত্তি এসব কিছু নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের নেয়ামত, কিন্তু এসব মোটেই গাফলতের উপকরণ নয়; বরং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপকরণ এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ পাককে স্মরণ করার মাধ্যম। কিন্তু দূরাত্মা কাফেররা আল্লাহ পাকের এসব নেয়ামত ভোগ করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার স্থলে অবাধ্য, নাফরমান হয়েছে, পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন রয়েছে, আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনেনি এবং তাঁর প্রেরিত রসূলকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে এবং তারা ভাবছে, অর্থ–সম্পদ দ্বারা আল্লাহ পাক তাদেরকে সাহায্য করছেন। এবং আল্লাহ পাক তাদের প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছেন। প্রকৃত অবস্থা কিন্তু তা নয়, তারা প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারেনা, তারা তাদের নাজাতের পথ নিজেরাই বন্ধ করে দিচ্ছে, মহাবিপদ তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেনঃ মোমেন নেক আমল করে এরপরও ভয় করতে থাকে, (যদি দরবারে এলাহীতে কবুল না হয়)। পক্ষান্তরে, মোনাফেক মন্দ কাজে লিপ্ত থাকে, তবুও থাকে নিশ্চিন্ত।

إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾

নিশ্চয়ই যারা থাকে তাদের প্রতিপালকের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত, অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে, এবং সৎ কাজ করে, এতদসত্ত্বেও আল্লাহ পাকের ভয়ে ভীত থাকে, কাফের মুশরেকদের ন্যায় নিশ্চিন্ত হয়না, তারাই কল্যাণকামী।

যেমন, সূরায়ে ফোরকানে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ

আর যারা সারা রাত দরবারে এলাহীতে সেজদারত অবস্থায়, অথবা দণ্ডায়মান অবস্থায় অতিবাহিত করে, এরপরও ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় আল্লাহ পাকের দরবারে মুনাজাত করেঃ হে আমাদের পরওয়ারদেগার! দোজখের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। মূলতঃ তারাই হল আল্লাহর পেয়ারা বন্দা।

وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾

"আর যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত সমূহে বিশ্বাস রাখে"। মুমেনের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের একত্ববাদের নিদর্শন সমূহ দেখে তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা, অথবা এর অর্থ হলো যারা পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহে বিশ্বাস করে এবং ঐ আয়াত সমূহে যে সব কথা রয়েছে, তা মেনে চলে, তারাই প্রকৃত কল্যাণকামী এবং তারাই ভাগ্যবান।

وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّ
قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي
الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا
كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ
مِنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴿٦٣﴾ حَتَّىٰ
إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ ﴿٦٤﴾ لَا تَجْأَرُوا
الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ ﴿٦٥﴾ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ
عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ ﴿٦٦﴾ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ ﴿٦٧﴾

তরজমা

(৫৯) যারা তাদের প্রতিপালকের সাথে শরীক করেনা।

(৬০) এবং যারা যা দান করার, তা দান খয়রাত করে, তবুও তাদের অন্তর এই

ভয়ে ভীত যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের দরবারে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

(৬১) তারাই যাবতীয় কল্যাণকর কাজ দ্রুত সম্পাদন করে এবং তাতে তারা অগ্রগামী হয়।

(৬২) আমি কারো উপর তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করিনা, আমার নিকট এমন কিতাব রয়েছে যা সত্য ব্যক্ত করে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবেনা।

(৬৩) বরং এ বিষয়ে তাদের অন্তর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এতদ্ব্যতীত তাদের আরও কাজ রয়েছে যা তারা করছে।

(৬৪) অবশেষে আমি যখন তাদের ভোগবিলাসীদের পাকড়াও করব তখন তারা আর্তনাদ করতে থাকবে।

(৬৫) তাদেরকে বলা হবে আজ তোমরা আর্তনাদ করোনা, তোমরা আমার সাহায্য পাবেনা।

(৬৬) তোমাদের নিকট আমার আয়াত শুনানো হতো, কিন্তু তোমরা পেছনে ফিরে সরে পড়তে।

(৬৭) দম্ভ ভরে অর্থহীন গল্প গুজব করতে করতে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে মোমেনদের দু'টি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। (১) তারা আল্লাহকে ভয় করে, (২) তারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস করে।

আর এ আয়াত থেকে অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হচ্ছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

প্রকৃত মুমেনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

যারা তাদের প্রতিপালকের সাথে শরীক করেনা অর্থাৎ প্রকৃত মোমেন তারাই, যারা কখনও কোন অবস্থাতেই তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে শিরক করেনা। সকল অবস্থায় তারা নিরংকুশ তৌহীদের উপর অবিচলিত থাকে। এক আল্লাহ পাকের এবাদতে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের সাধনায় রত থাকে। তাদের জীবনের প্রতিটি কথা এবং কাজ, এমনকি প্রত্যেকটি পদক্ষেপ এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই হয়। আল্লাহর এবাদতে কোন কিছুকে তারা শরীক করেনা। শিরক গোপন হোক কি প্রকাশ্য কোন কিছুই তাদের কাছেও আসতে পারেনা।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে ঈমানের কথা বলা হয়েছে, আর এ আয়াতে শিরক না করার কথা বলা হয়েছে। কেননা, কোন কোন লোক ঈমান আনার পরও এবাদতের মধ্যে অন্যকে শরীক করে। তাই এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ পাকের প্রতি, তাঁর একত্ববাদের প্রতি ঈমান আনার পর তাঁর এবাদতে কোন কিছুকে যারা শরীক করেনা, তারাই প্রকৃত মোমেন।

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾

এবং যারা যা দান করার তা দান খয়রাত করে, তবুও তাদের অন্তর এই ভয়ে ভীত যে তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের দরবারে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

এ আয়াতে প্রকৃত মোমেনদের আর একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে তারা আল্লাহর রাহে দান করে আত্মপ্রসাদে মেতে উঠেনা, তাই দানের পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়না। তাদের দান আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কবুল হয়েছে কি–না এজন্যে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। তারা সর্বদা এ বিষয়ে ভয় করতে থাকে, যদি আমার দান আল্লাহ পাক কবুল না করেন তখন কি অবস্থা হবে? যদি আমার দান আল্লাহ পাকের মহান দরবারে পেশ করার মত না হয়, অথবা গুণাহর কারণে আর এবাদত কম হওযার কারণে তাদের মনে এই ভয় থাকে, যদি এ সব দান খয়রাতও তাদের নাজাতের জন্যে যথেষ্ট না হয় তখন কি অবস্থা হবে? এ সব কথা চিন্তা করেই প্রকৃত মোমেনগণ সর্বদা চিন্তাগ্রস্থ থাকে।

أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ

অর্থাৎ প্রকৃত মোমেনদের মনে এজন্যেও ভয় থাকে যে অবশেষে অবশ্যই তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরে যেতে হবে। তিনি তাদের যাবতীয় কর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, প্রকৃত মোমেনগণ সর্বদা আল্লাহর এবাদতে মশগুল থাকেন, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভে সর্বদা রত থাকেন। এতদসত্ত্বেও তারা ভয় করতে থাকেন, যদি আমাদের এবাদত আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল না হয় তখন কি অবস্থা হবে?

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করেছি, যাদের সম্পর্কে এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে তারা কি মদ্য পান করে এবং চুরি করে? তখন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ না, না তা নয়, হে সিদ্দীকের কণ্যা! তা নয়, বরং এরা সে সব লোক যারা রোজা রাখে, নামাজ আদায়

করে এবং দান খয়রাত করে, এতদসত্ত্বেও তারা ভয় করতে থাকে, যদি কোন কারণে এ সব এবাদত দরবারে এলাহীতে কবুল না হয়।১

মূলতঃ এরাই হল সে সব লোক, যারা দ্রুত বেগে কল্যাণকর কাজের দিকে এগিয়ে যায়।

(আহমদ, তিরমিজী, এবনে মাজা)২

নেককার মুমেনদের শুভ পরিণতির ঘোষণা

أُولَٰٓئِكَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَهُمْ لَهَا سَٰبِقُونَ ﴿٦١﴾

তারাই যাবতীয় কল্যাণকর কাজ দ্রুত সম্পাদন করে এবং তাতে তারা অগ্রগামী হয়।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে প্রকৃত মোমেনদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে।

(১) যারা আল্লাহকে ভয় করতে থাকে।

(২) যারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস করে।

(৩) যারা আল্লাহ পাকের এবাদতের ব্যাপারে অত্যন্ত আন্তরিক, এ পর্যায়ে তাদের একনিষ্ঠতা সুস্পষ্ট। তারা আল্লাহ পাকের সাথে কোন কিছুকে শরীক করেনা। প্রকাশ্য শিরকের ন্যায় গোপন শিরক থেকেও তারা নিরাপদ দুরত্বে থাকে। লোক দেখানোর কাজ থেকে এবং মুনাফেকী থেকে তারা অনেক দূরে থাকে।

(৪) তারা আল্লাহর রাহে দান করতে থাকে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা সর্বদা ভয় করতে থাকে এজন্যে যে, যদি এই দান খয়রাত দরবারে এলাহীতে কবুল না হয় তবে আমাদের কি অবস্থা হবে?

(৫) আর এজন্যেও তারা ভীত থাকে যে অবশেষে তাদেরকে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাজির হতে হবে অর্থাৎ তারা কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস করে।৩

আলোচ্য আয়াতে সেই সৌভাগ্যবান লোকদের শুভ পরিণতি বা পুরস্কারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা পূর্বোল্লিখিত গুণাবলীর অধিকারী হয়, মূলতঃ তারাই

১। তফসীরে রুহুল মা'আনী, খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-৪৪

২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -১৯৬

৩। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৭৭

কল্যাণকর কাজের দিকে এগিয়ে যায়। দুনিয়াতে রয়েছে তাদের শুভ পরিণতি এবং আখেরাতে রয়েছে তাদের জন্যে বিরাট পুরস্কারের আয়োজন।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এ আয়াতের একটি অর্থ হল এই যে, প্রকৃত মোমেনগণ আল্লাহ পাকের এবাদতে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত থাকে, এজন্যে তারা দ্রুত এবাদত সম্পাদন করে, যাতে করে কোন এবাদত ছুটে না যায়। অথবা এর অর্থ হল, আল্লাহর এবাদত করার কারণে আখেরাতে যে সব পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে এবং নেক আমলের কারণে দুনিয়াতে যে শুভ পরিণতি হয় তা অর্জন করার জন্যে প্রকৃত মোমেনগণ নেক আমলের দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দোয়া ব্যতীত কোন কিছুই বিপদ আপদকে বাধা দিতে পারেনা। নেক আমল, দান খয়রাত, মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার এ সব ব্যতীত কোন কিছুই মানুষের হায়াত বৃদ্ধির কারণ হয়না।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, যে সব কল্যাণকর কাজের দিকে মোমেনগণ দ্রুত এগিয়ে যায় তার একটি হল, আল্লাহর জিকির কেননা, আল্লাহর জিকিরে মোমেন বন্দা স্বাদ পায়, তার মনে আসে শান্তি। এজন্যে সে সামান্য রিজিকের উপর সন্তুষ্ট থাকে। দুনিয়ার নেয়ামত বিনষ্ট হওয়ার কোন ভয় তার অন্তরে থাকেনা। আর আল্লাহ পাক ব্যতীত কারো কাছে সে আশা করেনা। আর আল্লাহ পাক ব্যতীত কাউকে সে ভয়ও করেনা। সে স্বপ্ন যোগে সুসংবাদ পেতে থাকে।

وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ

অর্থাৎ তারা কল্যাণকর কাজের দিকে অগ্রগামী হয়। আর এ কারণে তারা জান্নাতের দিকেও অগ্রগামী হবে। অথবা এর অর্থ হল, আখেরাতের পূর্বে তারা দুনিয়াতেই নেক আমলের শুভ পরিণতি লাভ করে থাকে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাদের জন্যে পূর্বেই কল্যাণ লিপিবদ্ধ রয়েছে।১

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتٰبٌ يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٦٢﴾

"আমি কারো উপর তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করিনা আমার নিকট এমন কিতাব রয়েছে যা সত্য ব্যক্ত করে"।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -১৯৭
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৮, পৃষ্ঠা-১৫

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে যে সব নেক আমলের কথা বলা হয়েছে এ আয়াত থেকে সেই নেক আমলের প্রতি মানুষকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে এবং ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় কাজ কঠিন নয়, অতি সহজ। এতদ্ব্যতীত, আল্লাহ পাক কোন মানুষকে তার সাধ্যাতীত কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেননা। পূর্বোল্লিখিত কর্মসূচীর কোনটিই মানুষের পক্ষে অসাধ্য সাধন নয়, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا

অর্থাৎ আমি কোন লোককে তার সাধ্যাতীত কাজের দায়িত্ব অর্পণ করিনা। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, শরীয়তের বিধানের উপর আমল করা মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপারনয়।

যারা নেক আমল করার ব্যাপারে অগ্রগামী হয় তারা তাদের মনের টানেই তা করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেননা।

وَلَدَيْنَا كِتَابٌ

"আর আমার নিকট এমন কিতাব রয়েছে যা সত্য ব্যক্ত করে।" এই কিতাব দ্বারা লওহে মাহফুজকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যাতে মানুষের কৃতকর্মের বিবরণ সঠিক ভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে, আর তা আমি বিনষ্ট করবোনা, যে যতখানি নেক আমল করেছে তার সওয়াব সে অবশ্যই পাবে। কারো প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা হবেনা–অর্থাৎ নেককারের সওয়াব কম করা হবেনা আর বদকারের অপরাধের চেয়ে অধিকতর শাস্তি তাকে দেয়া হবেনা।

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا

"বরং তাদের অন্তর এদিক থেকে অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে।"

কাফেররা যেহেতু পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীকে অস্বীকার করে এবং এ জীবনের হিসাব নিকাশ দিতে হবে একথাও মানেনা এবং তারা ভোগ বিলাসের নেশায় মুগ্ধ মত্ত রয়েছে, তাই তারা আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চলাকে অত্যন্ত কঠিন মনে করে। জীবন–সাধনাকে সার্থক করার জন্যে তাদের কোন কর্মসূচী নেই, এমনকি এরূপ কোন মনোবৃত্তিও তাদের নেই। তাদের মন সর্বদা দুনিয়ার মোহে

মত্ত থাকে, অর্থ–সম্পদ লাভের নেশায় বিভোর থাকে এবং আখেরাতের ব্যাপারে থাকে উদাসীন। গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকার জন্যে তারা ক্ষণিকের জন্যও সত্যের দিকে আসতে পারেনা।

حَتّٰىٓ اِذَآ اَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْـَٔرُوْنَ ﴿٦٤﴾

অবশেষে আমি যখন তাদের ভোগ বিলাসীদের পাকড়াও করবো, তখন তারা আর্তনাদ করতে থাকবে।

অর্থাৎ পাপীষ্ঠদের অন্যায় অনাচারের শাস্তি অবধারিত আর, সেই শাস্তির সময়ও নিদৃষ্ট। যখন সেই নিদৃষ্ট সময়ে তাদের শাস্তি এসে পড়বে, তখন তারা চিৎকার আরম্ভ করবে। কিন্তু তারা যা ইচ্ছা তা করুক, যখন আল্লাহ পাক তাদেরকে পাকড়াও করবেন, তারা আল্লাহ পাকের আজাবে পতিত হবে, তখন তারা বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার দিতে থাকবে, কিন্তু কেউ তাদেরকে বাঁচাতে আসবে না, তাদের আর্তনাদে কেউ কর্ণপাত করবে না। তাই তাদেরকে সেদিন বলা হবে–

لَا تَجْـَٔرُوا الْيَوْمَ اِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿٦٥﴾

অর্থাৎ তোমরা আর্তনাদ করোনা, তোমরা আজ আমার সাহায্য পাবেনা, আল্লাহ পাকের শাস্তি থেকে কেউ তোমাদেরকে রেহাই দিবেনা।

قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ ﴿٦٦﴾

"তোমাদেরকে আমার আয়াত শুনানো হত, তখন তোমরা পশ্চাতপদে পলায়ন করতে।"

কেয়ামতের দিন এই কাফেরদেরকে বলা হবে, এখন আর্তনাদ করে কি লাভ? যখন সময় ছিল তখন তোমরা সত্য গ্রহণ করনি, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছো, যখন পয়গম্বরগণ তোমাদরেকে আল্লাহ পাকের মহান বাণী শুনাতেন, তখন তোমরা অবজ্ঞা ভরে মুখ ফিরিয়ে নিতে এবং পেছনে সরে যেতে, আল্লাহ পাকের মহান বাণীর উপর আমল করাতো দূরের কথা, তোমরা তা শ্রবণ করতেও রাজি হতেনা, তোমাদের অহংকার, তোমাদের আত্মম্ভরিতা তোমাদেরকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর প্রতি ঈমান আনয়নে বাধা দিত, তোমরা নিজেদেরকে বড় মনে করতে, তোমরা দম্ভ ভরে আমার প্রিয়নবীর নিকট থেকে সরে যেতে, তোমরা তখন বলতে– "আমরা আল্লাহর ঘরের প্রতিবেশী, আমরা কাউকে ভয় করিনা, কেউ আমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না।"

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) মুজাহেদ (রঃ) সহ তফসীরকারদের একটি দল আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

কাফেররা রাত্রিকালে কাবা শরীফ প্রাঙ্গণে একত্রিত হত, গল্পগুজব করতো, কিচ্ছা কাহিনী শ্রবণ করতো। কিন্তু পবিত্র কোরআন শ্রবণ করতে প্রস্তুত হতোনা। যদি তাদেরকে পবিত্র কোরআন শ্রবণ করার জন্য আহবান করা হত, তখন দম্ভ ভরে সরে যেত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে এবং পবিত্র কোরআন সম্পর্কে ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলেছে তাই এরশাদ হয়েছেঃ

مُسْتَكْبِرِينَ ۖ بِهِ سَٰمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿٦٧﴾

অহংকার করে তাকে কাহিনীকার বলে তোমরা চলে যেতে।

যে মানুষকে গল্প কাহিনী শুনায় তাকে মানুষ যেমন ত্যাগ করে চলে যায়, ঠিক তেমনি তোমরাও আমার সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে অবজ্ঞা করে ফেলে চলে যেতে। অতএব, আজ চিৎকার ও আর্তনাদ করে কোন লাভ হবেনা, তোমাদের ফরিয়াদ কেউ শ্রবণ করবে না, তোমাদের শাস্তি অনিবার্য, তোমাদের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য।১

হযরত হাসান বসরী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হল, তোমরা এখন আর্তনাদ করোনা কেননা, দুনিয়াতে তোমরা আল্লাহ পাকের কিতাব কোরআনকে ত্যাগ করেছো এবং আল্লাহ পাকের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকেও ত্যাগ করে চলে গেছ। অতএব, আজ তোমাদের ফরিয়াদ শ্রবণ করা হবেনা। আর আবদ এবনে হামিদ, এবনে আবি হাতেম, মুজাহেদ (রঃ)–এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, এর অর্থ হল, কাফেররা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় হরম শরীফ এবং পবিত্র কোরআন সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করতো, আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করতো, পবিত্র কোরআন শ্রবণ করতে রাজি হ'ত না।

নাফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)–কে আলোচ্য বাক্যাংশের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন, এর অর্থ হল মক্কাবাসী পবিত্র কোরআন শ্রবণ করতো না, খেলাধুলায় মত্ত হত, গল্প গুজবে লিপ্ত থাকতো। কিন্তু পবিত্র কোরআন শ্রবণে প্রস্তুত হতনা। বায়তুল্লাহ শরীফের সম্মুখে একত্রিত হয়ে বাজে কথায় এবং অন্যায় অহেতুক কথায় লিপ্ত থাকতো। পবিত্র কোরআন শ্রবণ করতে প্রস্তুত হতনা।

১। তফসীরে তাবারী, খন্ড–১৭, পৃষ্ঠা–৩১
তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৮, পৃষ্ঠা –১৯৯–২০০

এমনকি আল্লাহ পাকের পবিত্র গৃহের তাওয়াফও করতো না এবং অহংকার করে চলে যেত।১

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেনঃ এর অর্থ হল, তোমরা সত্যকে বর্জন করেছো, অথবা পবিত্র কোরআনকে ত্যাগ করে চলে গেছ, অথবা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ত্যাগ করে চলে গেছ, তাঁর আহবানে সাড়া দাওনি।

আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ বলেছেন, তোমরা আল্লাহর ঘরকে ছেড়ে চলে গেছ অর্থাৎ আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনে, তাঁর বন্দেগী করে এই ঘরকে আবাদ করনি, অতএব এখন আর্তনাদ করলে কোন লাভ হবেনা, তোমাদের ফরিয়াদ কেউ শ্রবণ করবে না।২

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾
أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴿٦٩﴾ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ
بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٧٠﴾ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ
لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ
فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧١﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ
وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٣﴾
وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ﴿٧٤﴾

তরজমা

(৬৮) তবে কি তারা এই বাণী (পবিত্র কোরআন) অনুধাবন করেনি? অথবা তাদের নিকট কি এমন কিছু এসেছে, যা তাদের পূর্ব পুরুষের নিকট আসেনি।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৪

২। তফসীরে রুহুল মা'আনী, খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-৫০

(৬৯) অথবা তারা কি তাদের রসূলকে চিনতে পারেনি বলে তাঁকে অস্বীকার করে?

(৭০) অথবা তারা কি বলে যে, তার মধ্যে ছিট রয়েছে? এর কিছুই নয়। তিনি তাদের নিকট সত্য উপস্থিত করেছেন। বস্তুতঃ তাদের অধিকাংশ লোক সত্যকে অপছন্দ করে।

(৭১) যদি সত্য দ্বীন তাদের কামনা বাসনার অনুগামী হত, তবে আসমান জমীন এবং তন্মধ্যকার সব কিছুই বিনষ্ট হয়ে যেত; বরং আমি তাদেরকে দিয়েছি উপদেশ। কিন্তু তারা তাদের উপদেশ থেকে বিমুখ হয়ে রয়েছে।

(৭২) অথবা (হে রসূল!) আপনি কি তাদের নিকট কোন প্রতিদান চেয়েছেন? আপনার প্রতিপালকের প্রতিদানই উত্তম এবং তিনিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রিজকদাতা।

(৭৩) হে রসূল! আর নিশ্চয় আপনিই তাদেরকে সরল–সঠিক পথের দিকে ডাকেন।

(৭৪) আর নিশ্চয়ই যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান আনেনা, তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত।

তফসীরুল কোরআন

পুর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে অহংকারী কাফেরদের মূর্খতা এবং পথভ্রষ্টতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর এ আয়াত থেকে কাফেরদের মূর্খতা এবং পথভ্রষ্টতার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করে তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করা হচ্ছে। তারা কি কি কারণে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত তাও এরশাদ হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ পাঁচটি কারণে এ কাফেররা সত্য বিমুখ হয়েছে।

(এক) এ হতভাগ্য কাফেররা পবিত্র কোরআনের মহিমা মাধুর্য সম্পর্কে আদৌ ভেবে দেখেনি। তার সৌন্দর্য সম্পর্কেও তারা অবগত হয়নি। পবিত্র কোরআন নিঃসন্দেহে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের সুস্পষ্ট দলীল। যুগে যুগে মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে তথা মানব কল্যাণ সাধনের জন্যে আসমানী কিতাব সমূহ নাজিল হয়েছে। কিন্তু পবিত্র কোরআন হল সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ যা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর প্রতি নাজিল হয়েছে। যার মোকাবিলা করা কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। কেননা, সর্বাপেক্ষা জ্ঞানগর্ভ মহিমান্বিত আসমানী গ্রন্থ হলো পবিত্র কোরআন।

(দুই) এ দূরাত্মা কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যিকার পরিচয় পাওয়ার চেষ্টা করেনি।

(তিন) অথবা তারা তাঁর প্রকৃত অবস্থা এবং তাঁর সততা, সত্যবাদিতা, উদারতা, মহানুভবতা, সাধুতা এবং সত্য পরায়ণতা সম্পর্কে অবগত হয়নি। তারা শুধু শুনেছে তিনি উম্মী, তিনি লেখা পড়া শেখেননি, অথচ এলম এবং হেকমতের যে বিস্ময়কর ঝর্ণাধারা তাঁর নিকট থেকে প্রবাহিত হয়েছে, সে সম্পর্কে তারা এতটুকু চিন্তা করেনি।

(চার) অথবা এর কারণ হলো এই যে, তাদের ভ্রান্ত ধারণা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মজনু বা পাগল, অথচ জ্ঞান ও বুদ্ধির স্রোতধারা তাঁর নিকট থেকেই উৎসারিত হয়েছে।

(পাঁচ) তাদের আরেকটি ভ্রান্ত ধারণা হলো এই যে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট হয়তো কোন আর্থিক সুবিধা চান, অথচ দূরাত্মা কাফেরদের এসব ধারণার মধ্যে কোনটিই সত্য নয়। আল্লাহ পাক এ স্থলে তাদের প্রত্যেকটি কথা উল্লেখ করে তার প্রত্যেকটির জবাব দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾

আলোচ্য আয়াতের القول শব্দ দ্বারা পবিত্র কোরআনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তবে কি কাফেররা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআন সম্পর্কে ভেবে দেখেনি। যদি তা করত, তবে পবিত্র কোরআনের ভাষার অলংকার, ভাবের মাহাত্ম দেখে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের সত্যতায় বিশ্বাস করতো। যখন তারা পবিত্র কোরআনের তিনটি আয়াতের অনুরূপ আয়াত আনয়নে ব্যর্থ হলো, তখনই পবিত্র কোরআন যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ মহান বাণী–একথা তাদের নিকট সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয়।

أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ

অর্থাৎ পবিত্র কোরআন কোন অপরিচিত ও অভূতপূর্ব কিছু নয়; বরং ইতিপূর্বেও আসমানী গ্রন্থ নাজিল হয়েছে। নিকট অতীতে হযরত ঈসা (আঃ)–এর প্রতি ইঞ্জিল নাজিল হয়েছে এবং তাঁর পূর্বে হযরত মুসা (আঃ)–এর প্রতি তওরাত নাজিল হয়েছে। তবে পবিত্র কোরআন হলো সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ।

এমনিভাবে মক্কার কোরায়েশরা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর নবুওয়তে বিশ্বাস করতো, আর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদেরই বংশধর এবং তাঁদেরই ন্যায় আল্লাহ পাকের প্রেরিত রসূল, তবে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল। তিনি নবীগণের দলপতি বা সাইয়্যেদুল মুরসালীন। তিনি সর্বশেষ নবী, তাঁর পর আর কোন নবী আসবেন না তিনি খাতেমুন নাবিয়্যীন।

আয়াতের মর্মকথা

ইমাম তাবারী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ যদি কাফের মুশরেকরা পবিত্র কোরআনের মহান বাণী সম্পর্কে চিন্তাও গবেষণা করত, তবে পবিত্র কোরআন থেকে অনেক মূল্যবান উপদেশ গ্রহণ করতে পারত, পবিত্র কোরআনের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারত, যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এ মহান গ্রন্থ নাজিল হয়েছে, তাই পবিত্র কোরআন সম্পর্কে চিন্তা করলে তাঁর রেসালতের সত্যতাও উপলব্ধি করতো এবং তাঁর বিরোধিতা থেকে বিরতও থাকতো।

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿٦٩﴾

অথবা তারা কি তাদের রসূলকে চিনতে পারেনি বলে তাঁকে অস্বীকার করে? অথচ তাঁকে তারা শৈশব কাল থেকে দেখছে এবং তাঁর জীবন তাদের সম্মুখেই অতিবাহিত হয়েছে, তাঁর উচ্চ বংশ মর্যাদা, সততা, সত্যবাদিতা ন্যায়পরায়ণতা, আমানতদারী, ঈমানদারী, তাঁর চরিত্র মাধুর্য, তাঁর ভদ্রতা, নম্রতা, তাঁর-অগাধ জ্ঞান এবং জীবনে কোন দিন কারো নিকট তিনি কিছুই শেখেননি, এসব কথা সর্বজনবিদিত এবং স্বীকৃত। এতদসত্ত্বেও তাঁকে চিনতে না পারার কথাটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ۚ

অথবা তারা কি বলে যে তাঁর মধ্যে ছিট রয়েছে? অর্থাৎ তবে কি এই কাফের মোশরেকরা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উন্মাদ মনে করে? অথচ তারা বিলক্ষণ জানে যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান। তাঁর বুদ্ধির দীপ্তি এবং চিন্তার গভীরতা সর্বাধিক। এমন ব্যক্তির ব্যাপারে উম্মাদনার কথা কোন উন্মাদ ব্যক্তি বা শত্রুই বলতে পারে।

অথবা এ আয়াতের অর্থ হল এই যে, যখন আয়াত

قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ

নাজিল হল,তখন এই প্রশ্ন মানুষের মনে উত্থিত হল যে কি কারণে তারা পবিত্র কোরআনের শিক্ষা গ্রহণে প্রস্তুত নয়? কেন তারা অহংকার করছে? কেন তারা পবিত্র কোরআন থেকে বিমুখ হচ্ছে? তারা কি পবিত্র কোরআনে চিন্তা ও গবেষণা করেনি? অথবা পূর্বকালে যে নবী রসূলগণ আগমণ করেছেন, সে খবর তারা পায়নি। অথবা এই নবীর আমানতদারী এবং সত্যবাদিতা সম্পর্কে তারা অবগত হয়নি।

এসব কথার জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ۝٧٠

এর কিছুই নয়; বরং তিনি তাদের নিকট সত্য উপস্থিত করেছেন, তাদের অধিকাংশ লোক সত্যকে অপছন্দ করে। কাফেররা যে বলে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটেছে (নাউজুবিল্লাহ............)

প্রশ্ন হল কোন বিকৃত মস্তিস্ক মানুষ কি পবিত্র কোরআনের ন্যায় জ্ঞান সমৃদ্ধ গ্রন্থ পেশ করতে পারে?

অথচ তিনি বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণের জন্যে পথ নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন, তিনি যা বলছেন, তা ধ্রুব সত্য, অতুলনীয়। কিন্তু তারা সত্যকে পছন্দ করেনা বলেই তাঁর বিরোধিতা করে। তাদের হিংসা প্রসূত এ বিরোধিতার ভিত্তি হল তাদের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে লালিত শত্রুতা, তাদের নেতৃত্বের লোভ এবং অর্থ-সম্পদের লালসা।

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ

"যদি সত্য দ্বীন তাদের কামনা বাসনার অনুগামী হত তবে আসমান জমীন এবং তন্মধ্যকার সমস্ত কিছুই বিনষ্ট হয়ে যেত" অর্থাৎ যদি দ্বীনে হক্ব তাদের কামনা বাসনা মোতাবেক একাধিক উপাস্যের পক্ষ সমর্থন করত, তবে সারা বিশ্ব ধ্বংসস্তুপে পরিণত হতো।

আলোচ্য আয়াতের الحق শব্দ দ্বারা পবিত্র কোরআনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অর্থাৎ যদি এই কাফেরদের কামনা বাসনা মোতাবেক পবিত্র কোরআনের বিধি-নিষেধ হত তবে বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যেত। এ ব্যাখ্যা করেছেন ফাররা (রঃ)।

এবনে জোরায়েজ (রঃ), মোকাতেল (রঃ), সুদ্দী (রঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের الحق শব্দ দ্বারা স্বয়ং আল্লাহ পাককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এমন অবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে, যদি আল্লাহ পাক তাদের আকাংখা মোতাবেক অন্য কিছুকে তাঁর শরীক গ্রহণ করতেন, অথবা তিনি নিজের জন্যে সন্তান-সন্ততি গ্রহণ করতেন, এবং কোরআনে করীমকে তাদের কামনা বাসনা মোতাবেক নাজিল করতেন এবং কোরআন শেরক ও পাপাচারের শিক্ষা দিত, তবে বিশ্ব সৃষ্টি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়ে যেত। কেননা, যদি স্রষ্টার একত্ববাদ না থাকে, তবে সৃষ্টির অস্তিত্ব কিভাবে থাকবে।কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হল যদি সত্য দ্বীন তাদের কামনা বাসনার অনুসারী হত, তবে হক্ব এবং ন্যায় বিচার থাকতনা যার উপর বিশ্ব সৃষ্টির অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের এ অর্থ হতে পারে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে সত্য দ্বীন নিয়ে আগমন করেছেন, যদি তা কাফেরদের কামনা বাসনার অনুসারী হত, তবে শেরক তৌহিদের স্থান দখল করতো, আর ঐ অবস্থায় আল্লাহ পাক কাফেরদের উপর আযাব নাজিল করতেন, পরিণামে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যেত।

بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝

বরং আমি তাদেরকে দিয়েছি উপদেশ, কিন্তু তারা সেই উপদেশ থেকে বিমুখ হয়ে রয়েছে। এ উপদেশ পালনের মাধ্যমে তাদের সম্মুখে হাজির হয়েছিল দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের সার্বিক কল্যাণ লাভের এক চমৎকার সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু এ কাফেররা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেনি, তাই দুনিয়ার অবমাননা এবং আখেরাতের শাস্তি তাদের জন্যে অবধারিত হয়ে রয়েছে। আলোচ্য আয়াতের জিকির শব্দটির দ্বারা পবিত্র কোরআনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অর্থাৎ এমন গ্রন্থ যা মানুষকে আল্লাহ পাকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, অথবা এর অর্থ হলো উপদেশ।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল, সেই গ্রন্থ যাতে রয়েছে মানুষের উচ্চ মর্যাদার কথা, অর্থাৎ কোরআনে করীম, যেমন অন্য আয়াতেও আল্লাহ পাক কথাটিকে এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ

নিশ্চয়ই আমি নাজিল করেছি তোমাদের নিকট এমন কিতাব, যাতে রয়েছে তোমাদের আলোচনা। আরো এরশাদ হয়েছেঃ

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ

নিশ্চয়ই এই কিতাব সম্মান এবং মর্যাদার কারণ।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ পবিত্র কোরআন আরবী ভাষায় যে পন্থায় অবতীর্ণ হয়েছে তা ছিল মক্কার কোরায়েশের ভাষা। ভাষার দিক থেকে লোকদেরকে কোরায়েশের অনুসারী করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ খেলাফত বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব কোরায়েশের জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে কোরায়েশের জন্যে বিশেষ সম্মানের ব্যাপার। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মক্কার কাফেররা এমনি এক মহান গ্রন্থ থেকে বিমুখ হয়ে রয়েছে যা তাদের জন্যে সম্মান এবং মর্যাদা বয়ে এনেছিল।

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٧٢﴾

"অথবা হে রসূল! আপনি কি তাদের নিকট কোন প্রতিদান চেয়েছেন? আপনার প্রতিপালকের প্রতিদানই উত্তম। তিনিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রিজকদাতা।" হে রসূল! আপনি এই কাফেরদের যে হেদায়েত নছিহত করছেন, তার বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক কি আপনি চেয়েছেন? যদি তা হত, তবুও একটা কথা ছিল যে অর্থ-সম্পদের দাবীর প্রেক্ষিতে তারা আপনার নিকট থেকে দূরে সরে পড়েছে। কিন্তু আপনিতো কখনও তাদের নিকট অর্থ-সম্পদ দাবী করেননি, তবুও কেন তারা আপনার নিকট থেকে দুরে থাকে, প্রকৃত অবস্থা এই যে, তাদের নিকট আপনার অর্থ-সম্পদ চাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। কেননা, আপনার রিজক দাতা স্বয়ং আল্লাহ পাক, আর তিনিই উত্তম রিজক দাতা।

فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ

অর্থাৎ দুনিয়াতে আল্লাহ পাক আপনাকে যে রিজক দান করেছেন এবং আখেরাতে আপনার জন্য যে সওয়াব রয়েছে, এসব অতি উত্তম। কেননা. আখেরাতের সুখ-সামগ্রী এবং শান্তি চিরস্থায়ী।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, خراج শব্দটি সাধারণতঃ সেই ট্যাক্স সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়, যা সরকারের তরফ থেকে জনগণের উপর আরোপিত হয়। যেহেতু আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দুনিয়াতে উত্তম রিজক দান করেছেন এবং আখেরাতে সর্বাধিক নেয়ামতের অধিকারী করেছেন তাই মোশরেকদের থেকে ট্যাক্স বা রেসালতের দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে কোন সম্পদ দাবী করা তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অকল্পনীয়।

وَاِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٧٣﴾

"হে রসূল! আর নিশ্চয় আপনিই তাদেরকে সরল সঠিক পথের দিকে ডাকেন।"

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক তাঁকে সান্তনা দিয়েছেন, হে রসূল! আপনি সরল সঠিক পথে রয়েছেন, অতএব, কাফেরদের কথায় আপনি গুরুত্ব দিবেন না। কেননা, আপনি তাদেরকে সঠিক পথের দিকে আহবান করছেন, কিন্তু যেহেতু তারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসই করেনা তাই আপনার আহবানেও তারা সাড়া দেয়না। আপনি তাদের নিকট কোন অর্থ-সম্পদ দাবী করেন না, শুধু সত্য ও ন্যায়ের জন্যে আপনি তাদেরকে আহবান করছেন, কিন্তু তারা তা অস্বীকার করে, আপনার সততা, সত্যবাদিতা, সাধুতা সর্বজনবিদিত, স্বীকৃত, দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং প্রতিভাত। আপনি তাদেরকে সত্যের দাওয়াত দিয়েছেন কিন্তু তারা শত্রুতার কারণে আপনার বিরোধিতা করে। এটি তাদের দূর্ভাগ্য। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই তাদের এই দূর্ভাগ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাই পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে সরল সঠিক পথের দিকে হেদায়েত করেন, এটি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ পাকের মর্জির ব্যাপার।

وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوْنَ ﴿٧٤﴾

আর নিশ্চয়ই যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান আনেনা, তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত। এ আয়াতেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্য রয়েছে সান্ত্বনা এই মর্মে যে হে রসূল! যারা আপনার প্রতি ঈমান আনেনা, তাদের জন্য চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, তারা সরল-সঠিক পথ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত। এমনকি কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, তাদের মধ্যে সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতাই নেই। তারা পথভ্রষ্ট, দিশেহারা।

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে, তারা হল মক্কার কোরাইশ গোত্রের কাফের।১

১। তফসীরে রুহুল মা'আনী, খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-৫৪

وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِيْ طُغْيَانِهِمْ
يَعْمَهُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ
وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ ﴿٧٦﴾ حَتّٰۤى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ
اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ﴿٧٧﴾ وَهُوَ الَّذِيْۤ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ
وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٨﴾ وَهُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي
الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٧٩﴾ وَهُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ
وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٨٠﴾

তরজমা

(৭৫) আর যদি আমি তাদের প্রতি দয়া করি এবং তাদের দুঃখ কষ্ট দূরীভূত করে দেই, তবুও তারা তাদের অবাধ্যতায় দিশেহারার ন্যায় ঘুরতে থাকবে।

(৭৬) আর আমি তাদেরকে আযাব দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম তবুও তারা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে নতি স্বীকার করেনি, কান্নাকাটিও করেনি।

(৭৭) শেষ পর্যন্ত যখন আমি তাদের প্রতি এক কঠিন শাস্তির দ্বার খুলে দিলাম, তখন তারা হতাশ হয়ে পড়ে।

(৭৮) তিনিই তোমাদের জন্যে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।

(৭৯) আর তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন এবং তোমাদেরকে তাঁরই নিকট একত্রিত করা হবে।

(৮০) আর তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান আর রাত ও দিনের পরিবর্তন তাঁরই কাজ। তবুও কি তোমরা বুঝবেনা।

তফসীরুল কোরআন

আলোচ্য আয়াত সমূহে মক্কার কাফেরদের পথভ্রষ্টতা ও নাফরমানীর কথা বর্ণিত হয়েছে। কাফেররা এত বিভ্রান্ত ও হতভাগা যে, যদি আল্লাহ পাক তাদের প্রতি দয়া করেন, এবং তাদের যাবতীয় বিপদাপদ দূরীভূত করেন, তবুও তারা আল্লাহ পাকের কথা মেনে নিতে রাজী হবেনা; বরং তারা গোমরাহীর অন্ধকারে দিশেহারার ন্যায় ঘুরে বেড়াবে। আল্লাহ পাকের মহান দরবারে নতি স্বীকার করবেনা এবং আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেনা। আলোচ্য আয়াতের ضر শব্দটির দু'টি অর্থ হতে পারে। মক্কাবাসীরা সুদীর্ঘ সাতটি বছর যাবত দুর্ভিক্ষের কারণে নিদারুন কষ্ট ভোগ করেছে, অবশেষে তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্মরণাপন্ন হয়, তিনি তাদের জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দোয়া করেন, তাঁর দোয়ার বরকতে আল্লাহ পাক দুর্ভিক্ষের মহা বিপদ থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন। কিন্তু যখন আল্লাহর দানে বিপদ কেটে গেল, তখন তারা পুনরায় বেঁকে বসল। আল্লাহ পাকের দয়ার কথা স্বীকার করতেও রাজী হল না। গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন রয়ে গেল। আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেন যাহ্যাক (রঃ)।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, ضر শব্দটি দ্বারা বদরের যুদ্ধের বিপদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, এ যুদ্ধে মক্কার কাফেরদের অনেক তথাকথিত নেতাই নিহত হয়েছিল, আর এটি ছিল মুসলিম ও কাফেরদের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ। আর এ যুদ্ধে নেমে আসে তাদের উপর মহা বিপদ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা পথে আসেনি। পরবর্তী আয়াতেও এ বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَلَقَدْ أَخَذْنَٰهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٦﴾

"আর আমি তাদেরকে আযাব দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম তবুও তারা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে নতি স্বীকার করেনি, কান্নাকাটিও করেনি"।

আলোচ্য আয়াতের আযাব শব্দটির ব্যাখ্যায়ও তফসীরকারগণ পূর্ববর্তী আয়াতের ضر শব্দের ব্যাখ্যার ন্যায় উভয় মর্মার্থই বর্ণনা করেছেন।

নেসায়ী এবং হাকেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মক্কায় যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তা মক্কাবাসীর জন্যে মহা বিপদের আকার ধারণ করে, তখন আবু সুফিয়ান প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে আরজ করে, আমি আল্লাহর দোহাই দিয়ে এবং আমাদের সঙ্গে

আপনার আত্মীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে অনুরোধ করছি, আমাদের জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দোয়া করুন, যেন এ বিপদ দূরীভূত করা হয়। আমরা জন্তুর গায়ের পশম এবং রক্ত পর্যন্ত খেতে বাধ্য হচ্ছি। তখনই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ

অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ বা যুদ্ধের বিপদ দূরীভূত হওয়া সত্ত্বেও মক্কাবাসী আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা করেনি এবং তাদের কৃত অন্যায়ের জন্যে অনুতপ্তও হয়নি, আল্লাহ পাকের দরবারে বিনীত হয়ে কান্নাকাটিও করেনি। কেননা, অকৃতজ্ঞতা, নাফরমানী ও অবাধ্যতা তাদের মজ্জাগত। তাই এত বিপদ সত্ত্বেও তারা নতি স্বীকার করেনি, পথে আসেনি।

বায়হাকী দালায়েলে বর্ণনা করেছেন যে সামামা এবনে আসাল হানাফী নামক ব্যক্তি যখন ধৃত হয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়, তিনি তার নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করে তাকে ছেড়ে দেন। সে মক্কা চলে যায় এবং ইসলাম গ্রহণ করে। এজন্যে মক্কার কোরায়েশরা তাকে গ্রেফতার করতে চেষ্টা করে। কিন্তু সে পলায়ন করে মক্কা এবং ইয়ামামার মধ্যে এসে অবস্থান নেয়। ইয়ামামা থেকে খাদ্য দ্রব্যের যে সরবরাহ মক্কায় আসত, তা সে বন্ধ করে দেয়। এ কারণে মক্কায় খাদ্য দ্রব্যের চরম অভাব দেখা দিলে আবু সুফিয়ান হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের পক্ষে দোয়া করার জন্যে আরজী পেশ করে। সে বলে, আপনি কি বলেননি যে, আল্লাহ পাক আপনাকে রহমতরূপে প্রেরণ করেছেন? তিনি এরশাদ করেন, হ্যাঁ নিঃসন্দেহে এটি সত্য কথা। তখন আবু সুফিয়ান বলে, তাহলে এখন দোয়া করুন যেন আল্লাহ পাক এ দুর্ভিক্ষ দূরীভূত করে দেন। তখন আলোচ্য আয়াতে নাজিল হয়। বর্ণিত আছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের জন্যে দোয়া করেছিলেন, ফলে ঐ দুর্ভিক্ষ দূরীভূত হয়েছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কাফেররা তওবা করেনি, বরং গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন অবস্থায় তারা ঘোরাফিরা করছিল।[১]

حَتَّىٰٓ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾

শেষ পর্যন্ত যখন আমি তাদের প্রতি এক কঠিন শাস্তির দ্বার খুলে দিলাম, তখন তারা হতাশ হয়ে পড়ে।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -২০৪-০৫

অর্থাৎ অবশেষে যখন মক্কার কাফেরদের উপর কঠিন শাস্তি আপতিত হয়, তখন তারা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যায় এবং তারা এত অসহায় হয়ে পড়ে যে, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তিটি সবচেয়ে বেশী অহংকারী ছিল অর্থাৎ আবু সুফিয়ান সে-ই হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হল এবং রহমতের দোয়ার জন্যে আরজী পেশ করল।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে عذاب شديد শব্দটি দ্বারা দুর্ভিক্ষের শাস্তির কথা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, ক্ষুধার কষ্ট বন্দীদশার কষ্ট থেকে অধিকতর। এজন্যে তাকে কঠিন শাস্তি বলা হয়েছে।১

বোখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, মক্কার কাফেরদের অকথ্য উৎপীড়ন নির্যাতনের কারণে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাকের দরবারে এ দোয়া করেছিলেন, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর যুগে যেভাবে সাত বছর ধরে দুর্ভিক্ষ ছিল, হে আল্লাহ! মক্কাবাসীকে এমনিভাবে দুর্ভিক্ষের শাস্তি দিয়ে আমাকে সাহায্য কর। তখনই এ কঠিন শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয়। কিন্তু যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দোয়ায় এ বিপদ দূরীভূত হল, তখনও তারা কৃত অন্যায়ের ব্যাপারে তওবা করেনি এবং আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনেনি, তবে যখন আখেরাতের কঠিন শাস্তি দেখবে তখন তাদের চক্ষু উন্মীলিত হবে এবং তখন তারা সত্য উপলব্ধি করতে পারবে, কিন্তু সে উপলব্ধি তাদের কোন উপকারে আসবেনা।২

وَهُوَ الَّذِيٓ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ

তিনিই তোমাদের জন্যে কর্ণ, চক্ষু এবং অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কাফেরদের মূর্খতা এবং পথভ্রষ্টতার বিবরণ ছিল, আর এর কারণ ছিল এই যে, তারা পরকালীন জীবনকে অস্বীকার করত এবং জীবনের কৃতকর্মের সুফল বা কুফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে একথা বিশ্বাস করত না।

আলোচ্য আয়াত সমূহে আল্লাহ পাক তাঁর নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যাতে করে তারা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -২০৬

২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৮, পৃষ্ঠা-২০

পারে এবং আল্লাহ পাক তাঁর বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের উল্লেখ করছেন, যাতে করে তারা এ বিষয়ে বিশ্বাস করে যে মৃত্যুর পর পুনঃজীবন কঠিন কিছুই নয় এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে ভাল কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের শাস্তি অবশ্যই হবে। যাঁর শক্তি ও ক্ষমতা বিস্ময়কর, বর্ণনাতীত, তাঁর পক্ষে মৃতকে জীবিত করা আদৌ কোন কঠিন কাজ নয়। :এ পর্যায়ে আল্লাহ পাক চারটি দলীল বর্ণনা করেছেন ঃ

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَلَكُمُ

প্রথম দলীল

হে আত্ম বিস্মৃত মানব জাতি। আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে দেখবার জন্যে চক্ষু, শ্রবণ করবার জন্যে কর্ণ এবং উপলব্ধি করার জন্যে হৃদয় দান করেছেন। যদি তিনি এসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দান না করতেন, তবে তোমরা দেখতেও পারতেনা, শ্রবণও করতে পারতেনা এবং কিছুই উপলব্ধি করতে পারতেনা।

অতএব, আল্লাহ পাকের প্রদত্ত এই নেয়ামত সমূহের সদ্ব্যবহার কর, এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, জীবন সাধনায় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা কর।

قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٨﴾

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, তোমাদের অত্যন্ত অল্প সংখ্যক লোকই আল্লাহ পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কেননা, শোকরগুজারী বা কৃতজ্ঞতার তাৎপর্য হল চক্ষু, কর্ণ এবং অন্তর যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা এবং এই সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। কিন্তু যেহেতু তারা ছিল আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, আল্লাহ পাকের প্রদত্ত নেয়ামত সমূহকে তাঁর নাফরমানীতে ব্যয় করতে অভ্যস্ত, তাই এরশাদ হয়েছে যে তাদের অধিকাংশই অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ।[১]

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৮৪
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -২০৬

দ্বিতীয় দলীল

وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٩﴾

আর তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন এবং তোমাদেরকে তাঁরই নিকট একত্রিত করা হবে।

মানুষ মাত্রকে উপলব্ধি করা উচিত যে পৃথিবীতে তার অবস্থান আল্লাহ পাকের দান ব্যতীত আর কিছুই নয়। আল্লাহ পাকই মানুষকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে রেখেছেন। ইতিপূর্বে যার অস্তিত্বই ছিলোনা, যে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তুই ছিলনা, আজ আল্লাহ পাক তাকে শুধু যে অস্তিত্ব দান করেছেন তাই নয়; বরং দিয়েছেন তাকে শক্তি, সামর্থ্য এবং প্রভাব প্রতিপত্তি। এমনিভাবে সারা পৃথিবীতে আল্লাহ পাক মানব জাতিকে ছড়িয়ে রেখেছেন, আর এমন এক দিন আসবে, যখন সমগ্র মানব জাতিকে আল্লাহ পাক তাঁর মহান দরবারে সমবেত করাবেন, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

তৃতীয় দলীল

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ

আর তিনিই তো জীবন ও মৃত্যু দান করেন অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যু এক আল্লাহ পাকেরই হাতে। যাকে ইচ্ছা তিনি জীবন দান করেন আর যাকে ইচ্ছা তার নিকট থেকে জীবন ছিনিয়ে তাকে মৃত্যুমুখে পতিত করেন। কেউ জন্ম লাভ করে, আর কেউ মৃত্যুবরণ করে, উভয় ক্ষেত্রেই একমাত্র আল্লাহ পাকের ইচ্ছাই কার্যকর হয়।

চতুর্থ দলীল

وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾

আর রাত ও দিনের পবির্তন তাঁরই কাজ, তবু কি তোমরা বুঝতে পারনা?

অর্থাৎ এই যে প্রত্যহ যথা নিয়মে যথা সময়ে রাতের অন্ধকারের পর আসে দিনের আলো, এরপর দিনের অবসান ঘটে, রাতের আগমন হয়, আর সারা বিশ্ব অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। পৃথিবীর অবস্থার এই পরিবর্তন শুধু সর্ব শক্তিমান আল্লাহ

পাকের ইচ্ছা এবং মর্জিতেই হয় এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরত হেকমতেরই বহিঃপ্রকাশ হয়। কোরআনে করীমেই রয়েছে এর সুস্পষ্ট ঘোষণা।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

নিশ্চয় আসমান জমীনের সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের অগণিত বিস্ময়কর নিদর্শন রয়েছে।

অতএব, এসব নিদর্শন দেখে আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা বুদ্ধিমান মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

بَلْ قَالُوا
مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿٨١﴾ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّ
عِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٨٢﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هٰذَا
مِن قَبْلُ إِنْ هٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾ قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ
وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ ط قُلْ أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ ط قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٧﴾ قُلْ مَن
بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن
كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾

তরজমা

(৮১) এতদসত্ত্বেও তারা শুধু সেকথাই বলে যা তাদের পূর্ববর্তীরা বলেছিলো।

(৮২) তারা বলে আমরা যখন মরে গেলাম, মাটি এবং অস্থি হয়ে গেলাম, এরপর আমাদেরকে পুনরায় জীবিত হয়ে উঠতে হবে?

(৮৩) আমাদের কে তো এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে আর অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও, মূলতঃ এটা কিছুই নয়, এ হলো পূর্ববর্তীদের রচিত কাহিনী মাত্র।

(৮৪) (হে রসূল!) আপনি জিজ্ঞাসা করুন এ পৃথিবী এবং তাতে যা কিছু আছে তা কার? যদি তোমরা জানো তবে বলো?

(৮৫) অবশ্যই তারা বলবে সবকিছুই আল্লাহ পাকের (হে রসূল!) তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহন করবেনা?

(৮৬) (হে রসূল!) আপনি জিজ্ঞাসা করুন সাত আসমান এবং মহান আরশের অধিপতি কে?

(৮৭) তারা তখনই বলবে এক আল্লাহ, (হে রসূল!) আপনি বলুন তবে কেন তোমরা ভয় করনা?

(৮৮) (হে রসূল!) আপনি জিজ্ঞাসা করুন সব কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে? যিনি রক্ষা করে থাকেন তাঁর নিকট থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না, বলো যদি তোমরা জানো।

(৮৯) তারা তখনই বলবে আল্লাহ পাকের (হে রসূল!) আপনি বলুন, তবে কিভাবে তোমরা যাদুগ্রস্ত হয়ে পড়লে?

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে তৌহীদের দলীল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। এরপর আলোচ্য আয়াত থেকে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর কথা এরশাদ হয়েছেঃ

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿٨١﴾

বরং তারা সেই কথাই বলে, যা তাদের পূর্ববর্তীরা বলেছে।

কাফেররা আখেরাতের জীবনকে অস্বীকার করতো। পুনরুত্থান সম্পর্কীয় সুস্পষ্ট

দলীল প্রমাণ সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও তারা পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতোনা, সব যুগের কাফেররা একই কথা বলেঃ

قَالُوْٓا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٨٢﴾

আশ্চর্য কথা! আমরা মরে গেলাম, পঁচে গলে অস্থিসার হয়ে গেলাম, মাটির মানুষ মাটির সাথে মিশে গেলাম, এভাবে শেষ হয়ে গেলাম, এরপর পুনরায় আমাদের পুনরুত্থান হবে এবং জীবনের হিসাব নিকাশ দিতে হবে, এসব আজগুবি কথা আমরা কখনও শুনিনি। মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হয়ে উঠতে হবে, এসব কথা যেভাবে আমাদেরকে বলা হয়েছে, তেমনি আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকেও বলা হয়েছে। মূলত এ সব হল অতীত কালের কল্পিত কাহিনী, বাস্তবের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, কাফেররা তাদের জীবনের সূচনাকাল সম্পর্কে চিন্তা করেনি যে এ জীবন লাভের পূর্বে তারা ছিল মাটি। যখন তাদের কোন অস্তিত্বই ছিলনা, এরপর আল্লাহ পাক তাদেরকে অস্তিত্ব দান করেছেন,এরপর তিনি তাদের জীবনের অবসান ঘটাবেন মৃত্যুর অলংঘনীয় বিধানের মাধ্যমে এবং তারপর তাদের পুনরুত্থান হবে। কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক বিষয়টিকে এভাবে উল্লেখ করেছেনঃ

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

এই মাটি থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনব, আর এই মাটি থেকেই তোমাদেরকে পুনরায় বের করে আনব। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক সুরায়ে বাকারায় এরশাদ করেছেনঃ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ

وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا ..... الاية

"কিভাবে তোমরা আল্লাহর নাফরমানী কর? অথচ তোমাদের কোন অস্তিত্বই ছিলনা, আল্লাহ পাকই তোমাদের জীবন দান করেছেন, এরপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, এরপর পুনরায় তিনি তোমাদের জীবিত করবেন, এরপর তোমরা আল্লাহ পাকের দরবারেই ফিরে যাবে।"

এ হল মানব জীবনের অবস্থার প্রকৃত বিবরণ। কিন্তু কাফেররা এই বিবরণে বিশ্বাস করতো না; বরং তারা বলতো, এ সব কল্পিত কাহিনী

اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨٣﴾

কেননা, আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকেও একথা বলা হয়েছে, ঠিক যেভাবে আমাদেরকে বলা হচ্ছে। কিন্তু এত সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও কারো পুনরুত্থান হয়নি, কেয়ামত কায়েম হয়নি। তাই আখেরাতে পুনঃর্জীবনের কথাকে পূর্বকালের লোকদের কল্পিত কাহিনী ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে!

কাফেরদের পরকালকে অস্বীকার করার কারণে তাদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়েছে, যা পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَآ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٤﴾

তওহীদের প্রমাণ

(হে রসূল!) আপনি জিজ্ঞাসা করুন, এই পৃথিবী এবং তাতে যা কিছু আছে তা কার? যদি তোমরা জান তবে বলো?

এভাবে আল্লাহ পাক তাঁর একত্ববাদের এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার কথা ঘোষণা করছেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করছেন, হে রসূল! আপনি কাফেরদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, এই পৃথিবী এবং তাতে যা কিছু আছে এসব কার? তারা অবশ্যই বলবে, এসব কিছু আল্লাহ পাকের। হে রসূল! আপনি তাদেরকে বলুন, যদি একথা সত্য হয় আর তা অবশ্যই সত্য, তাহলে তোমরা কেন উপদেশ গ্রহণ করোনা? কেন তোমরা তোমাদের ভবিষ্যত চিন্তা করোনা? কেন আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ মেনে চলনা? কেন আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্যের নিকট মাথা নত কর?

قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٨٥﴾

অর্থাৎ যখন সব কিছুই আল্লাহ পাকের, তখন পুনরায় তোমাদেরকে তিনি কেন সৃষ্টি করতে পারবেন না, কেন তোমরা এসব সত্যকে অস্বীকার কর? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহন করবেনা?

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ

(হে রসূল!) আপনি জিজ্ঞাসা করুন, সাত আসমান এবং মহান আরশের অধিপতি কে? তারা অবশ্যই বলবে এক আল্লাহ পাক। হে রসূল! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, যখন তোমরা একথা স্বীকার কর আল্লাহ পাকই আসমান জমিনের মালিক, তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তবে কেন তাঁকে ভয় করনা? কেন তোমাদের পরিণাম সম্পর্কে সাবধান হওনা? কেন তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক কর? কোন্ সাহসে সর্ব

শক্তিমান আল্লাহ পাককে ভুলে গিয়ে হাতের বানানো মূর্তির সম্মুখে মাথা নত কর? অথচ আল্লাহ পাকের প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, আধিপত্য এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্বীকার করছো, এমন অবস্থায় কেন তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছোনা?

قُلْ مَنْۢ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ

হে রসূল! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, সব কিছুর ক্ষমতা কার হাতে?

আলোচ্য আয়াতের مَلَكُوْتُ শব্দটির অর্থ হল ক্ষমতা, প্রভাব প্রতিপত্তি, সম্মান এবং পরিপূর্ণ আধিপত্য, সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব। এজন্যে এ শব্দটি শুধু আল্লাহ পাকের ক্ষমতার ব্যাপারেই বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এর দ্বারা অগণিত ধন-সম্পদ উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٨﴾

আর তিনিই যাকে ইচ্ছা তাকে আশ্রয় দেন, রক্ষা করেন। যাকে তিনি রক্ষা না করেন, বা আশ্রয় না দেন, কেউ তাকে রক্ষা করতে পারেনা।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যদি কাউকে শাস্তি দিতে চান, তবে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারেনা। আর তিনি যাকে রক্ষা করতে চান তবে কেউ তাকে কষ্ট দিতে পারেনা, যদি তোমরা জান,তবে বল।

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ

তারা অবশ্যই বলবে, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ পাকই; তাঁর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত।

قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ﴿٨٩﴾

হে রসূল! আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, যখন তোমরা এসব কথা স্বীকার কর,তবে কেন পথভ্রষ্ট হচ্ছ? তোমাদেরকে কোন্ যাদু পেয়ে বসল যে তোমরা সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হও, হককে বাতিল মনে কর, আর বাতিলকে হক ধারণা কর এবং যাদুগ্রস্ত লোকের ন্যায় দিশেহারা হয়ে গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুরে বেড়াও।

بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٩٠﴾ مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ
وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ
وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٩١﴾
عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٩٢﴾ قُلْ رَّبِّ
اِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ﴿٩٣﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ
الظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٤﴾ وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ﴿٩٥﴾
اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ؕ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ﴿٩٦﴾

তরজমা

(৯০) বরং আমি তো তাদের নিকট সত্য পৌছিয়ে দিয়েছি, প্রকৃতপক্ষে তারাই মিথ্যাবাদী।

(৯১) আল্লাহ পাক কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সাথে অপর কোন মাবুদ নেই। যদি থাকত, তবে প্রত্যেক মাবুদ নিজের সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের উপর অবশ্যই প্রাধান্য বিস্তার করত। তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে আল্লাহ পাক কত পবিত্র।

(৯২) গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু তিনি জানেন, তারা যাকে শরীক করে তা থেকে তিনি অনেক উর্দ্ধে।

(৯৩) (হে রসূল!) আপনি বলুন, হে আমাদের প্রতিপালক। তাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি যদি তুমি আমাকে দেখাতে চাও।

(৯৪) তবে হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ঐ পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত করোনা।

(৯৫) আর আমি তাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, (হে রসূল! আপনাকে) তা দেখাতে অবশ্যই সক্ষম।

(৯৬) মন্দ কথার জবাবে তাই বলুন যা উত্তম, তারা যা বলে সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অবগত।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে তৌহিদের বিবরণ ছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীকে তৌহিদের উপর বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু মক্কাবাসী সেই আহবানে সাড়া দেয়াতো দুরের কথা, বরং তারা তাঁর রেসালতকে অস্বীকার করেছে এবং তার বিরোধিতা করেছে এমনকি তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতিও অকথ্য নির্যাতন করেছে। তাই আল্লাহ পাক এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যতার কথা, এবং তাঁর আহবানের বস্তুনিষ্ঠতার কথা ও কাফেরদের মিথ্যাবাদিতার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন।

بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ

"বরং আমি তাদের নিকট সত্যই পরিবেশন করেছি; বরং তারাই মিথ্যাবাদী।"

মূলতঃ যা ধ্রুব সত্য, যা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত, যা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট তা হলো তৌহিদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদ। এই তৌহিদের প্রতি ঈমান আনয়নের আহবানই জানিয়েছেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। নিঃসন্দেহে এটি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য। কাফেররা এ সত্যকে অস্বীকার করে। তাই তারা সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী, তারা মিথ্যা বলে অভ্যস্ত, সত্য বলা তাদের ধাতে সয়না। তাই সত্য রসূলকে তারা মেনে নেয়না। এজন্যে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٩٠﴾

"আর নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।"

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতের الحق শব্দ দ্বারা তৌহিদ এবং কেয়ামতের ওয়াদা উদ্দেশ্য। তৌহিদ যেমন সত্য, তেমনি কেয়ামত যে অবশ্যই হবে এবং প্রতিটি মানুষকে যে অবশ্যই আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাজির হতে হবে একথাও একান্ত সত্য। আর কাফেররা যে মিথ্যাবাদী, একথার তাৎপর্য হলো, তৌহিদ এবং কেয়ামতকে অস্বীকার করার ব্যাপারে তারা মিথ্যবাদী, যা ধ্রুব সত্য, তাকে অস্বীকার করাই হলো মিথ্যাবাদিতা।১

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -২০৯

"আল্লাহ পাক কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সাথে অপর কোন মাবুদ নেই।"

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ এতে দু'টি কথা বলা হয়েছে। (এক) আল্লাহ পাক কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, যেমন কাফেরদের এক দল বলত যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের কন্যা (নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক)। আর খ্রীষ্টানদের একদলও হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করে। এসব ভিত্তিহীন কথার অসারতা ঘোষণা করে এরশাদ হয়েছেঃ

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ

অর্থাৎ "আল্লাহ পাক কোন সন্তান গ্রহণ করেননি," নিখিল বিশ্বের তিনি একমাত্র অধিপতি। সন্তান সন্ততির তাঁর কোন প্রয়োজনই নেই। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, কারো সাহায্যের তাঁর কোন প্রয়োজনও নেই। তিনি সকল দুর্বলতা থেকে পবিত্র। তাঁর মহিমা সব কিছু থেকে উর্দ্ধে। আর দ্বিতীয় যে কথাটি এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, তা হলো ১

وَمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ

তাঁর সাথে অপর কোন মাবুদ নেই। যদি থাকতো তবে প্রত্যেক মাবুদ নিজের সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের উপর অবশ্যই প্রাধান্য বিস্তার করতো।

এ আয়াতে মুশরেক তথা পৌত্তলিকদের ভ্রান্ত ধারণার বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে যে আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীকও নেই। অতএব, যারা মূর্তিপূজা করে আর এ বিশ্বাসও করে যে এসব হল আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের মাধ্যম, তারা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট, তাদের বিশ্বাস বাতিল, পরিত্যাজ্য। আল্লাহ পাকের একচ্ছত্র আধিপত্য সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর কোন অংশীদার নেই, আর এমন কেউ নেই যার কোন স্বতন্ত্র ক্ষমতা রয়েছে।

اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ

অর্থাৎ যদি কোন ভিন্ন স্বতন্ত্র ক্ষমতাশালী শক্তি থাকতো তবে সেই ক্ষমতাসীন সবকিছু নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং

১। তফসীরে কবীর, খন্ড– ২৩, পৃষ্ঠা–১১৭

وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ

প্রত্যেকে তার দলবল নিয়ে প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণ করতো এবং একের উপর অন্যের বিজয় হত। আর সমগ্র বিশ্বে বর্তমানে যে শংখলা এবং নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান রয়েছে তা কখনও দেখা যেতনা; বরং দুদিনেই সারা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا

যদি আসমান জমিনে এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ থাকতো তবে আসমান জমিন ধ্বংস হয়ে যেত।

বর্তমান নিয়ম শংখলা মোটেই থাকত না। তাই আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কোন মাবুদের কথা চিন্তা করা নিঃসন্দেহে অমার্জনীয় অপরাধ। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۙ﴿۹۱﴾

"তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে আল্লাহ পাক কত পবিত্র।"

অর্থাৎ সন্তান সন্ততি হওয়া এবং আল্লাহ পাকের কোন শরীক হওয়া এ সব কিছু থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। তাঁর পবিত্র সত্তা এ সব দূর্বলতা থেকে অনেক উর্ধ্বে।

عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۹۲﴾

গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু তিনি জানেন, তারা যাকে শরীক করে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে। বিশ্ব সৃষ্টির কোন কিছুই তাঁর অজানা নেই, আর কোন কিছুই তাঁর ক্ষমতার আওতার বাইরে নয় সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, কর্তৃত্বধীন। আর সমগ্র সৃষ্টি জগতে যার কাছে যা আছে সবই তাঁর দান, এতদ্ব্যতীত আর কিছুই নয়। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই, তিনিই একমাত্র মাবুদ, একমাত্র উপাস্য, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রিজকদাতা, তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনিই সর্বশ্রোতা, তিনি সর্বজ্ঞ। আর একথা মোশরেকরাও মানতো। অতএব, অন্য কিছুর মাবুদ হওয়ার কোন প্রশ্নই উত্থিত হয়না।

قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ﴿۹۳﴾

(হে রসূল!) আপনি বলুন, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি যদি তুমি আমাকে দেখতে দাও। তবে হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এ পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত করোনা।

প্রিয়নবী (সঃ)–কে সান্ত্বনা

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কাফেরদের নাফরমানী এবং পথভ্রষ্টতার বিবরণ ছিল, তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিদ্রুপ করে বলতো, যারা আপনাকে অস্বীকার করে তাদের প্রতি আজাব কবে আসবে? এ আয়াত থেকে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে একটি বিশেষ সময়ে দোয়া করার জন্যে তালকীন করেন যে কাফেরদের কষ্টদায়ক কথায় তিনি যেন মন আহত এবং চিন্তিত না হন।

আর তাদের মন্দ আচরণের জবাব ভাল আচরণ দিয়ে দেন, আর একথার প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখেন, যে আযাবের কথা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রদত্ত হয়েছে তা শীঘ্র হোক বা বিলম্বে অবশ্যই আসবে। আর এরপর কেয়ামত অবশ্যই হবে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ رَّبِّ ....

অর্থাৎ দুরাত্মা কাফেরদের অন্যায় আচরণের শোচনীয় পরিণাম স্বরূপ আল্লাহ পাকের আজাব অনিবার্য। তাই মোমেন মাত্রেরই কর্তব্য হল এই দোয়া করা।

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِىْ فِى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٤﴾

হে পরওয়ারদেগার! যে আযাবের কথা কাফেরদের সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে, যদি তুমি আমাকে দেখাতে চাও তবে আমাদেরকে এই পাপীষ্ঠদের দলে ফেলেদিওনা।

وَاِنَّا عَلٰۤى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ

হে রসূল! এই পৃথিবীতে আপনার সম্মুখেই এই পাপীষ্ঠদের শাস্তি বিধানের ক্ষমতা আমার রয়েছে।

যদিও এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কিন্তু উদ্দেশ্য হল সকলকে শিক্ষা দেয়া এই মর্মে যে সর্বদা আল্লাহর

আযাব থেকে ভীত সন্ত্রস্ত থাকা সকলেরই একান্ত কর্তব্য। কেননা, কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, যারা পাপীষ্ঠ তাদের প্রতি আপতিত শাস্তি অন্যদের ধ্বংসের কারণও হয়ে যায়। তাই এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে,

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً

আর ভয় কর সেই আযাবকে যা তোমাদের মধ্যে যারা পাপীষ্ঠ শুধু তাদের উপরই পতিত হবেনা, বরং সে আযাব আসবে সামগ্রীকভাবে। আর হাদীস শরীফেও রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এভাবে দোয়া করতেন।

واذا اردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون

হে পরওয়ারদেগার! যদি তুমি কোন সম্প্রদায়কে বিপদগ্রস্ত করতে চাও তবে আমাকে তা থেকে রক্ষা করো, আমাকে নিজের কাছে ডেকে নিও, যেন আমি আযাবে নিপতিত না হই। এতে কোন সন্দেহ নেই যে আল্লাহর নবীর উপর কখনও আযাব আসবেনা, কিন্তু এতে বিনয়ের শিক্ষা রয়েছে। তাই বান্দা মাত্রেরই কর্তব্য হল, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে বিনয়াবনত হয়ে থাকা এবং সর্বক্ষণ আল্লাহর আযাবকে ভয় করতে থাকা। কখনও জুলুম অত্যাচারের শাস্তি এমন লোকদের উপর আপতিত হয়, যারা পাপীষ্ঠদের মধ্যে থাকেনা, আযাব আসে পাপীষ্ঠদের উদ্দেশ্যে, কিন্তু কখনও এমন লোকদের উপরও তা আপতিত হয় যারা পাপীষ্ঠ নয়।

যেহেতু কাফেররা আল্লাহ পাকের আযাবকে অস্বীকার করতো এবং আযাবের উল্লেখ করে বিদ্রুপ করতো তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ۝٩٥

অর্থাৎ হে রসূল! যারা আল্লাহর আযাবকে তরান্বিত করতে বলে এবং আযাব কবে আসবে তা জিজ্ঞাসা করে, তাদের শাস্তি আমি এখনই দিতে পারি, আপনার সম্মুখেই দিতে পারি এটি কোন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু আপনার কাজ হল তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করা।

তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ

মন্দ কথার জবাবে তাই বলুন, যা উত্তম, অর্থাৎ তারা মন্দ কথা বললে তাদের থেকেবিমুখ হউন, তাদের বিরুদ্ধে সবর বা ধৈর্যওসহনশীলতার পরিচয় দিন। এ আয়াতে কাফেরদের জুলুম অত্যাচারের কারণে অধৈর্য্য না হওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং সবর অবলম্বনের তালীম দেয়া হয়েছে । অবশ্য পরবর্তী কালে জেহাদের আয়াত নাজিল হওয়ার কারণে আলোচ্য আয়াতের হুকুম মনসুখ হয়েছে। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে أَحْسَنُ শব্দ দ্বারা কলেমায়ে তৈয়্যেবাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর السَّيِّئَةَ শব্দ দ্বারা শেরককে উদ্দেশ্য করাহয়েছে।

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾

"তারা যা বলে সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অবগত।"

সবর অবলম্বন করুন

অর্থাৎ হে রসূল! কাফেররা আপনার সম্পর্কে যে আপত্তিকর মন্তব্য করে সে সম্পর্কে আমি সম্পুর্ণ অবগত এবং তাদের শাস্তি প্রদানেও সম্পূর্ণ সক্ষম। অতএব, আপনি তাদের থেকে প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা করবেন না। সমস্ত বিষয় আমার উপর ছেড়ে দিন। তাদের মন্দ কথার প্রতি উত্তরে আপনি উত্তম কথা বলুন। তাদের অনর্থক কথা–বার্তায় কর্ণপাত করবেন না। আপনার উদার আচরণের কারণে হয়তো তাদের কোন কোন লোক আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং ইসলাম গ্রহণের তৌফিক পেয়ে যাবে। এমন অবস্থায় আপনার আগমনের উদ্দেশ্য সফল হবে। যেহেতু তাদের যাবতীয় আচরণ সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অবগত এবং তাদের শাস্তি বিধানে সম্পূর্ন সক্ষম। এজন্যে তাদের শাস্তির ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না; বরং সবর অবলম্বন করুন।১

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত–আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–৮৮–৮৯

তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৮, পৃষ্ঠা –২১০–১১

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ﴿٩٧﴾ وَاَعُوْذُ بِكَ
رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ﴿٩٨﴾ حَتّٰىٓ اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ
ارْجِعُوْنِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّيْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ؕ اِنَّهَا كَلِمَةٌ
هُوَ قَآئِلُهَا ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٠٠﴾ فَاِذَا نُفِخَ
فِى الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿١٠١﴾
فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ
مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِىْ جَهَنَّمَ
خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾

তরজমা

(৯৭) আর বলুন, হে আমার প্রতিপালক! আমি শয়তানের প্রারাচনা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি।

(৯৮) হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে।

(৯৯) অবশেষে যখন তাদের কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় পাঠিয়ে দাও।

(১০০) যাতে করে আমি নেক আমল করতে পারি, যা ইতিপূর্বে করিনি। কখনও নয়, সে যা বলছে তা একটি কথার কথা মাত্র, যেদিন তারা উত্থিত হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের পিছনে রয়েছে পর্দা।

(১০১) এবং যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না, তারা একে অন্যকে জিজ্ঞাসাও করবে না।

(১০২) এবং যাদের (নেক আমলের) পাল্লাভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম।

(১০৩) এবং যাদের (নেক আমলের) পাল্লা হালকা হবে, তারা নিজেদেরই ক্ষতি করেছে এবং তারা দোযখে চিরদিন থাকবে।

(১০৪) অগ্নি তাদের মুখমন্ডলকে ঝলসিয়ে দিবে, আর তারা থাকবে সেখানে বীভৎস চেহারায়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কাফেরদের জুলুম অত্যাচার ও মন্দ আচরণের মোকাবেলায় তাদের সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। মন্দের মোকাবেলা মন্দ পন্থায় নয়; বরং উত্তম পন্থায় করার শিক্ষা দিয়েছেন। আর আলোচ্য আয়াতে শয়তানের প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষার লক্ষ্যে আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন। একথা সর্বজন বিদিত যে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার পথে শয়তান চিরদিনই বাধা সৃষ্টি করেছে, তার প্ররোচনা প্রতারণা এবং প্রবঞ্চনার ঘৃণ্য কৈশল বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেছে। শয়তানের আক্রমন থেকে আত্মরক্ষার সঠিক পথ হল, মহান আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং আল্লাহ পাককে স্মরণ করা। শুধু আল্লাহ পাকই শয়তানের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিতে পারেন। যদিও আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে, কিন্তু এতে শিক্ষা রয়েছে সমগ্র মানব জাতির জন্যে যেন শয়তানের প্রতারণা থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়।[১]

আলোচ্য আয়াতের আলোকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শয়তানের প্রতারণা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সর্বদা আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু

১। তফসীরে কবীর, খন্ড- ২৩, পৃষ্ঠা-১১৮

আলাইহে ওয়াসাল্লাম কখনো শয়তানের ধোকা এবং প্রবঞ্চনা থেকে আত্মরক্ষার লক্ষ্যে অন্য দোয়াও পাঠ করতেন যেমন,

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

মূলতঃ বান্দার কোন কাজে তা পানাহার হোক বা অন্য কিছু, যখন সে আল্লাহ পাককে স্মরণ করে, তখন শয়তান ঐ কাজে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়না।

আবু দাউদ শরীফে হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্য একটি দোয়াও সংকলিত হয়েছে, কখনো তিনি এ দোয়াও করতেন।

بِسْمِ اللَّهِ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ
وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ

মসনদে আহমদে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, বর্ণনাকারী বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এ দোয়া শিক্ষা দিতেন যাদের অনিদ্রার কষ্ট থাকে তারা এ দোয়া পাঠ করতেন।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ
وَمِنَ الْغَرَقِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর এ নিয়ম ছিল যে তিনি তাঁর সন্তানদের মধ্যে যে বয়স্ক হ'ত, তাকে এ দোয়া শিক্ষা দিতেন। আর যে অবুঝ হত তার জন্যে এ দোয়া লিপিবদ্ধ করে গলায় ঝুলিয়ে দিতেন।

আবু দাউদ ছাড়া তিরমিজী এবং নেসায়ী শরীফেও এ হাদীস সংকলিত হয়েছে।১

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ

অবশেষে যখন তাদের কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক। আমাকে পুনরায় পাঠিয়ে দাও।

আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ হে রসূল। আপনি কাফেরদের সম্মুখে উদার এবং উন্নত আদর্শ পেশ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৮, পৃষ্ঠা-২৪-২৫

করুন, তারা আপনার সাথে মন্দ ব্যবহার করলেও আপনি তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করুন এবং তাদের বিচার আমার উপর ছেড়ে দিন। যখন তাদের কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হবে, যখন তারা পরিকালীন জিন্দেগীর আযাবের পূর্বাভাষ দেখতে পাবে, তখনই তাদের চেতনা ফিরে আসবে। তারা বিলাপ করে বলবে, হে আল্লাহ! আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে যেতে দিন, আমি সৎ কাজ করবো। ইতিপূর্বে যে ত্রুটি রয়ে গেছে, অর্থাৎ নেক আমল করিনি, এবার তা করবো, আর কখনো নাফরমানী করবোনা।

জীবন সায়াহ্নে মানুষের অবস্থা

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ কাফেরদেরকে তাদের প্রাণ সংহারের পূর্ব মুহূর্তে তাদের জন্যে আখেরাতে জান্নাত ও দোজখ উভয় স্থানে যে দু'টি ঠিকানা নির্দিষ্ট রয়েছে, তা দেখিয়ে দেয়া হয় এবং বলা হয়, যদি আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনতে তবে জান্নাতের এ ঠিকানা লাভ করতে। আর যেহেতু ঈমান আনেনি, তাই দোজখের এ ঠিকানা তার জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে আছে, তখন সে বলে,

رَبِّ ارْجِعُوْنِ ﴿٩٩﴾

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দুনিয়াতে ফেরত পাঠিয়ে দিন, ইতিপূর্বে আমি ঈমান আনিনি এবার ঈমান আনবো এবং নেক আমল করবো, আল্লাহর রাহে ধন–সম্পদ ব্যয় করিনি, এবার তা করবো।

এবনে জোরায়েজের সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মোমেন যখন (মৃত্যুর) ফেরেশতা দেখে, তখন ফেরেশতাগন তাকে বলে, আমরা কি তোমাকে দুনিয়ার দিকে ফেরত পাঠাবো? মোমেন তখন বলে, দুঃখ এবং দুশ্চিন্তার গৃহে প্রত্যাবর্তন করা আমি পছন্দ করিনা বরং আমি আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হতে চাই পক্ষান্তরে, কাফের যখন মৃত্যুর ফেরেশতা দেখে তখন সে বলে

رَبِّ ارْجِعُوْنِ

"হে পরওয়ারদেগার! আমাকে পৃথিবীতে ফেরত পাঠিয়ে দিন"। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত এবং হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে আল্লাহ পাকের

দরবারে হাজির হওয়া পছন্দ করে, আল্লাহ পাকও তার মোলাকাত পছন্দ করেন। আর যে আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হওয়া অপছন্দ করে, আল্লাহ পাক তার মোলাকাতকে ঘৃণা করেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বা অন্য কোন উম্মুল মোমিনীন আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা তো মৃত্যুকে অপছন্দ করি, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ বিষয়টি এমন নয়; বরং কথা হলো এই, মোমেন যখন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়, তাকে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির এবং সম্মানিত করার সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার নিকট দুনিয়ার কোন জিনিষই (যা পেছনে ফেলে এসেছে) সম্মুখে আগমনকারী বস্তু থেকে প্রিয় হয়না। তখন সে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাজির হওয়া পছন্দ করে। পক্ষান্তরে, যখন কাফের মৃত্যুর মুখোমুখি হয়, তখন তাকে আল্লাহ পাকের আযাব সম্পর্কে অবহিত করা হয়। তখন সে আগমনকারী বস্তুকে অপছন্দ করে। আর আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হওয়া পছন্দ করেনা। আল্লাহ পাকও তার মোলাকাতকে ঘৃণা করেন। كَلَّا

অবশ্যই নয়, অর্থাৎ দুনিয়াতে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করানো হবেনা।

إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا

সে যা বলেছে তা একটি কথার কথা মাত্র। আর এ কথা আন্তরিক নয়; রবং মুখের কথা।

وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ

যদি তাদেরকে ফেরতও পাঠান হয় তবুও তারা অতীতের সেই কুকীর্তিই করবে যে সম্পর্কে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾

আলমে বরজখের বিবরণ

যেদিন তারা উত্থিত হবে, সেদিন পর্যন্ত তাদের পিছনে রয়েছে পর্দা।

অর্থাৎ মৃত্যুর ভয়ংকর অবস্থা দেখেই কাফেররা ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে ফরিয়াদ করবে যে আমাদেরকে দুনিয়াতে ফেরত যেতে দিলে আমরা ঈমান আনবো, নেক আমল করবো। কিন্তু তারা এখনও আযাবের কোন কিছুই দেখেনি, আখেরাতের আযাবতো এখনও অনেক দূরে।

ইহলোক ও পরলোকের মধ্যখানে রয়েছে বরজখ বা মধ্যলোক। মরণের পরে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার পুর্বে মানুষকে বহু বছর এখানেই থাকতে হয়। দু'টি জিনিষের মধ্যখানে যা আড়াল হয়ে থাকে তাকে বরজখ বলা হয়, অর্থাৎ দুনিয়ার জীবন এবং আখেরাতের জীবনের মধ্যখানে যে সময়টি রয়েছে তাকেই বরজখ বা মধ্যলোক বলা হয়ে থাকে। যেখানে আখেরাতের কিছু নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। ঈমানদার নেককার হলে বেহেশতের নেয়ামতের কিছু নমুনা দেখতে পাবে। আর বেঈমান বা পাপীষ্ঠ হলে দোযখের শাস্তির কিছু নমুনা দেখবে। মৃত্যুর পর থেকে কেয়ামতের দিন পুনরুত্থান পর্যন্ত এ সময়ই অতিবাহিত হয় আলমে বরজখে।১

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, পাপীষ্ঠ লোকদের জন্যে তাদের কবর হবে অত্যন্ত বিপদজনক স্থান। কবরে তাদেরকে কালসাপ দংশন করতে থাকবে। একটা বড় কাল সাপ পাপীষ্ঠ ব্যক্তির মাথার দিক থেকে দংশন করবে এবং নিচের দিকে যাবে, আর একটি কালসাপ পায়ের দিক থেকে দংশন করে মাথার দিকে পৌছবে। এভাবে উভয় সাপ দংশন করতে করতে দেহের মধ্যখানে একত্রিত হবে। আর নাফরমানদের এ অবস্থা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। মূলতঃ বরজখ হল দুনিয়া ও আখেরাতের মাঝে একটি আড়াল। এ আয়াতে পাপীষ্ঠ লোকদেরকে সাবধান করা হয়েছে যে আখেরাতের আযাবের পূর্বে মধ্য লোকেও তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা।২

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, বরজখ হল তাদের এ জীবন এবং পরজীবনের মধ্যে আড়াল।

আর তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, বরজখ হল তাদের দুনিয়ার অবশিষ্ট বয়স। কেননা, যতক্ষণ দুনিয়ার এ জীবন শেষ না হবে, সে পর্যন্ত প্রকৃত জীবনের দিকে তাদের প্রত্যাবর্তন হবেনা।

তফসীরকার জাহ্যাক (রঃ)(বলেছেন, বরজখ হল, মৃত্যুর পর থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সময়।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেন, বরজখ দ্বারা কবরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।৩

আল্লামা সয়ুতী (রঃ) লিখেছেন, মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, মৃত্যুর পর থেকে কেয়ামতের

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত–আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–৮৯

২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা–১৮, পৃষ্ঠা–২৬

৩। তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৮, পৃষ্ঠা –২১৩

পুনরুত্থান পর্যন্ত সময়কে বরজখ বলা হয়। এবনে আবি হাতেম মুজাহেদ (রঃ) এর আর একটি কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের মধ্যকার সময়কে বরজখ বলাহয়।

আর এবনে আবি হাতেম, মোহাম্মদ এবনে আবুল কারজীর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, বরজখ হল দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের মধ্যকার সময় যেখানে দুনিয়ার অধিবাসীদের ন্যায় পানাহার করা হবেনা। আর আখেরাতের অধিবাসীদের ন্যায় আমলের শাস্তি বা পুরস্কারও ভোগ করবে না।

আর রবী (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে, বরজখ হল কবর। আর এবনে জরীর ও এবনে আবি হাতেম হযরত আবু উমামা (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি একটি জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। যখন দাফন কার্য শেষ হল, তখন তিনি বললেন, কেয়ামতের দিন পুনরুত্থান পর্যন্ত এই ব্যক্তি বরজখে থাকবে।১

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ জীবনের পরে পরকালীন জীবনের পূর্বে আল্লাহ পাক মানুষের জন্য আর একটি অবস্থান স্থল তৈরী করেছেন, তা এ পৃথিবী থেকে এত বড় মায়ের উদর থেকে পৃথিবী যত বড়। এখানে ঈমান ও কুফরের ভীত্তিতে যে সব আমল করা হয় তার অনুসন্ধান করা হয়, আখেরাতের আযাবের কিছু নমুনা দেখান হয়, অবশ্য প্রকৃত আযাব শুরু হবে কেয়ামতের দিন হিসাব নিকাশের পর থেকে।২

আলমে বরজখের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর যখন কেয়ামত কায়েম হবে এবং দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখন মৃত ব্যক্তিরা কবর থেকে বের হয়ে আসবে। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾

এবং যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না আর তারা একে অন্যকে জিজ্ঞাসাও করবে না।

পূর্ববর্তী আয়াতে আলমে বরজখের কথা বলা হয়েছে বরজখ বা মধ্য লোকের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেই শুরু হবে আখেরাতের জিন্দেগী। আর এ পর্যায়ে সর্ব প্রথম শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখন সমগ্র মানব জাতিকে একই প্রান্তরে সমবেত করা হবে সেদিনের অবস্থা এত ভয়াবহ এবং

১। তফসীরে আদদররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৬-১৭

২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৮৯

বিপদজনক হবে, যে প্রত্যেকে নিজের নিজের চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে, কেউ কারো দিকে ফিরেও তাকাবেনা। সেদিন আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, মা-মেয়ে এক অন্যকে দেখলে আত্মীয়তার দাবীতে কোন খোজ খবর নিবেনা, এমনকি একজন আরেকজন থেকে পলায়ন পর হবে, তাই অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ

"সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন ভাই ভাই থেকে পলায়ন করবে।" দুনিয়াতে যার সাথে যার সম্পর্ক ছিলো সে সম্পর্কের কোন লক্ষণই সেখানে দেখা যাবে না।

ইবনে জারীর ইবনে মুনজের, ইবনে আবিহাতেম, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন শিংগায় ফুঁক দেয়ার পর আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করবে না এমনকি তখন এক আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ জীবিতও থাকবে না।১

সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রহঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে আলোচ্য আয়াতে শিংগায় ফুঁক দেয়ার যে কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে যে শিংগায় ফুঁক দিলে সমগ্র মানব জাতি বেঁহুশ হয়ে যাবে যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখন আসমান জমীনের সবই বেঁহুশ হয়ে পড়বে।

কিন্তু আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) বলেছেন মূলতঃ এই শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে সমগ্র মানব জাতিকে একত্রিত করার উদ্দেশ্যে। এই শিংগায় ফুঁক দেয়ার পরই সমগ্র মানব জাতি কবর থেকে বের হয়ে আসবে। কেয়ামতের দিন প্রত্যেকের নাম ধরে বলা হবে "অমুকের ছেলে অমুক ব্যক্তির নিকট যদি কারো কোন হক থাকে সে যেনো তার হক নেয়ার জন্য হাজির হয়," ঐ মুহূর্তে যার হক তার পিতার উপর অথবা পুত্রের উপর বা স্ত্রীর উপর বা ভাইয়ের উপর থাকবে সে খুশী হবে। এরপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের শেষাংশ পাঠ করেছেন। সেদিন ঐ বিপদজনক মুহূর্তে আত্মীয়তার

১। অদ্দুররুল মানছুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা -১৭

বন্ধন থাকবে না।সাধারণতঃ দুনিয়াতে মানুষ নিজের বংশের ব্যাপারে গৌরব করে থাকে কিন্তু সেদিন মানুষ বংশ গৌরব করবে না।

অথবা এর অর্থ হলো সেদিন আত্মীয়তার দ্বারা কোন উপকার পাওয়া যাবে না, কেননা সেদিন প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় এত ব্যাকুল থাকবে যে অন্যের কথা চিন্তা করার সুযোগই থাকবেনা।১

এমনকি পরস্পরের আত্মীয়তার অনুভূতিও লোপ পাবে। আর সেদিন অবস্থা অত্যন্ত সংঙ্গীন হবে, পরস্পরকে সাহায্য করাতো দূরের কথা বরং একে অন্যকে দেখলে পালিয়ে যাবে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন আলোচ্য আয়াতের

بَيْنَهُمْ

শব্দের হুম সর্বনামটি দ্বারা কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত অবস্থা কাফেরদের হবে, মুমিনদের অবস্থা তা নয়, কেননা মুমিনদের সম্পর্কে অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

"আমি মুমিনদের সাথে তাদের সন্তানদেরকে অন্তর্ভূক্ত করবো" অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন মুসলমানদের শিশুরা বের হবে তাদের হাতে থাকবে শরবত, লোকেরা বলবে আমাদেরকে পান করতে দাও, তখন তারা বলবেঃ না, আমরা আমাদের পিতা মাতাকে পান করাবো।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন আমার বংশীয় সম্পর্ক ব্যতীত যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। আল্লামা বগভী (রহঃ) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃএর অর্থ হলো কেয়ামতের দিন আত্মীয়তার যাবতীয় বন্ধন ছিন্ন হবে, কিন্তু শুধু আমার সম্পর্ক থাকবে অর্থাৎ পবিত্র কোরআনও ঈমানের ভিত্তিতে যে সম্পর্কে গড়ে উঠবে তা থাকবে। মসনদে আহমদে একখানি হাদীস রয়েছে প্রিয়নবী

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -২১৪

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ফাতেমা আমার দেহের একটি অংশ, যা তাকে অসন্তুষ্ট করে তা আমাকেও অসন্তুষ্ট করে, আর যা তাকে সন্তুষ্ট করে তা আমাকেও সন্তুষ্ট করে। কেয়ামতের দিন সমস্ত আত্মীয়তার বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, কিন্তু আমার বংশ এবং সম্পর্ক বিছিন্ন হবে না।

আমীরুল মোমিনীন হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) এর কন্যা উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করেন এবং তিনি বলতেন, আল্লাহর শপথ! আমি শুধু এই উদ্দেশ্যে এই বিয়ে করেছি যেন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে আমার একটি বংশীয় সম্পর্ক থাকে। কেননা

"আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, কেয়ামতের দিন সব সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হবে, কিন্তু আমার সাথে সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে"বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) এই বিবাহের দেন মোহর আদায় করেছিলেন ৪০ হাজার দেরহাম।

একটি সন্দেহ ও তার জবাব

আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কেয়ামতের কঠিন মুহূর্তে আপনজনেরা একে অন্যকে, জিজ্ঞাসাও করতে পারবেনা, প্রত্যেকে নিজের অবস্থা নিয়ে এত নিমগ্ন হয়ে পড়বে যে অন্যের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা সম্ভবই হবে না। অথচ অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ

"তারা পরস্পর একে অন্যের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে" এর জবাবে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ কেয়ামতের দিনের অবস্থা বিভিন্ন প্রকার হবে, কখনও এত ভয় ভীতি হবে যে একে অন্যকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা সম্ভবই হবেনা।

আর কখনও এমন সময় আসবে যে ঐ ভয় ভীতি লাঘব হবে, তখন একে অন্যের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করবে। কেননা, কেয়ামতের দিনের সময় দুনিয়ার জীবনের ৫০

হাজার বছরের সময়ের সমান হবে, অথবা এর অর্থ হলো কাফেররা একে অন্যকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারবেনা।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী লিখেছেনঃ কেয়ামতের দিন আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকবেনা; বরং প্রত্যেকের নিজ নিজ আমলের সংগেই তার সম্পর্ক থাকবে। এজন্যে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

অতএব, যার (নেক আমলের) পাল্লা ভারী হবে, সে-ই সফলকাম হবে।

অর্থাৎ যে ঈমানদার অবস্থায় অধিক পরিমাণে নেক আমল করবে, সে-ই নাজাত পাবে এবং তার জীবন সাধনাই সাফল্যমন্ডিত হবে। আখেরাতে নেক আমলের ভিত্তিতে এবং আমলের নিয়ত, এখলাস বা আন্তরিকতার মানদন্ডে উচ্চ মর্তবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ঐক্যমত হল এই যে, কেয়ামতের দিন মিজান (পাল্লা) কায়েম হবে এবং প্রত্যেকের আমল পরিমাপ করা হবে, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। অবশ্য বাতিল ফেরকা যেমন খারেজী, মোতাজিলা এবং শিয়া প্রভৃতি এ কথায় বিশ্বাস করেনা।

ইমাম বায়হাকী "আল বা'সে" হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। এ হাদীসে জীব্রাঈল (আঃ) হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছেন ঈমান কি?

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ (ঈমান হলো) আল্লাহকে মানা, আল্লাহ পাকের ফেরেশতা ও রসূলগণকে মানা এবং জান্নাত দোজখ, মিজান এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর একীন করা। আর এ কথায় বিশ্বাস করা যে ভাল-মন্দ তকদীর আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নির্ধারিত।

জীব্রাঈল (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, যদি আমি তা করি তবে কি আমি মোমেন হবো?

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ হ্যাঁ।

তখন জীব্রাঈল (আঃ) বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন।

হাকেম মোস্তাদরাকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন মিজান কায়েম করা হবে (আর তা এত বড় হবে যে) আসমান ও জমীন তাতে রেখে দেয়া যাবে তবুও স্থানাভাব হবে না।

ইবনে মোবারক "আজ জোহদে" হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং ইবনে হাব্বান ও তাঁর তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর তরফ থেকে অনুরূপ কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মিজানের একটি রসনা এবং দু'টি পাল্লা থাকবে।

আমল পরিমাপের প্রক্রিয়া

কেয়ামতের দিন মানুষের আমল পরিমাপের জন্যে মিজান কায়েম করা হবে এবং প্রত্যেকের নেক এবং বদ আমল পরিমাপের পর যার নেক আমল অধিক পরিমাণে হবে তাকে জান্নাতে প্রেরণ করা হবে, আর যদি বদ আমল অধিক হয়, তবে দোজখে প্রেরিত হবে, কিন্তু প্রশ্ন হ'ল আমল পরিমাপের প্রক্রিয়া কি হবে?

তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ সম্পর্কে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেনঃ মানুষকে আমল সহ পরিমাপ করা হবে। মুমেনের ওজন তার নেকী অনুযায়ী হবে, আর কাফেরের কোন ওজনই হবেনা।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন কোন কোন লোককে হাজির করা হবে যারা অত্যন্ত হৃষ্ট-পুষ্ট হবে। কিন্তু আল্লাহ পাকের নিকট তাদের ওজন মশার পাখার বরাবরও হবেনা। এরপর হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তেলাওয়াত করেন فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا

"কেয়ামতের দিন আমি তাদের কোন ওজন দান করবনা"। এ হাদীসের বর্ণনাকারী হলেন হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ)। পরিমাপের এ প্রক্রিয়া মোতাবেক যাদের ওজন হালকা হবে, তারা কাফেরই হবে এমনকি, মোমেন যদি গুণাহগারও হয়, তবুও তার ওজন হালকা হবেনা।

(২) আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ ব্যক্তিকে নয়; বরং আমলনামা পরিমাপ করাহবে।

অর্থাৎ যে সব গ্রন্থে ভাল এবং মন্দ আমলের বিবরণ লিপিবদ্ধ হবে, সেগুলোর পরিমাপ করাহবে।

তিরমিজী, এবনে মাজা, এবনে হাব্বান, বায়হাকী এবং হাকেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে সকলের সম্মুখে হাজির

করা হবে এবং তার আমলনামার নিরানব্বইটি দফতর খোলা হবে। আর প্রত্যেকটি দফতর তার দৃষ্টিসীমা পরিমাণ সুদীর্ঘ হবে। এরপর আল্লাহ পাক তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, এ আমল নামা সমূহে তোমার কর্মের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে, তার কোন্‌টিকে তুমি অস্বীকার কর? আমার তরফ থেকে নিযুক্ত তোমার আমল লিপিবদ্ধকারীরা তোমার কোন হক কি বিনষ্ট করেছে? সে বলবে, হে আমার পরওয়ারদেগার! না, তারা আমার কোন হক্ব বিনষ্ট করেনি। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ আমার নিকট তোমার একটি নেকী আছে, তোমার প্রতি আজ এতটুকু জুলুম করা হবেনা। (এই নেকীর বদলা তোমাকে দেয়া হবে)। এরপর ঐ ব্যক্তির নামে একটি কার্ড বের করা হবে, তাতে লিখিত থাকবে, আশহাদু আন্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু। বান্দা আরজ করবে, হে আমার পরওয়ারদেগার! এই দফতরগুলোর উপস্থিতিতে এই কার্ড দিয়ে কি হবে? আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ তোমার হক্ব বিনষ্ট করা হবেনা। এরপর এক পাল্লায় রাখা হবে আমলের দফতরগুলো, অন্য পাল্লায় রাখা হবে ঐ কার্ডটি, ফলে ঐ পাল্লাটি ভারী হবে, কেননা, আল্লাহ পাকের নামের চেয়ে অধিকতর ওজনদার আর কিছুই নেই।

ইমাম আহমদ (রঃ) এ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

(৩) আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আমল মাত্রকে দেহরূপ দেয়া হবে, তাকে পরিমাপ করা হবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সেই পবিত্র সত্তার শপথ! যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ। যদি আসমান জমীনকে এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু রয়েছে এবং সমগ্র সৃষ্টি জগৎকে মিজানের এক পাল্লায় রাখা হয়, এবং দ্বিতীয় পাল্লায় "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" রাখা হয়, তবে কালেমার সাক্ষ্যের এই পাল্লা ভারি হবে।

এবনে আবদুর রাজ্জাক ইব্রাহীম নখয়ীর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কেয়ামতের দিন কোন মানুষের আমল এক পাল্লায় রাখা হবে, কিন্তু ঐ পাল্লা হালকা হবে, এরপর মেঘমালার ন্যায় একটি জিনিষ ঐ পাল্লাতে রাখা হবে, তখন তা ভারী হয়ে যাবে। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কি জিনিষ তোমার পাল্লায় রাখা হয়েছে, তা কি তুমি জান? সে বলবে, না (আমি অবগতনই)।

তখন বলা হবে, তুমি যে মানুষকে শিক্ষা দিতে, এটি হল সেই এলমের ফজিলত।

আল্লামা জাহাবী (রঃ) হযরত এমরান এবনে হাসীন (রাঃ)–এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন আলেমগণের

লেখার কালি এবং শহীদনের রক্তের ওজন করা হবে, তখন আলেমদের লেখার কালি শহীদানর রক্ত অপেক্ষা ভারী হবে।১

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, মুমিন বান্দার নেক আমল সহ তাকে পাল্লায় রাখা হোক,অথবা তার নেক আমলের দফতর পাল্লায় রাখা হোক যেকোন অবস্থায় তার নেক আমলের পাল্লা ভারী হবে। পক্ষান্তরে,কাফেরকে তার মন্দ আমল সহ অথবা তার মন্দ আমলের দফতর পাল্লায় রাখা হবে কিন্তু মশার পাখার সমান ওজনও তার হবেনা। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ .....

"যার ওজন হালকা হবে তাদের জীবন হবে ক্ষতিগ্রস্ত, ব্যর্থ মনোরথ।"

এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, মুমিনের পাল্লার কিছু না কিছু ওজন হবেই, আর তা কলেমা শাহাদতের কারণেও হতে পারে। এজন্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

যার আমলনামার ওজন ভারী হবে তার জীবন সফলকাম হবে।

মোমেনের নেক আমলের পাল্লার বিভিন্ন স্তর

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মুমিনের নেক আমলের পাল্লা ভারী হলেও তার বিভিন্ন স্তর থাকবে, য়ারা কবীরা গুণাহ থেকে আত্মরক্ষা করবে এবং আল্লাহ পাক তাদের সকল গুণাহ মাফ করে দেবেন, পাল্লায় তাদের ওজন সর্বাধিক হবে আর মন্দ কাজের পাল্লার কোন ওজনই হবেনা।

পক্ষান্তরে, যেসব মুমিনের আমল নামায় ভাল এবং মন্দ উভয় প্রকার আমলই থাকবে তাদের জান্নাতে প্রবেশের যোগ্যতা থাকবে, তাদের সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন হিসেব হবে, গুণাহর চেয়ে একটি নেকীও যদি হিসেবে বেশী হয় তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু যার গুণাহ তার নেকীর চেয়ে বেশী হবে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -২১৬-১৭

তাকে দোযখে যেতে হবে অর্থাৎ গুণাহর ময়লা পবিত্র করার জন্যে তাকে অগ্নিতে ফেলা হবে, যেমন লোহাকে অগ্নিতে ফেলেই পরিচ্ছন্ন করা হয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, সামান্যতম ওজনের কারণেও নেক আমলের পাল্লা হালকা বা ভারী হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যাদের নেক আমল এবং বদ আমল সমান সমান হবে তারা আরাফের (জান্নাত ও নয় দোযখ নয় এমন স্থান) অধিবাসী হবে। আর যখন তাদেরকে আল্লাহ পাক জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন তখন তারা জান্নাতে যাবে।

এবনে আবী হাতেম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর এ কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন তবে তাঁর কথায় কাফেরদের অবস্থার কোন বিবরণ নেই, কেননা কাফেরদের কোন নেকীই নেই। আর পবিত্র কোরআনে নেককার মুমিনদের অথবা কাফেরদের পরিণাম ঘোষিত হয়েছে, গুণাহগার মুমিনদের অবস্থা এখানে উল্লিখিত হয়নি। কেননা যখন পবিত্র কোরআন নাজিল হয় তখন সকলেই নেককার মুমিন ছিলেন, সকলেই পূণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন। তাঁরা সর্বদা কবীরা গুণাহ থেকে আত্মরক্ষা করে চলতেন অথবা তাঁরা গুণাহ থেকে তওবাকারী ছিলেন। আর যারা গুণাহ থেকে তওবা করে তারা বেগুনাহ লোকের ন্যায় বিবেচিত হয়।১

কাফেরদের শোচনীয় পরিণতি

আর যাদের (নেক আমলের) পাল্লা হালকা হবে তারা নিজেদেরই ক্ষতি করেছে, তারা চিরদিনই দোজখে থাকবে অর্থাৎ যাদের নেক আমলের পাল্লা হালকা হবে তাদের নেক আমলের কোন ওজনই থাকবেনা, স্বাভাবিকভাবে তারা কাফেরই হবে।

বায়হাকী হযরত আনাস (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, কেয়ামতের দিন একজন আদম সন্তানকে দুই পাল্লার মধ্যখানে দাড় করানো হবে। আর একজন ফেরেশতা মিজানের উপর নিযুক্ত থাকবে। যদি ঐ ব্যক্তির নেক আমলের পাল্লা ভারী হয় তবে ফেরেশতা উচ্চস্বরে ঘোষণা করবে যা সকলে শ্রবণ করতে পারবে "অমুক ব্যক্তি ভাগ্যবান হয়েছে, এরপর আর কখনো সে ভাগ্যাহত হবেনা"।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -২১৭-১৮

পক্ষান্তরে, যার ওজন হালকা হবে তার সম্পর্কে ঐ ফেরেশতা উচ্চস্বরে ঘোষণা করবে যা সকলেই শ্রবণ করতে পারবে"। অমুক ব্যক্তি ভাগ্যাহত হয়েছে আর কখনও ভাগ্যবান হবে না। আলোচ্য আয়াতের خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ (যার ওজন হালকা হবে) কথাটির তাৎপর্য হল একেবারে ওজন না হওয়া কেননা, যারা কাফের তাদের কোন ওজনই হবে না।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ পর্যায়ে লিখেছেনঃ হয়তো মোমেনদের আমল দু'বার পরিমাপ করা হবে। যদি নেক আমল কম হয়, আর বদ আমল বেশী হয়, তখন তাকে দোজখে প্রবেশ করানো হবে। দোজখের শাস্তির কারণে গুণাহ থেকে পরিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা লাভের পর দ্বিতীয় বার তার আমল পাল্লায় রাখা হবে। তখন তার নেক আমলের পাল্লা ভারী হবে, আর ফেরেস্তা ঘোষণা করবে, অমুক ব্যক্তি ভাগ্যবান হয়েছে, এরপর আর কখনও হতভাগা হবেনা।১

আলোচ্য আয়াতের এ ঘোষণা শুধু কাফেরদের সম্পর্কে করা হয়েছে। কেননা, পরবর্তী আয়াতে কাফেরদের ভয়াবহ পরিণতির কথাই ঘোষণা করা হয়েছে।

কাফেরদের শাস্তির ঘোষণা

فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾
تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ .....

"তারা নিজেদেরই ক্ষতি করেছে এবং তারা দোজখে চিরদিন থাকবে, অগ্নি তাদের মুখমন্ডলকে ঝলসিয়ে দেবে আর তারা থাকবে সেখানে বীভৎস চেহারায়"। অর্থাৎ দূরাত্মা কাফেরদের মুখমন্ডল দোজখের অগ্নি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ঝলসে দেবে।

এখানে উল্লেখ্য, মোমেনের চেহারা দোজখের অগ্নি দগ্ধ করবেনা। হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার উম্মতের কিছুলোক দোজখে যাবে, অগ্নি তাদেরকে জ্বালাবে, কিন্তু তাদের মুখমন্ডলকে ঝলসাবে না। এর কিছু দিন পর তাদেরকে দোজখ থেকে বের করা হবে।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি এরশাদ করেন, দোজখের অগ্নি তাদেরকে পুড়িয়ে এমন অবস্থা করবে যে, তাদের দেহের গোশ্ত তাদের

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -২১৮-২১৯

পায়ে লুটিয়ে পড়বে। আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, তাদের জিহবা বের হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে এবং অন্য দোজখীরা তা পায়ে মাড়াবে।

وَهُمْ فِيهَا كَٰلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

আর তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারায়। অর্থাৎ দোজখের অগ্নি পুড়িয়ে বিকৃত করে ফেলবে তাদের চেহারা। كلوح শব্দটির অর্থ হল উপরের ঠোট উপরের দিকে চলে যাওয়া এবং নিচের ঠোট নিচের দিকে চলে যাওয়া।

তিরমিজি শরীফে সংকলিত হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন যে দোজখের অগ্নি কাফেরদের ভুনে ফেলবে, তার ওপরের ঠোট এত উপরে উঠবে যে মাথার অর্ধেক পর্যন্ত পৌছে যাবে আর নীচের ঠোট নিচের দিকে নেমে যাবে এবং নাভি পর্যন্ত পৌছে যাবে।১

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৮, পৃষ্ঠা-২৭

তফসীরে কবীর, খন্ড- ২৩, পৃষ্ঠা-১২৩

তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৮

তফসীরে রুহুল মা'আনী, খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-৬৮

তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -২১৯

أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾ قَالُوا
رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَا
أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٧﴾ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا
وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٨﴾ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ
رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾
فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ
تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ
الْفَائِزُونَ ﴿١١١﴾

তরজমা

(১০৫) তোমাদের নিকট কি আমার আয়াত সমূহ শোনান হয়নি? তোমরা তো তখন তা মিথ্যাজ্ঞান করতে।

(১০৬) তারা বলবে, হে প্রতিপালক! আমাদের দুর্ভাগ্যই তখন আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল, আর আমরা ছিলাম এক পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়।

(১০৭) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই অগ্নি থেকে উদ্ধার কর, এরপর যদি আমরা পুনরায় সত্য প্রত্যাখ্যান করি, তবে আমরাই অপরাধী।

(১০৮) আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, তোরা হীন অবস্থায় এখানেই পড়ে থাক, আর আমার সাথে কোন কথা বলবেনা।

(১০৯) আমার বান্দাগণের মধ্যে একদল ছিল, যারা বলত হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি অতএব, আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিতো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াময়।

(১১০) কিন্তু তোমরা ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে, এমনকি, তাদের পেছনে পড়ে তোমরা আমার কথা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলে, আর তোমরা তো তাদেরকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতে।

(১১১) আজ আমি তাদেরকে তাদের সবরের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, নিশ্চয় তারাই হলো সফলকাম।

তফসীরুল কোরআন

কাফেরদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করার পর যে ভর্ৎসনা করা হবে, সে সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ আল্লাহ পাক তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, আমার আয়াত সমূহ কি তোমাদের নিকট পাঠ করা হয়নি? আমার কথা কি তোমাদেরকে শোনানো হয়নি? আমি তোমাদের নিকট আমার রসূল প্রেরণ করেছি যারা তোমাদেরকে সত্যের দিকে আহবান করেছে। তোমাদেরকে আমার বাণী শুনিয়েছে, কিন্তু তোমরা তাদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করেছ, যে সত্যকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে আর আমার রসূলগণের বিরোধিতা করতে, আজ সে সত্য প্রত্যক্ষ কর এবং আমার রসূলগণের বিরোধিতার স্বাদ গ্রহণ কর।

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا

তারা বলবে, হে প্রতিপালক। আমাদের দুর্ভাগ্যই আমাদেরকে পেয়ে বসেছে, অর্থাৎ দোজখে পতিত কাফেররা সেদিন স্বীকার করবে যে এটি ছিল আমাদের দুর্ভাগ্য যে দুনিয়াতে আমরা পরিণামদর্শী হইনি, ভবিষ্যত চিন্তা করিনি, দুনিয়ার মোহে মুগ্ধ হয়ে আখেরাতকে ভুলে গেছি, আত্মবিস্মৃত হয়ে আল্লাহর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ রয়েছি। বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করেছি, এজন্যে রসূলগণের আহবানে সাড়া দেইনি, সত্যকে গ্রহণ করিনি।

رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَٰلِمُونَ ﴿١٠٧﴾

হে পরওয়ারদেগার। অতীতে যা হয়েছে, আমরা ভুল করেছি, আমরা অন্যায় করেছি, আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং দোজখের শাস্তি থেকে আমাদেরকে উদ্ধার কর, আমাদেরকে আরেকটিবার অন্ততঃ পৃথিবীতে ফিরে যেতে দাও। যদি পুনরায় আমরা সত্যকে গ্রহণ না করি, তবে আমরা অবশ্যই অপরাধী সাব্যস্ত হবো, তখন তোমার যা ইচ্ছা আমাদেরকে শাস্তি দিও।

قَالَ اخْسَـُٔوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٨﴾

আল্লাহ পাক তখন এরশাদ করবেন, তোমরা দোজখেই হীন এবং অভিশপ্ত অবস্থায় পড়ে থাক, আর খবরদার। কোন কথা বলবেনা।

কাফেরদের এ আর্জির উত্তরে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ঘোষণা করা হবে, তোমাদের কৃতকর্মের পরিণামে তোমরা হীন অবস্থায় পড়ে থাকো, দুনিয়ার জীবনে যখন তোমাদেরকে এ জীবন সম্বন্ধে সাবধান করা হয়েছিল তখন তোমরা সাবধান হওনি, এ জীবনের জন্যে সম্বল সংগ্রহ করনি, অতএব আজ তোমাদের কোন কথা বলার অধিকার নেই, তোমরা কোন কথা বলবেনা।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেনঃ إِخْسَئُوْا শব্দটির অর্থ হল অবমাননাকর অবস্থায় চুপ থাক, দূর হও। আরবী ভাষার বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ কামুসে

خسأ الكلب

অর্থাৎ কুকুর দূর হয়ে গেছে বলা হয়।

وَلَا تُكَلِّمُوْنِ

আমার সাথে কোন কথা বলবেনা। অর্থাৎ আযাব থেকে উদ্ধার করার কোন কথা বলবেনা। কেননা, আযাব দূর করা হবেনা, তোমাদেরকে আযাব থেকে নাজাত দেয়া হবেনা। এ কথার পর দোজখীরা সম্পূর্ণ ভাবে নিরাশ হয়ে যাবে। হযরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেছেন, এটি হবে দোজখীদের শেষ কথা। এরপর আর তারা কথা বলতে পারবেনা, কুকুরের ন্যায় চিৎকার করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারবেনা, নিজের কথা আর বলতে পারবেনা।

ইমাম কুরতবী (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে ঘোষণা রয়েছে, তা শ্রবণের পর দোজখীরা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যাবে এবং একে অন্যের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করতে থাকবে এবং উপর থেকে দোজখকে বন্ধ করে দেয়া হবে।

তেবরানী, এবনে আবি হাতেম, হাকেম এবং বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, দোজখীরা দোজখের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেস্তা মালেককে বলবে, তোমার প্রতিপালক যদি আমাদের একবারে শেষ করে দিতেন, তবে কত ভাল হত। মালেক চল্লিশ বছর যাবত একথার কোন জবাব দিবেনা, চল্লিশ বছর পর মালেক বলবেঃ

إِنَّكُمْ مَّاكِثُوْنَ

তোমাদেরকে দোজখেই চিরদিন থাকতে হবে। তখন তারা নিজেদের প্রতিপালককে ডাক দিয়ে বলবে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে রয়েছে।

رَبَّنَا

অর্থাৎ হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে দোজখের আযাব থেকে উদ্ধার কর। আল্লাহ পাক দুনিয়ার সময়ের দ্বিগুণ সময় পর্যন্ত কোন জবাবই দেবেন না, এ সময় অতিবাহিত হলে বলবেন,

اِخْسَئُوْا

তখন তারা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যাবে। তারা আর কোন ক˝ও বলতে পারবেনা, তাদের বাকশক্তি হরণ করা হবে।

সায়ীদ এবনে মনসুর এবং বায়হাকী মোহাম্মদ এবনে কাবের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে দোযখীরা পাঁচবার ফরিয়াদ করবে, চারবার ফরিয়াদের পর আল্লাহ পাক এই জবাব দেবেন, যা আলোচ্য আয়াতে রয়েছে।

পঞ্চমবার ফরিয়াদের পর তারা আর কথা বলতে পারবেনা।১

তাই এরশাদ হয়েছেঃ

حَتّٰٓى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِىْ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ ﴿۱۱۰﴾

অর্থাৎ তোমরা মোমেন বান্দাদেরকে উপহাস করায় এমনিভাবে লিপ্ত হয়েছিলে যে, তোমরা আমাকেও ভুলে গিয়েছিলে। আর তাদেরকে তো তোমরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করছিলেই।

এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় মানুষ যখন পাপাচারে লিপ্ত হয়, তখন সে আল্লাহ পাককে ভুলে যায়। আর যখন আল্লাহ পাককে ভুলে যায়, তখন সে আত্মবিস্মৃতও হয়। আর এমন অবস্থায় সে নিজের পায়েই কুঠারাঘাত করে, নিজেই নিজের ধ্বংস ডেকে আনে। অতএব, আল্লাহ পাককে ভুলে যাওয়া সমূহ ক্ষতির কারণ হয়। এজন্যেই সূরায়ে হাশরে আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে বিশেষভাবে সতর্ক করেছেন।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -২২০-২১

তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৮

আর তোমরা তাদের মত হয়োনা, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে তাই আল্লাহ পাক তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। আর তারাই পাপাচারী। দ্বিতীয়তঃ কাফেরদেরকে সেদিন ভর্ৎসনা করা হবে এজন্যে যে, তারা মোমেনদেরকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করত, এ কারণে যে মোমেনগণ আল্লাহ পাকের দরবারে মাগফেরাত কামনা করত।

কাফেররা নিজেরা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনতনা। দ্বিতীয়তঃ পরকালীন জিন্দেগীর জন্যে সম্বল সংগ্রহ করতনা।

তৃতীয়তঃ মোমেনগণ যখন দরবারে এলাহীতে কান্নাকাটি করত, তখন এ দূরাত্মা কাফেররা তাঁদেরকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করত। তাই তাদের জন্যে কঠিন কঠোর শাস্তি অবধারিত।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে দারিদ্র-প্রপীড়িত সাহাবায়ে কেরামের প্রতি যেমন হযরত বেলাল (রাঃ), হযরত আম্মার (রাঃ), হযরত সোহায়েব (রাঃ) হযরত সালমান (রাঃ) প্রমুখ। মক্কার কাফের আবুজেহেল, ওতবা, উবাইগং তাদেরকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করত, তাই পরবর্তী আয়াতে তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।[১]

উপহাসকারীদের শাস্তি

লক্ষনীয় বিষয় এই, শুধু যে বর্বরতার যুগে কাফেররা মোমেনদেরকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করত তাই নয়; বরং এ যুগে অনেক আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কেতাদুরস্ত মুসলমান নামধারী ইসলাম বিদ্বেষী লোকেরা দ্বীনদার মুসলমানদেরকে বিদ্রুপ করে থাকে, এমনকি, কোন কোন ইসলামী বিধানের বিদ্রুপ করতেও তারা কুণ্ঠিত হয়না।

আলোচ্য আয়াতে তাদের কঠিন শাস্তির কথাই ঘোষণা করা হয়েছে। ইসলামের কোন বিধানের উপরে কোন কারণে আমল না করা হলে তার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী হবার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু যারা ইসলামী বিধানকে বিদ্রুপ করে, তারা এভাবে অমার্জনীয় অপরাধ করে আবু জেহেল, আবু লাহাবদের ন্যায়। এ অন্যায়কারীদের শাস্তি নিশ্চিত। আলোচ্য আয়াতে এ শাস্তির ঘোষণাই রয়েছে।[২]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -২২২

তফসীরে কবীর, খন্ড- ২৩, পৃষ্ঠা-১২৪

২। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা -৭০৯

তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৯০

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿١١١﴾

আমি আজ তাদেরকে তাদের সবরের শুভ পরিণতি দান করেছি। তাই তারা হয়েছে সফলকাম।

অর্থাৎ কাফেররা মোমেনদেরকে সত্য গ্রহণের জন্যে যে বিদ্রুপ করত, এবং মোমেনগণ তাদের ঠাট্টা বিদ্রূপের উপর সবর অবলম্বন করত, তারই শুভ পরিণতি হল পরকালীন জিন্দেগীর চিরস্থায়ী সাফল্য।

এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের কয়েকটি দিন যদি ঈমান ও নেক আমলের গুণ অর্জন করা যায়, শয়তানের প্রতারণা ও কুপ্রবৃত্তির তাড়না থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। আল্লাহ পাকের অনুগত ও কৃতজ্ঞ থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা যায় তবে চিরস্থায়ী সাফল্য অর্জন করা যায়, চিরদিন জান্নাতের সুখভোগ করা যায়।

قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾
قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ ﴿١١٣﴾
قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾
فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ
بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾
وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٨﴾

তরজমা

(১১২) আল্লাহ পাক বলবেন, তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে?

(১১৩) তারা বলবে, আমরা মাত্র একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি, আপনি গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করুন।

(১১৪) আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, তোমরা তাতে অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা তা জানতে।

(১১৫) তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে পুনরায় আমার নিকট ফিরে আসতে হবেনা?

(১১৬) মহিমান্বিত আল্লাহ পাক, তিনিই প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তিনিই মহান আরশের অধিপতি।

(১১৭) যে কেউ আল্লাহ পাকের সাথে অন্য কিছুকে মাবুদ বলে ডাকে, তার নিকট যার কোন দলীল প্রমাণ নেই, তার হিসাব তার প্রতিপালকের নিকটই আছে, নিশ্চয়ই কাফেররা কখনও সফলকাম হবেনা।

(১১৮) হে রসূল! আপনি বলুন, হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা কর এবং রহম কর, তুমি যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াময়।

তফসীরুল কোরআন

কেয়ামতের দিন কাফেরদেরকে তিরস্কার করে আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করবেন, তোমরা পৃথিবীতে কতদিন অবস্থান করেছিলে বলো, তোমরাতো পৃথিবীর জীবনকে চিরস্থায়ী মনে করতে, যারা পৃথিবীর জীবনকে ক্ষণস্থায়ী বলে বিশ্বাস করতো এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে নেক আমল করতে বলতো, তোমরা তাদেরকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে, কাফেররা বলবে, আমাদের পৃথিবীতে অবস্থান খুব বেশী নয়; বড় জোর একদিন মাত্র বা তার চেয়েও কম। তবে যারা সেদিন আমাদের দিন রাতের হিসাব রাখতো, সেই ফেরেশতাদেরকেই জিজ্ঞাসা করুন, তারাই সঠিক হিসাব বলতে পারবে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, পরকালীন জিন্দেগীর অনুপাতে পৃথিবীতে এবং কবরে মানুষের অবস্থানকাল যে অতি অল্প সময়, একথা কেয়ামতের দিন প্রত্যেকেই উপলব্ধি করবে, এ সত্য প্রকাশ করার লক্ষ্যেই আলোচ্য আয়াতের এ প্রশ্নোত্তরের অবতারণা।

দ্বিতীয়তঃ যে কাফেররা তাদের আযাবের জন্যে তাড়াহুড়া করছিল, তাদেরকেও এ সত্য বুঝানো হয়েছে যে, আযাব নাজিল হতে বিলম্ব হয়না, কেননা দুনিয়ার জীবন অতি সামান্য। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, কাফেররা দুনিয়ার জীবনকে এত অল্প কেন মনে করবে?

তফসীরকারগণ এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, দুঃখ কষ্টের সময়কে সাধারণতঃ মানুষ অতি দীর্ঘ মনে করে আর আনন্দের সময় কেটে যায় অতি দ্রুত।

কেয়ামতের কঠিন দিনের মহাবিপদ দেখার পর স্বাভাবিক ভাবেই তারা দুনিয়ার জীবনকে নগন্য মনে করবে।

দ্বিতীয়তঃ দুনিয়ার জীবন অতীতের গর্ভে বিলীন হয়েছে, আর সাধারণতঃ অতীতকে ক্ষুদ্রই মনে করা হয়।

তৃতীয়তঃ যেহেতু পরকালীন জিন্দেগী অনন্ত অসীম, তাই দুনিয়ার জীবন সেই অনুপাতে যে অতি সামান্য তা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট।

فَسْـَٔلِ الْعَآدِّيْنَ ﴿١١٣﴾

আপনি গণনাকারীদের জিজ্ঞাসা করুন। এর দু'টি অর্থ হতে পারে।

(এক) যে ফেরেস্তাগণ মানুষের আমল লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন।

(দুই) কাফেররা কেয়ামতের ময়দানের কঠিন বিপদের সম্মুখীন হবে, এমন অবস্থায় দুনিয়ার জীবনের হিসাব গণনা তাদের পক্ষে অকল্পনীয়। তাই তারা বলেছে, যারা দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে হিসাব দিতে পারে, এমন লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করুন।

قٰلَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١١٤﴾

আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ তোমরা দুনিয়াতে সামান্য সময়ই অবস্থান করেছো, কিন্তু কত ভাল হতো যদি তোমরা এ সত্য দুনিয়াতেই উপলব্ধি করতে।

আলোচ্য আয়াতের قَلِيْلًا শব্দটির ব্যাখ্যায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আখেরাতের অনুপাতে দুনিয়ার জীবনের অবস্থা হলো এরূপ; যেমন কোন ব্যক্তি সমুদ্রে তার অঙ্গুলি সামান্য ডুবিয়ে বের করে আনে, এরপর সে দেখুক, সমুদ্রের পানির অনুপাতে তার অঙ্গুলি কতখানি পানি নিয়ে এসেছে।

(আহমদ, ইবনে মাজা, মুসলিম)

আলোচ্য আয়াতের لو انكم শব্দটি তাৎপর্যবহ। এতে একদিকে রয়েছে আকাংখা যদি তোমরা এ সত্য দুনিয়াতেই উপলব্ধি করতে। আর এরই মধ্যে রয়েছে ভর্ৎসনা এবং তিরস্কারের ভাব অর্থাৎ হায় আক্ষেপ। যদি তোমরা দুনিয়াতেই এ সত্য উপলব্ধি করতেঃ যে দুনিয়ার জীবন অতি সামান্য, একান্তই ক্ষণস্থায়ী। আর এ কারণে দুনিয়ার জীবনকে খেলা-ধুলায়, আনন্দ উল্লাসে অতিবাহিত না করতে এবং আজকের দিনের তথা কেয়ামতের দিনের কথা ভুলে না যেতে তবে কত ভাল হত। হযরত

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দুনিয়াতে এভাবে থাক, যেমন পথিক মুসাফির।১

(বোখারী শরীফ)

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا

তবে কি তোমরা এ ধারণা করেছো যে আমি তোমাদেরকে অহেতুক সৃষ্টি করেছি, আর তোমাদেরকে আমার নিকট ফিরে আসতে হবে না?

এ আয়াত সমূহে সর্তকবাণী উচ্চারিত হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে যারা আখেরাত সম্পর্কে গাফলতের আবর্তে নিপতিত থাকে, যাদের ভ্রান্ত ধারণা হলো এই যে, মৃত্যুর পর আর পুনরুজ্জীবন হবেনা, জীবনের কৃতকর্মের হিসাব নিকাশ দিতে হবেনা। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

তোমরা কি এই ধারণা করেছো যে, অহেতুক আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, না, তা নয়, বরং মানব জীবনের একটি বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। যারা জীবনের কৃতকর্ম দ্বারা অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌছতে পারে তাদের জীবন সাধণাই হয় স্বার্থক। পক্ষান্তরে, যারা জীবনের উদ্দেশ্যকে সফল করেনা, তাদের জীবন-সাধনা হয় ব্যর্থ। মানুষের জীবনের সাধনার উদ্দেশ্য হলো জীবনের মালিক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ। যারা আল্লাহ পাকের বিধান মোতাবেক জীবন যাপন করে তাঁর বন্দেগীর মাধ্যমে জীবনের এ মহান উদ্দেশ্য সফল করে, শুধু তাদের জীবনই সুন্দর, স্বার্থক হয়। তারাই লাভ করবে পরকালীন জিন্দেগীর পুরস্কার। আর যারা নিজের ভাবাবেগে চলে, নিজের খেয়ালখুশি মতো কাজ করে আল্লাহ পাকের বিধানকে উপেক্ষা করে এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানীতে লিপ্ত থাকে তাদের শাস্তি অবধারিত। এ পুরস্কার ও শাস্তির ফায়সালা হবে কেয়ামতের কঠিন দিনে। এজন্যে প্রত্যেককে হাশরের ময়দানে হাজির করা হবে এবং প্রত্যেকের জীবন-সাধনার বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত শ্বেতপত্র বা আমলনামা তার হাতে দেয়া হবে। নেককার হলে ডান হাতে পাবে তার আমলনামা, আর বদকার হলে বাম হাতে দেয়া হবে আমলনামা। যদি ভালমন্দের বিচারই না হলো তবে মানুষের সৃষ্টি এবং জীবন এক নিষ্ঠুর প্রহসনে পরিণত হয় আর মহান আল্লাহ পাক এর থেকে অনেক উর্ধ্বে, তিনি উদ্দেশ্যবিহীন কাজ করেননা।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -২২৩-২৪

পবিত্র কোরআনের বর্ণনা শৈলীর বৈশিষ্ট্য

এই সূরার প্রথম বাক্যটি ছিল

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ

অর্থাৎ মোমেনগণ অবশ্যই সফলকাম হয়েছে। এতে মোমেনগণের সাফল্যের সুসংবাদ রয়েছে। আর সূরার শেষ পর্যায়ে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿١١٧﴾

অর্থাৎ কাফেররা নিশ্চয়ই সফল হবেনা। কাফেরদের ব্যর্থতার এবং বঞ্চিত হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে এ আয়াতে এবং এরপর এরশাদ হয়েছেঃ

وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١١٨﴾

আর (হে রসূল!) আপনি বলুন, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি দয়া কর, আর তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

এ আয়াত দ্বারা ইংগিত করা হয়েছে যে, জীবন সাধনার সাফল্য নির্ভর করে আল্লাহ পাকের রহমতের উপর এবং তাঁর মাগফেরাতের উপর। এতে মানব জাতির জন্যে এ শিক্ষা রয়েছে যে যদি জীবনের সাফল্য পেতে চাও তবে তওবা এস্তেগফারের পথ অবলম্বন কর। কেননা, মানুষ মাত্রেরই ভুল ভ্রান্তি রয়েছে। পদে পদে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় গুণাহর কাজ হয়েই যায়। আর এজন্যেই আদেশ হয়েছে তওবা এস্তেগফার কর, ক্ষমাপ্রার্থী হও। তাহলে আল্লাহ পাক ক্ষমা করবেন এবং তোমাকে তাঁর রহমতের ছায়ায় স্থান দিবেন। এভাবেই তোমার জীবন-সংগ্রাম হবে সাফল্য মন্ডিত। এই সূরার মূল বক্তব্য হল, কাফেরদের ব্যর্থতার ঘোষণা এবং মোমেনদের সাফল্য লাভের পথ-নির্দেশনা। এটি পবিত্র কোরআনের বর্ণনা শৈলীর একটি বৈশিষ্ট্য।

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ﴿١١٦﴾

মহিমান্বিত আল্লাহ পাক, যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই তিনিই মহান আরশের অধিপতি। বস্তুত ত্রিভুবনের সর্বত্র আল্লাহ পাকের রাজত্ব, আধিপত্য, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। সমগ্র সৃষ্টিজগৎ তাঁর অনুগত। অতএব

তিনি এই সৃষ্টি জগৎকে উদ্দেশ্য বিহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। এজন্যেই বুদ্ধিমান মাত্রই একথা বলেঃ

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا

"হে আমাদের পরওয়ারদেগার। তুমি অযথা সৃষ্টি করনি এ বিশ্বজগতকে"। নেককার বদকার সকলেরই তোমার দরবারে হাজির হতে হবে, উভয়েরই বিচার হবে অবশ্যই তোমার দরবারে। এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। আল্লাহ পাকই সবার উপরে, তাঁর অনুগত বান্দাদের পুরস্কার প্রদান করা এবং তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ বান্দাদের শাস্তি বিধান করা তাঁর পূর্বঘোষিত চিরন্তন নীতি। এই নীতির বরখেলাপ হবে না কখনো। তিনি মহান আরশের মালিক, আর যিনি আরশের মালিক তাঁর ক্ষমতা এবং আধিপত্য সর্বত্র বিরাজমান।

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ

অতএব, যে কেউ আল্লাহ পাকের সাথে অন্য কোন মাবুদকে ডাকবে, যার কোন দলীল তার নিকট নাই, তিনি অবশ্যই তার হিসাব বুঝে নেবেন। মুশরিক বা পৌত্তলিক কখনো আল্লাহ পাকের শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না তাই কাফেররা কখনো সাফল্যমন্ডিত হবে না। তারা জীবন-সংগ্রামে শুধু ব্যর্থই হবেনা, বরং তাদের যাবতীয় অপকর্মের কঠিন কঠোর শাস্তি ভোগ করবে।

وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ

পূর্ববর্তী আয়াতে অবাধ্য দুরাত্মা কাফেরদের ব্যর্থতার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে জীবন-সাধনার সাফল্যের পথ নিদের্শনা দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে "হে রসূল আপনি বলুন, হে আমার পরওয়ারদেগার, আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি দয়া কর। আমার যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে আমাকে তোমার অনন্ত অসীম রহমতের কোলে আশ্রয় দাও, কেননা তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু, তুমি ক্ষমা করা পছন্দ কর তাই আমাকেও ক্ষমা কর, তুমি অনন্ত অসীম দয়াময়, অতএব আমার প্রতিও দয়া কর।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, যদিও এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধোন করা হয়েছে তবে এর দ্বারা সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে শিক্ষা দেয়াই উদ্দেশ্য, যেন সকলেই আল্লাহ পাকের দরবারে নিজ নিজ গুণাহর জন্যে ক্ষমা প্রার্থী হয়, তওবা এস্তেগফার করে কেননা, তওবা এস্তেগফারের মাধ্যমেই চির সাফল্য অর্জিত হয়।

এ আয়াত সমূহের ফজিলত

افحسبتم থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত এই আয়াত সমূহের বহু ফজিলত হাদীস শরীফে রয়েছে। বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জেহাদের জন্যে সাহাবায়ে কেরামের একটি ছোট দল প্রেরণ করেন আর এ আদেশ দেন তোমরা সকাল সন্ধ্যায় এ আয়াত সমূহ পাঠ করবে, সাহাবায়ে কেরাম বর্ণনা করেন, আমরা নির্দেশ মোতাবেক এ আয়াত সমূহ পাঠ করতে থাকি ফলে, আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে ফিরে আসি। এক ব্যক্তির কানে অত্যন্ত কষ্ট ছিল, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এ আয়াত সমূহ পাঠ করে তার কানে ফুঁ দিয়েছিলেন তখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। এ কথা জানতে পেরে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ শপথ সেই পবিত্র সত্তার, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, যদি কেউ পূর্ণ একীন নিয়ে এই আয়াত সমূহ পাহাড়ের উপর পাঠ করে তবে পাহাড় তার স্থান থেকে সরে যাবে।১

আলহামদুলিল্লাহ, অদ্য ১লা রবিউল আউয়াল ১৪১৪ হিজরী মোতাবেক ১৯শে আগষ্ট ১৯৯৩ রোজ বৃহস্পতিবার দিন গত রাত সময়ঃ ১১টা ৫৫ মিনিটে সূরায়ে মোমিনূনের তফসীর সমাপ্ত হলো। হে আল্লাহ! কবুল কর এই সাধনা, হে আল্লাহ! তফসীরে নূরুল কোরআনকে সম্পূর্ণ করার তওফিক দান কর। হে আল্লাহ! যাঁরা জীবন সাধনায় সাফল্য মন্ডিত হয়েছেন, তোমার রহমত লাভে ধন্য হয়েছেন আমাদেরকে তাঁদের অন্তর্ভূক্ত কর, আমীন। ইয়া আরহামার রাহিমীন।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৯১-৯২
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৮, পৃষ্ঠা-৩০
তফসীরে রুহুল মা'আনী, খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-৬৫
তফসীরে কুরতবী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১৫৭
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -২২৫
তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরায়ে নূর, মদীনায় অবতীর্ণ, আয়াতঃ ৬৪, রুকুঃ ৯

সূরায়ে নূর প্রসঙ্গে–

এ সূরায় আল্লাহ পাকের বিধি–নিষেধ, শাসন–শৃংখলা এবং তৌহিদের বিবরণ স্থান পেয়েছে। চরিত্রের পবিত্রতা অর্জন এবং নৈতিক মান উন্নয়নের উপর এ সূরায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

এ সূরা সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ) কুফাবাসীর নামে একটি ফরমান জারী করেছিলেন।

علموا نساءكم سورة النور

তোমাদের স্ত্রী লোকদেরকে সূরায়ে নূর শিক্ষা দাও, যাতে করে তারা অবহিত হয় যে, চরিত্রের পবিত্রতাই হলো নূর এবং চরিত্রের অপবিত্রতা হলো অন্ধকার।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলতেন, স্ত্রীলোকদেরকে উঁচু ইমারতে অবস্থান করাবেনা, তাদেরকে লেখা শিক্ষা দেবেনা, তাদেরকে সূরায়ে নূর শেখাবে এবং তাদেরকে চরকায় সূতো কাটা শিক্ষা দেবে।১

সায়ীদ এবনে মনসুর, এবনুল মুনজের, বায়হাকী মুজাহেদ (রঃ)–এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের পুরুষদেরকে সূরায়ে মায়েদা শেখাও আর তোমাদের স্ত্রী লোকদেরকে সুরায়ে নূর শেখাও।

হারেসা এবনে মেজরাব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রী লোকদেরকে সূরায়ে নেছা, সূরায়ে আহযাব এবং সূরায়ে নূর শেখাও।২

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত–আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–৯৩
তফসীরে কুরতবী, খন্ড–১২, পৃষ্ঠা–১৫৮

২। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–২২
তফসীরে রুহুল মা'আনী, খন্ড–১৮, পৃষ্ঠা–৭৪

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরা মুমেনুন এর প্রারম্ভে মোমেনগণের গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে একটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছিল যে, মোমেনগণের নৈতিক মান উন্নীত থাকে, তারা চরিত্র মাধুর্যের অধিকারী হয়, কখনো তারা অন্যায় অসৎ ও অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়না, ব্যাভিচারের ন্যায় ঘৃন্য, নিন্দনীয় অসামাজিক কাজ থেকে তারা থাকে অনেক দূরে আর এমনি গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার কারণেই তারা হয় জান্নাতুল ফেরাদৌসের উত্তরাধিকারী। আর এ সূরার প্রারম্ভে সে সব লোকদের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে যারা চারিত্রিক দুর্বলতার পরিচয় দেয়, যারা ব্যাভিতারে লিপ্ত হয়ে মানবতার অবমাননা করে, যারা এ পর্যায়ে সীমালংঘন করে। যারা এমনি অন্যায় অনাচারে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তর থেকে নূর দূরীভূত হয়ে যায়। আর যারা অনাচার, ব্যাভিচার থেকে আত্মরক্ষা করে, তাদের অন্তরে নূর সৃষ্টি হয়। তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন, ঐ নূরই কাল কেয়ামতের কঠিন দিনে পুলসেরাত পার হওয়ার ব্যাপারে সহায়ক হবে। এজন্যে হাদীস শরীফে একথার উল্লেখ রয়েছে যে, পুলসেরাতে পৌছার পর মুনাফেকদের নুর বিদায় নেবে, তারা আর পুলসেরাতের পথ দেখবেনা এজন্যে মোমেনগণ ভীত সন্ত্রস্ত হবে যে মোনাফেকদের ন্যায় মোমেনদের নূরও দূরীভূত না হয়। এ কারণেই মোমেনগণ আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের নূরকে পরিপূর্ণ করার জন্যে মোনাজাত করে বলে, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

হে আমাদের পরওয়ারদেগার। আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দিও এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর, নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আর এই নূর কোথায় পাওয়া যায় একথার জবাবও রয়েছে আলোচ্য সূরায়, অর্থাৎ মসজিদ সমূহে, আল্লাহর জিকরের মাধ্যমে তথা তাঁর বন্দেগীর মাধ্যমে।

পক্ষান্তরে, অন্ধকার সৃষ্টি হয় অন্যায় অনাচার ও ব্যাভিচার এবং জুলুম অত্যাচারের মাধ্যমে। আর এ নুর হলো হেদায়েতের নূর। এ নূরের প্রানকেন্দ্র হলেন স্বয়ং আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন, তাই পরবর্তী আয়তে এরশাদ হয়েছেঃ

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

আর আল্লাহ পাকই আসমান জমীনের নূর।

অতএব, মোমেনগণের নেক আমল হলো নূরানী এবং তার দ্বারা মোমেনের কলব খেকে নূর বিচ্ছুরিত হয় এবং অন্য মানুষের অন্তরও আলোকিত হয়। অন্যদিকে

যারা অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয়, তাদের থেকে গোমরাহীর অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে। যারা এ জীবনে সিরাতুল মুস্তাকীম বা সরল সঠিক পথে চলে, তারাই কাল কেয়ামতের দিন অতি সহজে পুলসেরাত পার হবে। পক্ষান্তরে, যারা এ জীবনে অন্যায় অনাচারে, ব্যাভিচারে লিপ্ত হবে, তারা গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকবে। তারা কাল কেয়ামতের কঠিন দিনে পুলসেরাত পার হতে পারবেনা। যদি তওবা করে ক্ষমা লাভ করতে না পারে, তবে তাদের জীবন হবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত। এজন্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ

আর যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের অনুগত হয় এবং আল্লাহ পাককে ভয় করে, পরহেজগারী অবলম্বন করে, তারাই হবে (জীবন-সাধনায়) সফলকাম।

আলোচ্য সূরার মূল বক্তব্য

সর্বপ্রথম এ সূরার গুরুত্ব অনুধাবনের ও উপদেশ গ্রহণের তাগিদ করা হয়েছে। এরপর ব্যাভিচারের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর ব্যাভিচারের অপবাদের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে মোমেন জননী হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নামে যে সব মোনাফেকরা অপবাদ দিয়েছিল, তাদের শাস্তির ঘোষণা করা হয়েছে। অবশেষে তৌহিদের বিবরণ ও আখেরাতের স্মরণের তাগিদ করে সূরা শেষ করা হয়েছে।

سُوْرَةُ النُّوْرِ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ اَرْبَعٌ وَّسِتُّوْنَ اٰيَةً وَّتِسْعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُوْنَ ١ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ
مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ٢ اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً
وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِيْنَ ٣

তরজমা

(১) এই একটি সূরা যা আমি নাজিল করেছি এবং এর বিধানকে অবশ্য পালনীয় করেছি, এতে আমি নাজিল করেছি সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ, যাতে করে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

(২) ব্যাভিচারী নারী পুরুষ, উভয়ের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত কর, যদি তোমরা আল্লাহ পাক এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখ তবে তাদের উপর আল্লাহ পাকের বিধান পালনে কোন প্রকার দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে। আর তাদের এই (দৃষ্টান্তমূলক) শাস্তি যেন মোমেনদের একটি দল অবশ্য দেখতে পায়।

(৩) ব্যাভিচারী পুরুষ, ব্যাভিচারী নারী অথবা মুশরেক নারী ব্যতীত বিয়ে করবেনা এবং ব্যাভিচারিনীকে ব্যাভিচারী অথবা মুশরেক ব্যতীত কেউ বিয়ে করবেনা। মোমেনদের জন্যে তা হারাম করা হয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا

এই একটি সূরা যা আমি নাজিল করেছি এবং প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আমি যে বিধান প্রবর্তন করেছি, তার উপর আমল করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য।

কোরআনে করীমের প্রত্যেকটি সূরাই আল্লাহ পাক নাজিল করেছেন, এতদসত্ত্বেও "এ সূরা আমি নাজিল করেছি"-একথা বলার তাৎপর্য হলো এ সূরার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা। কেননা, এ সূরায় মানবতার কল্যাণে, মানুষের নৈতিক মান উন্নয়নে কয়েকটি জরুরী বিধান জারী করা হয়েছে। মানবতার উৎকর্ষ সাধনে এই বিধান সমূহের বাস্তবায়ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এজন্যেই বর্ণনার এ ভঙ্গী গ্রহণ করা হয়েছে।

وَفَرَضْنٰهَا

অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে যে বিধি-নিষেধ আমি প্রবর্তন করেছি।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো যে বিধান আমি বিস্তারিত ভাবে, সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছি। আর কোন কোন তফসীরকার এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, فرضناها অর্থ হলো قدرناها অর্থাৎ এ সূরায় আমি বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি নির্দিষ্ট করেছি।

ইমাম তাবারী (রঃ) লিখেছেনঃ আবি নাজিহ তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, فرضناها শব্দটির তাৎপর্য হলো, হালালের নির্দেশ প্রদান এবং হারামের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ।

ইমাম তাবারী (রঃ) আরো লিখেছেনঃ আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের জন্যে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন, বান্দার করণীয় কাজ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন আর তা দু' প্রকার। আদেশ বা নিষেধ। অতএব, আদেশ পালন করা এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা বান্দা মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।১

এসব বিধান আমি নাজিল করেছি অতএব, এই বিধান পালনে কোন প্রকার গাফলত করবেনা।

১। তফসীরে তাবারী, খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-৫১-৫২

وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيٰتٍ

আর এতে আমি অনেক সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ নাজিল করেছি, হয়তো তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে, আর এ সত্য উপলব্ধি করবে যে, মন্দ, ঘৃণ্য ও অশ্লীল কাজের পরিণতিতে মানব মনের নূর দূরীভূত হয়, আর একথা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে প্রবৃত্তির পবিত্রতা ঐ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতীত অর্জিত হয় না, যা এ সূরায় নির্দেশ করা হয়েছে। আল্লাহ পাক এ সূরাকে মানব সভ্যতার বিকাশ, উন্মেষ এবং সংরক্ষণের জন্যে একটি মূল নীতি রূপে উপস্থিত করেছেন।

মানবতার জন্যে অত্যন্ত অপমানজনক কাজ হল ব্যাভিচার আর তা পরিহার করার জন্যে বিশেষ নির্দেশ রয়েছে এ সূরায় এবং এ অসামাজিক কাজ বন্ধ করার নিমিত্তে শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর যে সব কারণে এ অন্যায় কাজ হয়, সে সব উপকরণ দূরীভূত করারও নির্দেশ রয়েছে, যেমন পর্দা প্রথা প্রবর্তন করা হয়েছে কেননা, পর্দাহীনতা ঘৃন্য কাজের সহায়ক হয়। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, আজকের দুনিয়ায় যে অশান্তি বিরাজমান, তার অন্যতম কারণ হলো পর্দাহীনতা কেননা, পর্দাহীনতা অশ্লীলতার পথ প্রশস্ত করে, আর অশ্লীলতা অশান্তির অবশ্যম্ভাবী কারণ হয়, ব্যক্তি জীবনকে কলুষিত করে, সমাজ ও জাতীয় জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ①

"হয়ত তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে" অর্থাৎ এই সূরায় যে বিধি-নিষেধ বর্ণিত হয়েছে, ব্যাভিচার সহ অন্যান্য অপরাধের যে শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে তা বাস্তবায়নে তোমরা যত্নবান হবে, কোন অবস্থাতেই এ সম্পর্কে গাফলত করবেনা, কেননা দুনিয়ার শাস্তি আপাতঃ দৃষ্টিতে যত কঠিনই মনে হোকনা কেন, তা আখেরাতের শাস্তি থেকে অনেক সহজ।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক মানব জাতির সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যেই যাবতীয় আইন কানুন ঘোষণা করেছেন। অতএব জীবন-সাধনার সাফল্যের জন্যে এ আইন কানুন মেনে চলা পূর্বশর্ত। মন্দ ও ঘৃন্য কাজের পরিণতি নিঃসন্দেহে মন্দই হয় আর তা শুধু মন্দই নয়; বরং বিপজ্জনকও হয়ে থাকে।

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

ব্যাভিচারী নারী পুরুষ উভয়ের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত কর।

ব্যাভিচারের শাস্তি

আলোচ্য আয়াতে ব্যাভিচারের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে। স্বাধীন সুস্থ বুদ্ধি সাবালক অবিবাহিত নারী পুরুষ যদি ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তাদের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত কর।

"বেত্রাঘাত কর" فَاجْلِدُوْا

এই শব্দটি جلد থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ চামড়া। এর দ্বারা ইংগিত করা হয়েছে যে বেত্রাঘাত হবে চামড়ার উপর, গোশতের উপর নয়।

আবদুর রাজ্জাক ইয়াহইয়া এবনে আবি কাসীরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলো ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার দ্বারা এমনি একটি অপরাধ হয়েছে যা শাস্তির যোগ্য, এজন্যে আমার প্রতি শরীয়ত মোতাবেক শাস্তির ব্যবস্থা করুন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি বেত্রদন্ড আনয়নের নির্দেশ দিলেন, হুকুম তামিল করা হল, কিন্তু যে বেত্রদণ্ডটি আনা হল তা ছিল অত্যন্ত শক্ত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাই এরশাদ করলেন, এমন বেত্রদন্ড আন যা এত শক্ত না হয়। এরপর আরেকটি বেত্রদন্ড পেশ করা হল যা একটু ভাঙ্গা ছিল এবং নরমও ছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ এর চেয়ে কিছুটা শক্ত নিয়ে আস। এরপর মাঝারি ধরণের একটি বেত্র দন্ড পেশ করা হল, তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ এটি ঠিক আছে। এরপর তিনি ঐ বেত্রদন্ড দ্বারা ঐ ব্যক্তির শাস্তির ব্যবস্থা করলেন।

এবনে আবি শায়বা জায়েদ এবনে আসলাম এর সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম মালেক (রঃ) মুয়াত্তায় এর উল্লেখ করেছেন।১

পবিত্র কোরআনের বর্ণনা শৈলীর বৈশিষ্ট্য

তফসীরকারগণ বলেছেন, যেহেতু চৌর্যবৃত্তিতে সাধারণতঃ পুরুষরাই অগ্রগামী হয় এজন্যে এর শাস্তি ঘোষণার ক্ষেত্রে প্রথমতঃ পুরুষের নামোল্লেখ করা হয়েছে, এরপর স্ত্রী লোকদের। এরশাদ হয়েছেঃ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -২২৭

السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓا اَيْدِيَهُمَا

চোর পুরুষ হোক কী নারী উভয়ের হাত কেটে দাও।

পক্ষান্তরে, .ব্যাভিচারের ক্ষেত্রে যেহেতু প্ররোচনা প্রথমতঃ নারীর পক্ষ থেকেই আসে, সেজন্যে আলোচ্য আয়াতে ব্যাভিচারের শাস্তি ঘোষণার ক্ষেত্রে ব্যাভিচারিণীর উল্লেখ প্রথমে করা হয়েছে, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

ব্যাভিচারী নারী পুরুষ উভয়ের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত কর।

ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, ব্যাভিচারী যদি স্বাধীন, সুস্থ বুদ্ধি, সাবালক এবং অবিবাহিত হয় তবে প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করার বিধান রয়েছে যা আলোচ্য আয়াতে ঘোষিত হয়েছে।

ইমাম আবু হানিফার (রঃ) মতে, এতদ্ব্যতীত আর কোন শাস্তি নেই। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এবং ইমাম আহমদ (রঃ)-এর মত হলো, ব্যাভিচারের ন্যায় ঘৃন্য অপরাধের জন্যে একশত বেত্রাঘাত করার পর অন্যায়কারীদেরকে এক বছরের জন্যে সেই এলাকা থেকে বের করে দিতে হবে। আর তাদেরকে কমপক্ষে এতখানি দূরত্বে রাখতে হবে, যতখানি দূরত্ব হলে নামাজ 'কসর' করা হয়। অর্থাৎ তাদের বাসস্থান থেকে কমপক্ষে আটচল্লিশ মাইল উভয়কে এক বছর যাবত সরিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু যদি ব্যাভিচারী বা ব্যাভিচারিনী বিবাহিত হয়, তাদের শাস্তি হলো 'রজম' অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপ করে তাদেরকে মেরে ফেলতে হবে।

وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

যদি তোমরা আল্লাহ পাক এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখ, তবে তাদের উপর আল্লাহ পাকের বিধান কার্যকর করার ব্যাপারে কোন প্রকার দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে।

আলোচ্য আয়াতের رَاْفَةٌ অর্থ দয়া। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের বিধান পালন করার সময় অপরাধীর প্রতি তোমাদের মনে যেন কোন প্রকার দয়ার উদ্রেক না হয়। যদি তোমরা প্রকৃত মুমেন হও, আল্লাহ পাকের প্রতি তোমাদের ঈমান খাঁটি হয়,

আখেরাতের হিসাব নিকাশের প্রতি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে ব্যাভিচারের শাস্তি প্রদানে কোন প্রকার গাফলত করবেনা।

বিখ্যাত তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ), একরামা (রঃ), আতা (রঃ), নখয়ী (রঃ), শাবী (রঃ) এবং সায়ীদ এবনে জুবায়ের (রঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

কঠোর সতর্কবাণী

বস্তুতঃ আলোচ্য আয়াতে ব্যাভিচারের শাস্তি প্রয়োগের ব্যাপারে কোন প্রকার শৈথিল্য যেন না করা হয় সে ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। ব্যাভিচারী বা ব্যাভিচারিনীকে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলার শাস্তি আপাতঃ দৃষ্টিতে কঠিন বা নিষ্ঠুরতা মনে হলেও কেউ যেন মানবতার নামে, মানব দরদের নামে এ শাস্তি রহিত করার বা লঘু করার অপপ্রয়াস না পায়। এজন্যেই শাস্তি ঘোষণার পাশাপাশি বজ্র কঠিন ভাষায় আলোচ্য আয়াতে উক্ত সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। মানবতার সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে পবিত্র কোরআনের শাস্তির বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। ইসলামে শাস্তি বিধানের উদ্দেশ্য হল অপরাধের মূলোৎপাটন, অপরাধীর প্রতিপালন নয়। এ কারণেই চুরির শাস্তি হস্ত কর্তন, ব্যাভিচারের শাস্তি 'রজম' এবং স্বেচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি 'কেছাছ' নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে কোন দয়া দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের অনুমতি নেই। আলোচ্য আয়াতের বর্ণনা ভঙ্গীর তাৎপর্য হলো এই, যদি তোমরা ব্যাভিচারীকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে দুর্বলতা দেখাও, নরম হও, তবে নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখ, আল্লাহ পাকের আযাব থেকে তোমরাও রেহাই পাবেনা; বরং আল্লাহ পাক আখেরাতে তোমাদের শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। অর্থাৎ ব্যাভিচার এমন ঘৃণ্য, নিন্দনীয় অপরাধ যে তার শাস্তি প্রয়োগের ব্যাপারে কোন প্রকার দয়া বা শৈথিল্য প্রকাশ করাও অমার্জনীয় অপরাধ। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। বণী মখজুম গোত্রের একজন স্ত্রীলোক চুরির অপরাধে ধৃত হয়েছিল। ঐ মহিলাটি যেহেতু সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক, তাই কোরাইশ তার ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়, তারা পরামর্শ করলো যে যদি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে কোন লোক দিয়ে সুপারিশ করানো হয় তবে তার শাস্তি লাঘব হতে পারে এবং সকলে এ ব্যাপারে একমত হল জায়েদ হলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে অত্যন্ত প্রিয়, হয়তো সে সুপারিশ করতে পারে, এছাড়া আর কেউ এমন দুঃসাহস করবে না। যাহোক, হযরত জায়েদ (রাঃ) হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে তার ব্যাপারে সুপারিশ করলে হুজুর

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (রাগান্বিত হয়ে) বললেন, তুমি কি আল্লাহ পাকের নির্ধারিত শাস্তি সম্পর্কে সুপারিশ করছো? এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে একটি ভাষণ দিলেন। তিনি এরশাদ করলেন; তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে এজন্যে ধ্বংস করা হয়েছে যে তাদের মধ্যে কোন বড়লোক যদি চুরি করতো, তবে তাকে ছেড়ে দেয়া হত। আর যদি কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করতো তবে তাকে শাস্তি দেয়া হত। আল্লাহ পাকের শপথ! যদি আমার কন্যা ফাতেমাও চুরি করতো, তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম।

তফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে তোমরা আল্লাহ পাকের দ্বীনের ব্যাপারে শৈথিল্য করোনা। শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তিকে হালকা করোনা; বরং এ ব্যাপারে কঠিন ও কঠোর হও। সাঈদ এবেন মোসাইয়্যেব (রাঃ) এবং হাসান বসরী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

বিভিন্ন অপরাধে শাস্তির ব্যাপারে ইমামগণের অভিমত

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেছেন, ব্যাভিচারের শাস্তি দিতে হবে অত্যন্ত কঠোরভাবে। আর মদ্য পানের শাস্তির ব্যাপারে কঠোরতা তার চেয়ে কম হবে। আর ব্যাভিচারের অপবাদের শাস্তি হবে আরও হালকা। কেননা যে অপরাধের অপবাদ দেয় সে হয়তো তার বক্তব্যে সত্যবাদীও হতে পারে (কিন্তু স্বাক্ষ্যের অভাবে সে নিজেকে সত্যবাদী প্রমাণ করতে পারেনা)। আর মদ্য পানের ব্যাপারে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই (এই অপরাধ প্রকাশ্যে হয়) আর মদ্য পানের চেয়ে ব্যাভিচারের অপরাধ অতীব জঘন্য। এজন্যে এ অপরাধের শাস্তি হতে হবে অত্যন্ত কঠোর।

ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন, মদ্যপান ও ব্যাভিচারের অপবাদের শাস্তি লঘু হতে পারে, কিন্তু ব্যাভিচারের শাস্তি হতে হবে অত্যন্ত কঠোর।

জহরী বলেছেন, ব্যাভিচারের শাস্তি এবং ব্যাভিচারের অপবাদের শাস্তির ব্যাপারেও কঠোরতা অবলম্বন করতে হবে, কেননা, এ দু'টি অপরাধের শাস্তির কথা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে, মদ্য পানের শাস্তির উল্লেখ পবিত্র কোরআনে নেই, হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর এক বাঁদী ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়েছিল। তিনি তাকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দিয়েছেন। যে

বেত্রাঘাত করছিল তাকে বলেছিলেন, তাকে পিঠে এবং পায়ে বেত্রাঘাত কর। হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর পুত্র আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন, এ আয়াতে কঠোরতা অবলম্বনের নির্দেশ রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ পাক আমাকে বেত্রাঘাতের আদেশ দিয়েছেন, তা আমি করেছি, তাকে শাস্তি দিয়েছি। আল্লাহ পাক এ আদেশ দেননি যে আমি তাকে হত্যা করি।

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ পাকের প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস কর, তবে আল্লাহ পাকের আদেশ পালনে শৈথিল্য করোনা এবং আল্লাহ পাক যে শাস্তি নির্ধারিত করেছেন তা জারি কর। এটিই ঈমানের দাবী।১

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٢

আর তাদের শাস্তি যেন মুসলমানদের এক দল প্রত্যক্ষ করে।

অর্থাৎ ব্যাভিচারের শাস্তি গোপনে হবেনা, এ শাস্তি দিতে হবে প্রকাশ্যে জন সমক্ষে। এ নিন্দনীয় ঘৃন্য কুকার্যের শাস্তি যেন অনেক লোক প্রত্যক্ষ করে যা অপরাধীর জন্যে হয় অবমাননাকর এবং অন্য লোকদের জন্যে হয় শিক্ষনীয় বিষয়।

আলোচ্য আয়াতে طائفة শব্দটির অর্থ একদল লোক। যা চারিপার্শ্বে পরিবেষ্টনকারী হবে। অর্থাৎ অনেক লোক হতে হবে। আর طائفة শব্দটি হবে কমপক্ষে চারজনের ব্যাপারে। যার প্রত্যেকে এক এক দিকে দন্ডায়মান হয় আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তিনজন হলেও طائفة শব্দটির প্রয়োগ সঠিক হবে। কেননা, বহুবচনের সংখ্যা কমপক্ষে তিন। এই অর্থ গ্রহণ করা হলে طائفة শব্দটি طائف এর বহুবচন হবে। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এক দু'জন হলেও এ শব্দটির ব্যবহার সঠিক হবে। তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, কমপক্ষে একজন বা তার বেশীকে বলা হয়। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও এ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।

ইমাম আহমদ (রঃ), আতা (রঃ), একরামা (রঃ) ইসহাক (রঃ) প্রমুখ তফসীরকার বলেছেন, দুই বা তার চেয়ে বেশী সংখ্যা হলে তাকে طائفة বলা হয়।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -২৫৬-২৫৭

জহুরী এবং কাতাদা (রঃ)–এর মতেও দুই বা তার চেয়ে বেশী সংখ্যা হলে তাকে طائفة বলা হয়।

ইমাম মালেক (রঃ) ও এবনে জায়েদ বলেছেন, কমপক্ষে চারজন হলে এ সংখ্যাকে طائفة বলা হবে। কেননা, ব্যাভিচারের ঘটনার সাক্ষীর সংখ্যা চারজন। আর হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, কম পক্ষে দশজন হলে طائفة শব্দটি ব্যবহৃত হয়।১

ব্যাভিচারের শাস্তি সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)–এর ঘোষণা

বোখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে রয়েছে যে, খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর জীবনের শেষ হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তনের পর শাহাদত বরণের একমাস পূর্বে একটি সুদীর্ঘ ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক হযরত মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সত্য দ্বীন নিয়ে প্রেরণ করেছেন, এবং তাঁর প্রতি পবিত্র কোরআন নাজিল করেছেন আর এ কোরআনে আল্লাহ পাক রজমের আয়াত নাজিল করেছেন। আমরা সে আয়াত পাঠ করেছি, তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেছি আর তা স্মরণ রেখেছি।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর পূতঃ পবিত্র জীবনে রজম সম্পর্কীয় আয়াতের উপর আমল করেছেন। তাঁর ইন্তেকালের পর আমরা অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম ঐ হুকুমের উপর আমল করেছি। আর এ আদেশ পালন অব্যাহত রয়েছে। তবে আমি আশংকা করি সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর কোন কোন লোক বলবে, আমরা রজমের আয়াত কোরআনে করীমে পাইনা। এরপর আল্লাহর তরফ থেকে আরোপিত একটি কর্তব্যকে পরিহার করে তারা পথভ্রষ্ট হবে। (প্রকৃত অবস্থা এই, রজম সম্পর্কীয় আয়াতের তেলাওয়াত মনসুখ হয়ে গেছে। কিন্তু তার হুকুম রয়ে গেছে। আল্লাহ পাক রজমের যে আদেশ দিয়েছেন, তা সেই নারী পুরুষের জন্যে যারা বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়।

হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ)–এর যুগে রজমের শাস্তি

বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত আবু কুলাবা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তিনটি কারণ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৮, পৃষ্ঠা –২৫৭–২৫৮

ব্যতীত কোন লোককে হত্যা করেননি। (এক) যদি অন্যায়ভাবে কেউ কোন লোককে হত্যা করে তবে তার কেছাছে হত্যাকারীকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছে।

(দুই) কোন বিবাহিত ব্যক্তি যদি ব্যাভিচার করে থাকে (তবে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়েছে)।

(তিন) যদি কেউ মুরতাদ হয়ে থাকে (তবে তাকেও হত্যা করা হয়েছে)।

অন্য হাদীসে রয়েছে, মায়েজ এবনে মালেককে রজম করা হয়েছিল যে নিজে তার অপরাধের কথা স্বীকার করেছিল।

(বোখারী, মুসলিম)

মায়েজ এবনে মালেক হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে আরজ করেছিলেন ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে পবিত্র করুন।

(আল-হাদীস)

গামেদ গোত্রের এক মহিলা এসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করেছিলেন আমি অপরাধ করেছি, আমাকে পবিত্র করুন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন, তুমি এখন অন্তস্বত্বা। এখন তোমাকে শাস্তি দেয়া যাবেনা। যখন শিশুর জন্ম হয়ে যাবে, তখন শাস্তি দেয়া যেতে পারে। শিশুর জন্মলাভের পর তিনি পুনরায় হাজির হন (যেন তার উপর শরীয়তের বিধান মোতাবেক শাস্তি দেয়া হয়)। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, এখন শিশু দুগ্ধ পান করে, এখন তোমাকে শাস্তি দেয়া যাবে না। যখন শিশুর দুগ্ধপান বন্ধ হবে, তখন তোমাকে শাস্তি দেয়া হবে। তিনি তৃতীয়বারের মত শাস্তি গ্রহণের জন্যে স্বেচ্ছায় হাজির হলেন, তাঁর কোলে শিশুটি ছিল আর ঐ শিশুটির হাতে একটি রুটির টুকরো ছিল (এই রুটি দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন, শিশুটি এখন রুটি খেতে অভ্যস্ত, আমার উপর শরীয়তের বিধান জারী হলে তথা আমাকে রজম দ্বারা মৃত্যুদন্ড দিলে শিশুর ক্ষতি হবেনা। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশ ক্রমে তাঁকে রজম করা হয়।

লক্ষনীয় বিষয় এই, মানব অন্তরে কতখানি আল্লাহর ভয় থাকলে এবং আখেরাতের নাজাতের চিন্তা থাকলে মানুষ নিজেকে মৃত্যুদন্ডের জন্যে স্বেচ্ছায় উপস্থিত করতে পরে। আর একবার নয় তিন তিনবার, তা সত্যিই চিন্তার বিষয়। আল্লাহ-ভীতি যাদের অন্তরে এভাবে বিরাজ করে তাঁদের জন্যে আখেরাতের চিরশান্তি সুনিশ্চিত।

এখানে উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থেও ব্যাভিচারের শাস্তি ছিল রজম। বোখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফ হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। কয়েকজন ইহুদী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে বলল, আমাদের এখানে একটি ব্যাভিচারের ঘটনা ঘটেছে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন; রজম সম্পর্কে তৌরাতে তোমরা কি পেয়েছো? তারা বলল, তৌরাতের নির্দেশ মোতাবেক আমরা ব্যাভিচারীদেরকে বেত্রাঘাত করি, মুখ কাল করে বাজারে ঘুরিয়ে লাঞ্ছিত করি। হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) বললেন, তোমরা মিথ্যা কথা বলছো, তৌরাতে রজমের শাস্তি রয়েছে, তৌরাত নিয়ে আস, তৌরাত আনা হল। এক ইহুদী তা পাঠ করতে লাগল। রজমের আয়াতের উপর হাত রেখে আগে পরে সে পাঠ করতে লাগল। হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম বললেন, হাত সরাও। হাত সরাবার পর দেখা গেল রজমের শাস্তির কথা উল্লেখিত রয়েছে। তখন ইহুদীরা স্বীকার করল যে, ব্যাভিচারের শাস্তি রজমই রয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উভয় ব্যাভিচরীকে রজমের শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দিলেন।[১]

ব্যাভিচারের শাস্তির তাৎপর্য

ইসলামী শরীয়তের যাবতীয় বিধান অত্যন্ত তাৎপর্যবহ এবং হেকমতপূর্ণ। তাই ব্যাভিচারের যে শাস্তির বিধান দেয়া হয়েছে, তা-ও বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। ব্যাভিচারের ন্যায় অশ্লীল, ঘৃন্য অমানবিক কুকর্মের শাস্তি যত কঠোর ও কঠিনই হোক না কেন, তা যে অযৌক্তিক নয় এ সম্পর্কে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই দ্বিমত পোষন করার কথা নয়। এজন্যে ইসলামী শরীয়ত এমন চরম মহাপাপের পথ বন্ধ করার লক্ষ্যে এই শাস্তির বিধান ঘোষণা করেছে যে, যদি অবিবাহিত লোক দ্বারা এ ঘৃণ্য কুকর্ম হয়, তবে তাকে একশতবার বেত্রাঘাত কর, যদি গোলাম বাঁদী এ কুকর্ম করে তবে তাদেরকে পঞ্চাশ বার বেত্রাঘাত কর। আর যদি কোন বিবাহিত নারী পুরুষ এমন ঘৃণ্য কুকর্মে লিপ্ত হয়, তবে তাদেরকে পাথর মেরে মৃত্যুদন্ড দাও যাতে করে এমন ঘৃণ্য কুকর্মে লিপ্ত মহাপাপী থেকে আল্লাহ পাকের জমিন পবিত্র হয়ে যায়। আর এই মৃত্যুদন্ড গোপনে দেয়া চলবেনা; বরং এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে জন সমক্ষে, যাতে করে লজ্জা, অপমান, লাঞ্ছনা ঐ জঘন্য অপরাধীর শাস্তিকে পরিপূর্ণ করে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনসাধারণ ঐ শাস্তি দেখে শিক্ষা লাভ করে এবং সকলে সতর্কতা অবলম্বন করে। আর এজন্যে কোরআনে

[১] তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -২৪০

করীমে আল্লাহ পাক মুসলিম সমাজের উদ্দেশ্যে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ করেছেনঃ "খবরদার! কেউ যেন এমন অপরাধীদের শাস্তির ব্যাপারে কোন প্রকার শৈথিল্য না করে, এমন মহা পাপীর বেলায় কোন প্রকার দরদ না দেখায়।' যে অপরাধ যত জঘন্য হবে, তার শাস্তিও তত কঠোর হওয়াই যুক্তিযুক্ত। সমাজ ও জাতীয় জীবনকে কলুষমুক্ত ও পবিত্র করতে হলে ইসলামী বিধান প্রবর্তনের কোন বিকল্প নেই। যে বিধান পবিত্র কোরআনে ঘোষিত হয়েছে এবং যে বিধান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দ্বারা বাস্তবায়িত হয়েছে, তাতেই রয়েছে মানব-জীবনের সার্বিক কল্যাণ। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত এ বিধান কার্যকরী করার সাথে সাথে একে একে সকল অন্যায় অনাচার বিলুপ্ত হতে থাকে। অবশেষে এমন সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই আসে যখন কোন চোর ডাকাত, লুটেরা, ব্যাভিচারী, অত্যাচারীর অস্তিত্বও ছিলনা। সেদিন সমাজ ও জাতি হয়েছিল পাপমুক্ত, মানব জীবন হয়েছিল পবিত্র, মানুষের মর্যাদা হয়েছিল ফেরেশতার চেয়েও উন্নীত, সেদিন যে পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল এবং মানব মনে পাপ পাংকিলতার প্রতি যে ঘৃণাবোধের সৃষ্টি হয়েছিল তা চিরস্মরণীয়। এ পর্যায়ে দু'একটি ঘটনার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবেনা।

হারানো দিনের দৃশ্য

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, মদীনা শরীফে হিজরতের পর যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আনসার এবং মুহাজেরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে তুললেন, তখন সায়ীদ এবনে আবদুর রহমান এবং সা'লাবাতুল আনসারীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়েছিল। প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন তাবুক অভিযানে তশরিফ নিয়ে গেলেন, তাঁর সাথে গমন করেছিলেন সায়ীদ এবনে আবদুর রহমান। তাঁর বাড়ী ঘরের দেখা শুনার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল সা'লাবাতুল আনসারীর উপর। সা'লাবা সায়ীদের বাড়ীর প্রয়োজনীয় কাজ করে যেতেন। একদিন ইবলিস শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে সালাবা পর্দা সরিয়ে গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং সায়ীদের স্ত্রীর হস্ত স্পর্শ করলেন। এমন অবস্থায় সায়ীদের স্ত্রী তাঁকে ভৎর্সনা করে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার যে ভাই আল্লাহর রাহে জেহাদে গিয়েছেন, তুমি কি তাঁর আমানতে খেয়ানত করতে উদ্যত হয়েছ"! এতটুকু কথা সা'লাবার অন্তরে এক ঝড় সৃষ্টি করে দিল, তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে আল্লাহ পাককে ডাকতে ডাকতে পাহাড়ের দিকে পলায়ন করলেন এবং চিৎকার করে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। তিনি উচ্চ স্বরে বলতে লাগলেন, এলাহী আমি পাপী,আমি গুণাহগার। কিন্তু তুমি যে অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তুমি যে দয়াবান। এরপর যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লাম মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন সকলেই তাদের গাজী ভাইদের সম্বর্ধনায় উপস্থিত হলেন, কিন্তু সা'লাবাকে দেখা গেলনা। সায়ীদ বাড়ী এসে সব কিছু জানতে পেরে সা'লাবার অনুসন্ধান করতে লাগলেন। অবশেষে তাঁকে পেয়ে বললেন, ভাই সালাবা, তুমি আমার সঙ্গে চল।

সা'লাবা বললেন, আমি এভাবে যাবনা। তুমি আমার হাতকে আমার ঘাড়ের সংগে বেঁধে সে রশি ধরে একটা অপমানিত গোলামের ন্যায় আমাকে টেনে নাও। শুধু এভাবেই আমি যাব।

অবশেষে তাই করা হল। এমনকি, সা'লাবার কন্যা খামসানাও পিতাকে রশি ধরে টেনে নিয়ে গেল। সর্ব প্রথম তারা হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট হাজির হলেন এবং পূর্বের ঘটনা বর্ণনার পর জিজ্ঞাসা করলেন, আমার এ অন্যায়ের জন্যে তওবার কোন ব্যবস্থা আছে কি?

হযরত ওমর (রাঃ) এসব ঘটনা শ্রবণ করে অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং সা'লাবাকে বের করে দিলেন।

এরপর তাঁরা হাজির হলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট। ঘটনা বর্ণনার পর তওবার পথ-নির্দেশের অনুরোধ করলেন, কিন্তু তিনিও তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

এরপর তারা আসলেন হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট। তিনি বললেন, আমার নিকট তোমার তওবার কোন ব্যবস্থা নেই।

এরপর তারা হাজির হলেন স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে। এ সময় সা'লাবা বললেন, আশা করি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে নিরাশ করবেন না।

কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখামাত্র এরশাদ করলেনঃ তুমি দোজখের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছ। সা'লাবা আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমি তওবা করতে চাই, আমার তওবার কোন ব্যবস্থা আছে কি?

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তুমি আমার এখান থেকে বেরিয়ে যাও, তোমার জন্যে তওবা নেই।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে বহিঃস্কৃত হবার পর সা'লাবার কন্যা খামসানা বলল, হে আমার পিতা! আজ থেকে আপনি আমার পিতা নন, যে পর্যন্ত না আপনি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে সন্তুষ্ট করেন। এরপর সা'লাবা পুনরায় পাহাড়ের দিকে চলে গেলেন এবং উচ্চ স্বরে বলতে লাগলেন, এলাহী! আমি ওমরের নিকট হাজির

হয়েছি, কিন্তু তিনি আমাকে প্রহার করতে চেয়েছেন, আমি আবুবকর ও আলীর নিকট হাজির হয়েছি, তারা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, অবশেষে আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান দরবারে হাজির হয়েছি, তিনিও আমাকে নিরাশকরেছেন।

কিন্তু তুমি আমার মালিক। আমি তোমার গোলাম, তোমার সুমহান দরবারে এই গোলাম হাজির হয়েছে, যদি তুমি আমাকে ক্ষমা কর তবে আমার খুশীর সীমা থাকবেনা, আর যদি তুমি আমাকে নিরাশ কর, তবে আমার ন্যায় হতভাগা আর কেউ নেই। এভাবে সারা রাত তিনি জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে কাঁদতেন।

একদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে একজন ফেরেশতা হাজির হয়ে বললেন, আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করেছেনঃ এ বিশ্ব জগৎকে এবং সমগ্র মানব জাতিকে আমি সৃষ্টি করেছি,না আপনি?

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেনঃ নিঃসন্দেহে সব কিছুর স্রষ্টা এক আল্লাহ পাক।

ফেরেশতা বললেন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ "আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করেছি, এই সুসংবাদ তাকে পৌছিয়ে দিন।"

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, সা'লাবাকে আমার নিকট কে নিয়ে আসবে? তৎক্ষণাত হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমরা তাঁকে নিয়ে আসি। আর এর পাশাপাশি দন্ডায়মান হলেন হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত সা'লমান (রাঃ) তাঁরা বললেনঃ আমরা তাঁকে নিয়ে আসি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে অনুমতি দিলেন। এরপর তাঁরা সা'লাবাতুল আনসারীর সন্ধান করতে লাগলেন এবং মদীনার উপকণ্ঠে কৃষিকার্যে লিপ্ত লোকদেরকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বললেনঃ আপনারা কি জাহান্নাম থেকে পলায়নকারী ব্যক্তির সন্ধান করছেন? তারা বললেনঃ হ্যাঁ, তখন একজন বললেনঃ তিনি রাত্রিকালে এখানে আসেন এই বৃক্ষতলে উপস্থিত হয়ে উচ্চস্বরে আল্লাহর দরবারে কাঁদতে থাকেন।

হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত সলমান (রাঃ) তাই নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা করতে লাগলেন, যখন রাত হলো তখন সা'লাবা উপস্থিত হয়ে আল্লাহ পাকের হুজুরে সিজদা রত হয়ে কাঁদতে লাগলেন। তার কান্নার শব্দ শ্রবণ করে তাঁরা সা'লাবার নিকট গমণ করে বললেনঃ হে সা'লাবাহ। চলো আল্লাহ পাক তোমাকে মাফ করেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমার পেয়ারা হাবীব হযরত রসূলে করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তোমরা কি অবস্থায় দেখে এসেছ? তাঁরা বললেনঃ তা যেমন তুমি আশা করছ, তেমন অবস্থায়ই তাঁকে দেখে এসেছি। এরপর তাঁকে নিয়ে তাঁরা মসজিদে নববীতে হাজির হলেন। তখন রাত শেষ হয়ে এসেছে, হযরত বেলাল (রাঃ) নামাজের একামত বলেছেন, ফজরের নামাজ শুরু হয়ে গেছে, তাঁরা সর্বশেষ কাতারে শরীক হয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাজে

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ সূরা তাকাসুর পাঠ করছিলেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কণ্ঠে এই সূরা শ্রবণ করেই সা'লাবা চিৎকার করে উঠলেন, আর যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পাঠ করলেনঃ

حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

তখন তিনি আরও একটি চিৎকার দিলেন এবং বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। নামাজান্তে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সা'লাবার নিকট এসে সালমানকে সম্বোধন করে বললেনঃ তার মুখে একটু পানির ছিটা দাও, তখন সালমান বললেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! সালবা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।

এমন সময় তার কন্যা খামসানাহ হাজির হয়ে পিতার মৃতদেহ দেখে কাঁদতে লাগলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেনঃ হে খামসানাহ! তুমি কি এতে রাজী নও যে, আমি তোমার পিতা হই এবং ফাতেমা হবে তোমার বোন, সে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি অবশ্যই রাজী আছি।

এরপর তাঁকে কবরস্থানে পৌছানো হলো, স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জানাজার সংগে রইলেন। কবরের পার্শ্বে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর কদম মুবারক রাখছিলেন না, বরং আংগুলের উপর ভর করেই তিনি হাঁটছিলেন। দাফন কার্য সমাপ্তির পর হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে এই অস্বাভাবিক ভাবে চলার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি এরশাদ করলেনঃ হে ওমর! কবরস্থানে এত অধিক পরিমাণে ফেরেশতা জমা হয়েছিল যে, মাটিতে পা রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না।

কোন কোন তফসীরকার বর্ণনা করেছেনঃ এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই পবিত্র কোরআনের এই আয়াত নাজিল হয়েছেঃ

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ .... وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

এবং যারা অন্যায় অবিচারে লিপ্ত হয়েছে, নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে, এরপর তারা আল্লাহ পাককে স্মরণ করেছে, তাঁর সমীপে তাদের গুণাহর জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছে। আর আল্লাহ পাক ব্যতীত কে গুণাহ মাফ করতে পারে? বস্তুতঃ যারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে কৃত অন্যায়ের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থী হয়, আল্লাহ পাক তাদেরকে এভাবেই ক্ষমা করেন। (আল্লাহ পাক আমাদেরকে এর তওফিক দান করুন)।

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ؗ
وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ

ব্যাভিচারী পুরুষ, ব্যাভিচারিনী নারী অথবা মুশরেক নারী ব্যতীত কাউকে বিয়ে করেনা এবং ব্যাভিচারিনীকে ব্যাভিচারী অথবা মুশরেক ব্যতীত কেউ বিয়ে করেনা। মোমেনদের জন্যে তা হারাম করা হয়েছে।

শানে নজুল

আবু দাউদ, তিরমিজি আমর এবনে শোয়ায়বের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের সংকলন করেছেন। মারসাদ নামক এক ব্যক্তি ছিল, যে মক্কা থেকে বন্দীদেরকে মদীনায়ে মোনাওয়ারায় পৌছাবার দায়িত্বে রত ছিল। বর্বরতার যুগে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় তাঁর সাথে ওনাক নাম্নী এক মহিলার সঙ্গে প্রীতির সম্পর্কে ছিল। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় গমন করেন, তখন ঐ মহিলা তাঁর নিকট পূর্ব সম্পর্কের ভিত্তিতে হাজির হয়। কিন্তু তিনি তার দিকে দৃষ্টিপাত করতেও রাজী হননি। তখন সে এ আচরণের অভিযোগ করলে তিনি তার দিকে না তাকিয়ে বললেন, আমি এখন মুসলমান, তোমার সঙ্গে কথা বলার বা উঠা বসা করার অনুমতি নেই। অজ্ঞতার যুগে যা সম্ভব ছিল তা এখন অসম্ভব। তখন ওনাক বলল, তাহলে তুমি আমাকে যথারীতি বিয়ে কর এবং তোমার সঙ্গে নিয়ে চল। প্রতি উত্তরে তিনি বললেন, আমি এ সম্পর্কে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুমতি না নিয়ে কোন সিদ্ধান্ত করতে পারবনা। মারসাদ মদীনা প্রত্যাবর্তন করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট ওনাককে বিয়ে করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন তাকে কোন জবাব দিলেন না। এরপর আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আলোচ্য আয়াত নাজিল হল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন এবং এরশাদ করলেন তুমি তাকে বিয়ে করোনা।

নেসায়ী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, উম্মে মাহজুল নাম্নী এক মহিলা ছিল,তার চারিত্রিক দোষের কথা অনেকেরই জানা ছিল। একজন মুসলমান তাকে বিয়ে করতে চাইলে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

সায়ীদ এবনে মানুসর তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যে সময় আল্লাহ পাক ব্যাভিচার হারাম বলে ঘোষণা করেছেন, সে সময় যারা ব্যাভিচার বৃত্তিতে রত ছিল, তাদেরকে কোন কোন লোক বিয়ে করে ঘরে তুলতে চাইলে, তখন এ আয়াত নাজিল হল।

আল্লামা বগভী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, মোহাজেরগণ যখন মদীনা শরীফ আগমন করলেন, তখন তাদের মধ্যে কিছু লোক একেবারে নিঃস্ব এবং হৃতসর্বস্ব ছিলেন। ঐ সময় বর্বরতার যুগ থেকে মদীনায় ব্যাভিচার বৃত্তিতে লিপ্ত কিছু সম্পদশালী মহিলা ছিল। দারিদ্র প্রপীড়িত মোহাজেরদের মধ্যে কেউ কেউ ইচ্ছা করলেন ঐ সম্পদশালী মহিলাদেরকে বিয়ে করে আপাততঃ দারিদ্রাবস্থা দূর করবেন। তাঁরা এই মর্মে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়, যার মর্ম হলো মোমেনদের জন্যে এসব মহিলাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ব্যাখ্যা করেছেন আতা এবনে আবি বরাহ। মুজাহেদ (রঃ), কাতাদা (রঃ) জুহরী (রঃ) ইমাম শাবী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, উফীর সূত্রে জানা যায় যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ মতই পোষণ করতেন।

আয়াতের মর্মকথা

এ আয়াতের মর্মকথা হল যে ব্যাভিচার এমনই জঘন্য এবং ঘৃণ্য কুকর্ম যে এতে লিপ্ত পুরুষ সতী নারীর যোগ্য বলে বিবেচিত হয়না। আর এমন গর্হিত কাজে লিপ্ত নারীও সাধু সজ্জন পুরুষের উপযুক্ত বিবেচিত হয়না।

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম নছফী (রঃ) বর্ণনা করেন, এ পর্যায়ে সবচেয়ে সঠিক কথা হলো এই যে, এ আয়াতে অশ্লীল কার্যে লিপ্ত নারী পুরুষের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের ব্যাপারে ঘৃণার সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রকৃত মুসলমান শুধু সতী সাধ্বী নারীকেই বিয়ে করে। যে ব্যক্তি অসামাজিক কাজে লিপ্ত সে-ই কেবল এমন নারীকে বিয়ে করতে পারে, এমনিভাবে যে নারী এমন ঘৃন্য কাজে লিপ্ত, সে-ই শুধু এমন মন্দ পুরুষের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। এটি মোমেনদের শানেরখেলাফ।

ইমামগণের অভিমত

এ আয়াতের আলোকে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) বলেছেন, কোন চরিত্রবান লোকের পক্ষে কোন ব্যাভিচারিণীকে বিয়ে করা বৈধ নয় যে পর্যন্ত না সে খাঁটি তওবা করে, এমনিভাবে কোন সতী সাধ্বী নারীর পক্ষে ব্যাভিচারী পুরুষকে বিয়ে করা বৈধ নয় যে পর্যন্ত না সে সঠিক ভাবে তওবা করে।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এবং অন্যান্য ইমামগণের মাজহাব হল, ব্যাভিচারিণী স্ত্রী লোকের সঙ্গে বিয়ে হারাম, তবে কেউ যদি এতদসত্ত্বেও বিয়ে করে ফেলে তবে তার ঐ বৈবাহিক সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে। ইমাম মালেক (রঃ) এর মতে, ব্যাভিচারিনীকে বিয়ে করা মকরুহ তাহরিমী।

وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٣

আর মোমেনদের জন্যে তা হারাম। এ কথার তাৎপর্য হলো মোমেনগণ এমন কাজ করেনা, যারা ঈমানদার তারা এমন কাজ থেকে নিজেকে বিরত ও পবিত্র রাখে।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا
بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ
شَهَادَةً اَبَدًا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝٤ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا
مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٥ وَالَّذِيْنَ
يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ
فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٦
وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝٧

তরজমা

(৪) আর যারা সতী স্বাধ্বী রমনীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এরপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারেনা, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর এবং কখনও তাদের স্বাক্ষ্য গ্রহণ করবে না, তারাইতো অবাধ্য, নাফরমান।

(৫) তবে এরপর যারা তওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে , আর আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

(৬) আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই, তবে এমন ব্যক্তির স্বাক্ষ্যের ব্যবস্থা এই যে সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী।

(৭) আর পঞ্চমবার বলবে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার উপর নেমে আসবে আল্লাহ পাকের লানত।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে ব্যাভিচারিনীর সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে কারো প্রতি ব্যাভিচারের অপবাদ দেয়া হলে অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে, যারা শরীয়ত সম্মত স্বাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত কারো প্রতি ব্যাভিচারের অপবাদ দেয়, সেই অপবাদকারীদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে। কেননা, তারা কারো প্রতি অপবাদ দিয়ে তথা ব্যাভিচারের কলংক আরোপ করে তাদের অবমাননা করেছে। এই অপরাধের জন্যে তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে। দ্বিতীয়তঃ কখনও তাদের স্বাক্ষ্য গ্রহণ করা হবেনা। তৃতীয়তঃ তাদেরকে ফাসেক বা অবাধ্য নাফরমান এবং পাপীষ্ঠ মনে করা হবে। অপবাদ দাতা যদি তার বক্তব্যের পক্ষে শরীয়ত মোতাবেক চারজন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী পেশ করতে পারে তবে অপরাধ প্রমাণিত হবে এবং অভিযুক্তদেরকে অবশ্যই ব্যাভিচারের জন্যে নির্ধারিত শাস্তি ভোগ করতে হবে। পক্ষান্তরে, যদি শরীয়ত মোতাবেক চারজন নির্ভরযোগ্য স্বাক্ষী পেশ করতে না পারে, তবে অপবাদ আরোপকারীকে আশিটি বেত্রাঘাত দেয়া হবে এবং চিরদিনের জন্য তার সাক্ষ্য বাতিল ঘোষণা করা হবে।

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

আর তারাই চরম অবাধ্য। কারো প্রতি অপবাদ দেয়া হলে, আর তার অপবাদের বক্তব্যের পক্ষে শরীয়ত সম্মত সাক্ষী পেশ করতে না পারলে, নিঃসন্দেহে

অপবাদকারীকে মহাপাপী মনে করা হবে। এখানে দু'টি কথা আছে। (১) কোন লোক সম্পর্কে জেনে শুনেই অপবাদ দেয়া অথচ এই অপবাদে কোন সত্যতাই নেই। এমন অবস্থায় নিঃসন্দেহে অপবাদকারী চরম অবাধ্য এবং কঠিন শাস্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হত। (২) যদি ঘটনা সত্যও হয় কিন্তু তার সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপিত করা সম্ভব না হয়, এমন অবস্থায়ও কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের কলংক রটনা করা অবৈধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ফেকাহবিদগণ মন্তব্য করেছেন।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا

কিন্তু যারা এমন অন্যায় কাজ থেকে তওবা করে, আর নিজেদের সংশোধন করে, তবে হয়তো আল্লাহ পাক তাদেরকে মাফ করে দেবেন। কেননা, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, যদি কেউ অপবাদের গুণাহ থেকে তওবা করে এবং আত্মসংশোধন করে তবে আশা করা যায় যে আল্লাহ পাক তাকে মাফ করবেন। মহাপাপী হিসাবে তার যে বদনাম ছিল তা দূর হবে। কিন্তু তওবা করার কারণে আশিটি বেত্রাঘাতের যে শাস্তি রয়েছে তা রহিত হবেনা। কারণ তা হল বন্দার হক। তওবা করার কারণে তার এই উপকার হবে যে তাকে ফাসেক বলা হবেনা। আর অপবাদের কারণে তার যে গুণাহ হয়েছিল তা মাফ হবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু আশিটি বেত্রাঘাতের শাস্তির আদেশ বহাল থাকবে। কেননা, সে শরীয়ত সম্মত প্রমাণ ব্যতীত মুসলমানের অবমাননা করেছে। এ পর্যায়ে তত্ত্বজ্ঞানীগণ একথাও বলেছেন, ব্যাভিচারের ব্যাপারে অপবাদ দেয়া হলে যদি চার সাক্ষীর কম পেশ করা হয় তবে অপবাদকারীকে শাস্তি দেয়া হবে। ব্যাভিচারীর অপরাধ প্রমাণ করতে হলে চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন থাকে। যদি চারজন সাক্ষী না থাকে তবে অপরাধীর শাস্তি হবেনা একথা সর্বজনবিদিত, এতদসত্ত্বেও কেন তারা অপবাদ দেয়? এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে অপবাদ দাতার উদ্দেশ্য সঠিক নয়, তার ইচ্ছা হল একজন মুসলমানকে অপমানিত করা, অপরাধ প্রমাণিত হোক বা না হোক। যে কারো প্রতি অন্যায় ভাবে ব্যাভিচারের অপবাদ দেয় তার সাক্ষ্য ইসলামী আদালতে কখনও গ্রহণযোগ্য হবেনা। একথার তাৎপর্য হল এই যে যতক্ষণ সে তওবা না করে ততক্ষণ তার শাহাদত গ্রহণযোগ্য হবেনা, কিন্তু সে যদি এই অন্যায় থেকে বিরত থাকে এবং আত্মসংশোধনে ব্রতী হয় তবে তার স্বাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কথাটির দৃষ্টান্ত হল এরূপ। যখন বলা হয়, "কোন কাফেরের স্বাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করবেনা" এর অর্থ হল, যতক্ষণ সে কাফের থাকে, ততক্ষণ তার স্বাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবেনা। কিন্তু সে যদি ইসলাম কবুল করে তবে তার স্বাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে ঈমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেছেন, যখন অপবাদ দানকারী তওবা করে ফেলবে এবং আত্ম-সংশোধন করবে তখন আর সে ফাসেক

থাকবেনা। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তার শাস্তি রহিত হবে; রবং আশিটি বেত্রাঘাতের যে কথা ঘোষণা করা হয়েছে তা অব্যাহত থাকবে অর্থাৎ তওবার মাধ্যমে (فسق) নাফরমানীর কলংক দূরীভূত হয়, কিন্তু ঘোষিত শাস্তি বাতিল হয়না।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, তওবার অর্থ হল নিজের কৃতকর্মের উপর লজ্জিত হওয়া, আর আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া। আর সঠিক তওবা করলে, লজ্জিত হলে এবং আত্মসংশোধন করলে তওবা কবুল হবে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এই ব্যাখ্যা হযরত ওমর (রাঃ) হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে।

সাঈদ এবনে মোসাইয়্যেব (রাঃ) সোলায়মান এবনে ইয়াসার (রঃ) শা'বি (রঃ) একরামা (রঃ) জহুরী (রঃ) ওমর এবনে আবদুল আযীয (রঃ) প্রমুখ এ মতই পোষণ করেছেন।

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

কেননা, আল্লাহ পাক নিশ্চয় অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

অর্থাৎ যে অপরাধ করে এবং এরপর ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তওবা করে, কৃত অন্যায়ের জন্যে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়, তবে আল্লাহ পাক তওবাকারী ক্ষমাপ্রার্থীকে ক্ষমা করেন, কেননা, তিনি অত্যন্ত দয়াবান।

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ

আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই, তবে এমন ব্যক্তির সাক্ষ্যের ব্যবস্থা এই যে, সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে বলবে, সে অবশ্যই সত্যবাদী।

শানে নজুল

বোখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস লিপিবদ্ধ আছে। হেলাল এবনে ইমাইয়া হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে তার স্ত্রী সম্পর্কে ব্যাভিচারের অপবাদ দেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তুমি শরীয়ত মোতাবেক চার সাক্ষী হাজির কর, অন্যথায় তোমার পৃষ্ঠদেশে বেত্রাঘাত করা হবে। হেলাল আরজ করলেন ইয়া

রসূলাল্লাহ! যদি কোন ব্যক্তি নিজে এই ঘটনা দেখে সে কি সাক্ষীর অনুসন্ধান করতে যাবে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, হয় তুমি সাক্ষী হাজির কর নয়, তুমি শাস্তি গ্রহণের জন্য তৈরী হও। হেলাল বললেন, সেই আল্লাহর শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন, নিঃসন্দেহে আমি সত্য, আল্লাহ পাক অবশ্যই এমন কোন হুকুম নাজিল করবেন, যার কারণে আমি বেত্রাঘাত থেকে রক্ষা পাব। ঠিক এরপরই জীব্রাঈল (আঃ) এ আয়াত নিয়ে উপস্থিত হলেন।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে কোন স্ত্রী লোকের উপর ব্যাভিচারের অপবাদ দেয়ার শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে নিজের স্ত্রীর উপর অপবাদ দেয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। শরীয়তের ভাষায় যাকে লেয়ান বলা হয়। এ লেয়ানের ব্যবস্থা হয় এরূপ, যে ব্যক্তি অপবাদ দিবে সে চারজন স্বাক্ষী পেশ করার স্থলে চারবার শপথ করে বলবে যে আমি যা বলছি তা সত্য, আর পঞ্চমবার বলবে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহ পাকের লানত হোক। ঐ ব্যক্তির চার বারের শপথ চারজন সাক্ষীর স্থলে গ্রহণ করা হবে। এভাবে তার উপর থেকে অপবাদের শাস্তি রহিত হবে এবং অবমাননা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে। আর স্ত্রী লোকের লেয়ান হল এই যে সে আল্লাহর নামে শপথ করে চার বার বলবে যে তার স্বামী মিথ্যাবাদীদের অন্যতম, সে তার সম্পর্কে যা বলেছে তা সত্য নয়। আর পঞ্চমবার একথা বলবে, যদি সে সত্যবাদী না হয় তবে তার উপর আল্লাহর গজব হোক। এভাবে লেয়ান করার পর তাদের পরস্পরের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর ঐ স্বামীর জন্য এই স্ত্রীলোক সর্বকালের জন্য হারাম হবে এবং কখনও ঐ স্বামী তাকে আর বিয়ে করতে পারবে না।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, যারা জেনে শুনে মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যা কথাকে সত্য প্রমাণিত করার জন্যে আল্লাহ পাকের শপথ গ্রহণ করে অবশেষে আল্লাহ পাকের গজব তাদের উপরই আপতিত হয়।

মসনদে আহমদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হযরত সাদ এবনে ওবাদা (রাঃ) ছিলেন আনসারের সর্দার। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর তিনি বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এ আয়াত কি এভাবেই নাজিল হয়েছে? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ হে আনসারগণ! তোমরা শ্রবণ কর, তোমাদের নেতা কি বলছে?

তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! দয়া করে আপনি তাঁকে ক্ষমা করুণ। হযরত সাদ (রাঃ) বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার পরিপূর্ণ ঈমান হল এই যে এই আয়াত সত্য, আর এই আয়াতের বক্তব্যও সম্পূর্ণ সত্য কিন্তু আমার বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, আয়াতের নির্দেশ বাস্তবে কিভাবে কার্যকর হবে? এরপরেই হযরত হেলাল এবনে উমাইয়া (রাঃ) হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হন। ইনি সেই তিন ব্যক্তির অন্যতম, যারা তাবুকের যুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবেই শরীক হননি, এরপর আন্তরিকভাবে তওবা করলে আল্লাহ পাক তাঁদের তওবা কবুল করেন। তিনি তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে অভিযোগ করলেন। কিন্তু যেহেতু চারজন সাক্ষী পেশ করতে পারছেন না তাই তাঁকে অপবাদের শাস্তি স্বরূপ বেত্রাঘাত করা হবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ শাস্তির আদেশ প্রদান করবেন। হযরত হেলাল (রাঃ) বললেন, আল্লাহ পাকের দরবার থেকে আমি এ আশা পোষণ করি যে তিনি আমাকে রক্ষা করবেন। তাই তিনি আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার কথা আপনার মেজাজ মোবারকের খেলাফ হয়েছে, তবে আল্লাহ পাকের শপথ করে বলছি আমি সত্যবাদী, আর তা আল্লাহ পাক ভাল ভাবেই জানেন। কিন্তু যেহেতু তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে সাক্ষী পেশ করতে অক্ষম ছিলেন তাই হয়তো অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে অপবাদের শাস্তি দেয়ার আদেশ দিবেন। ঠিক এমন সময় তাঁর নিকট ওহী নাজিল হওয়া শুরু হল এবং সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক দেখেই উপলব্ধি করলেন যে পবিত্র কোরআন নাজিল হচ্ছে। যখন আয়াত নাজিল হওয়া শেষ হল, তখন তিনি হযরত হেলাল (রাঃ)-এর দিকে লক্ষ্য করে এরশাদ করেন, হে হেলাল! আনন্দিত হও, আল্লাহ পাক তোমার জন্যে সুব্যবস্থা করেছেন এবং তোমার নিস্কৃতির আদেশ জারি করেছেন। হযরত হেলাল (রাঃ) আরজ করলেন আলহামদুলিল্লাহ, দয়াময় আল্লাহ পাকের মহান দরবার থেকে আমি এই আশাই করছিলাম। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীকে হাজির করালেন এবং তাদের উভয়ের সামনে আলোচ্য আয়াত পাঠ করে শুনালেন। এরপর এরশাদ করলেনঃ মনে রেখ, দুনিয়ার শাস্তি থেকে আখেরাতের আযাব অত্যন্ত কঠিন। তখন হেলাল (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি সত্যবাদী (আমি সম্পূর্ণ সত্য কথা বলেছি)। তখন তাঁর স্ত্রী বললো, সে মিথ্যা কথা বলে। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন, তোমরা লেয়ান কর। হযরত হেলাল (রাঃ)-কে বলা হল তুমি চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে তোমার বক্তব্য পেশ কর। যখন পঞ্চমবার শপথ করার সময় আসলো তখন তাকে বলা হল, হেলাল! আল্লাহ পাককে ভয় কর, আখেরাতের শাস্তির চেয়ে দুনিয়ার শাস্তি অত্যন্ত সহজ, যখনই পঞ্চমবার শপথ করে কথা বলবে, তখন (যদি তা মিথ্যা হয়) তোমার উপর আযাব ওয়াজিব হয়ে যাবে। তখন হযরত

হেলাল (রাঃ) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ পাকের শপথ! যেভাবে আল্লাহ পাক আমাকে আমার সত্যবাদীতার কারণে দুনিয়ার শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন, ঠিক এমনিভাবে আমার সত্যবাদীতার কারণেই আল্লাহ পাক আমাকে আখেরাতের আযাব থেকেও রক্ষা করবেন। এরপর তিনি পঞ্চমবার শপথের কথা উচ্চারণ করলেন। তখন তাঁর স্ত্রীকে বলা হল, সে চারবার শপথ করে বললো যে তার স্বামী মিথ্যাবাদী, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে পঞ্চমবার শপথ করতে বিরত রাখলেন এবং যেভাবে হযরত হেলাল (রাঃ) কে বুঝিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবে তাকেও নসিহত করলেন। তখন সে একটু বিরত হল এবং তার রসনাকে নিয়ন্ত্রণ করলো, মনে হল সে অপরাধ স্বীকার করবে। কিন্তু এরপর বলতে লাগলো, আমি সর্বকালের জন্য আমার সম্প্রদায়কে অপমানিত করতে পারিনা। এরপর বললো, "যদি আমার স্বামী সত্যবাদী হয় তবে আমার প্রতি আল্লাহর গজব নাজিল হোক"। তখন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিলেন এবং আদেশ দিলেন যে এই স্ত্রীলোকের গৃহে যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে তা হেলাল (রাঃ) এর সন্তান মনে করা হবেনা, আর তাকে অবৈধ সন্তানও বলা হবেনা। যে এই শিশুকে অবৈধ সন্তান বলবে অথবা এ স্ত্রী লোকের উপর কোন প্রকার অপবাদ দিবে তাকে অপবাদের শাস্তি দেয়া হবে। আর এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন যে এই মহিলার খোরপোষের কোন দায়িত্ব হেলাল (রাঃ) এর উপর বর্তাবেনা, কেননা তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ করা হয়েছে যদিও তালাকও হয়নি এবং স্বামীর এন্তেকালও হয়নি। এরপর এরশাদ করেছেন, দেখ যদি এই শিশুটি লাল এবং সাদা বর্নের মোটা পা বিশিষ্ট হয়ে জন্ম গ্রহণ করে, তবে এই শিশুটিকে হেলালের তরফ থেকে মনে করবে। পক্ষান্তরে, যদি শিশুটি তেমন হৃষ্ট পুষ্ট না হয় এবং তার বর্ন শ্যামলা হয় তবে শিশুটি তারই হবে যার ব্যাপারে অপবাদ দেয়া হয়েছে। যখন শিশু জন্ম গ্রহণ করলো তখন দেখা গেল তার অবস্থা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বর্ণনা মোতাবেক অপবাদের সত্যতা প্রমাণ করে। তখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যদি বিষয়টি শপথ দ্বারা সিদ্ধান্ত করা না হত, তবে আমি এই স্ত্রী লোকটিকে শাস্তি দিতাম, পরবর্তী কালে ঐ শিশুটি মিসরের শাসনকর্তা হয়েছিল, সে তার মায়ের সন্তান বলেই পরিচিত হত।

(আবু দাউদ শরীফ)

এই হাদীস অন্য সূত্রে বোখারী শরীফেও সংকলিত হয়েছে।

সাইদ এবনে জুবায়ের (রঃ) বর্ণনা করেন, লেয়ানকারী নারী পুরুষ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ করা হবে কিনা? আর এই ঘটনা হযরত আবদুল্লাহ এবনে জুবায়েরের যুগের। আমি এ রকোন সঠিক উত্তর দিতে পারিনি। তখন আমি পদব্রজে হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) এর বাড়ীতে

হাজির হলাম এবং তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, সোবহানাল্লাহ!সর্ব প্রথম এই প্রশ্নটি অমুকের ছেলে অমুক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে জিজ্ঞাসা করেছিলে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সব অশ্লীল কথাবার্তা শুনে অসন্তুষ্ট হয়ে নিরব ছিলেন। তখন সূরা নূরের এ আয়াত সমূহ নাজিল হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের উভয়কে ডেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নসিহত করেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও প্রত্যেকে নিজেকে সত্যবাদী বলে দাবী করে। এরপর আয়াতে বর্ণিত নিয়ম মোতাবেক উভয়ে শপথ করে। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দেন।

বর্নিত আছে যে সর্ব প্রথম লেয়ান মুসলমানদের মধ্যে হেলাল এবনে উমাইয়া (রাঃ) এবং তার স্ত্রীর মধ্যে হয়েছিল।১

وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ إِنَّهٗ
لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ⑧ وَالْخٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ إِنْ كَانَ
مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ⑨ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَأَنَّ اللّٰهَ
تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ⑩ إِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۭ لَا
تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ۭ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۭ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ
مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ⑪

তরজমা

(৮) আর স্ত্রী শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবে যদি সে আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে তার স্বামীই মিথ্যাবাদী।

(৯) এবং পঞ্চমবারে বলে, যদি স্বামী সত্যবাদী হয়, তবে তার নিজের উপর নেমে আসবে আল্লাহর গজব।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৮, পৃষ্ঠা-৩৭-৩৯
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -২৭১-২৭২
তফসীরে রুহুল মা'আনী, খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-১১০

(১০) এবং তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহ ও দয়া না থাকতো তবে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেতনা। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তওবা গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময়।

(১১) নিশ্চয়ই যারা এ অপবাদ রচনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল, তোমরা এ বিষয়কে তোমাদের জন্য অকল্যাণকর মনে করোনা, বরং তা তোমাদের জন্যে উত্তম তাদের প্রত্যেকের জন্যে রয়েছে নিজ নিজ কৃতকর্মের পরিণতি। আর তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, তার জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ যদি কোন স্বামী তার নিজের স্ত্রীর প্রতি ব্যাভিচারের অপবাদ আরোপ করে, তবে তার কর্তব্য হবে স্বীয় বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণের জন্যে চারজন সাক্ষী পেশ করা। যদি যথারীতি চারজন সাক্ষী থাকে, তবে অপরাধ সাব্যস্ত হবে এবং অপরাধিনীকে ব্যাভিচারের শাস্তি 'রজম' করা হবে। কিন্তু যদি সে চারজন সাক্ষী পেশ করতে অক্ষম হয় তবে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে তাকে আল্লাহ্ পাকের নামে শপথ করে চারবার বলতে হবে যে তার কথা সত্য, সে মিথ্যা অপবাদ দেয়নি। চারবার যে শপথ করবে তা চারজন সাক্ষীর স্থলবর্তী হবে। এরপর পঞ্চমবার শপথ করে বলবে যে, সে যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে তবে তার উপর আল্লাহর গজব পড়বে। কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তি এভাবে শপথ করতে অস্বীকৃতি জানায় তবে বিচারক তাকে বন্দী করে রাখবে, ঐ অবস্থায় হয় সে শপথ করবে অথবা নিজেকে মিথ্যাবাদী বলে স্বীকার করবে। যদি ঘটনাক্রমে সে উভয় পন্থার কোন পন্থাই অবলম্বন না করে তবে তাকে কারাগারে পড়ে থাকতে হবে। আর যদি সে নিজেকে মিথ্যাবাদী বলে স্বীকার করে তবে তাকে অপবাদ আরোপকারীর জন্যে নিদৃষ্ট শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত দেয়া হবে।

এখানে উল্লেখ্য যদি স্বামী চারবার শপথ করে এবং পঞ্চমবারও শপথ বাক্য উচ্চারণ করে তবে এমন অবস্থায় স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কি অপবাদের সত্যতা স্বীকার কর? যদি সে অস্বীকার করে তবে তাকে চারবার আল্লাহ পাকের নামে শপথ করে বলতে হবে, স্বামী মিথ্যাবাদী। আর পঞ্চমবার বলবে যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহর গজব পড়বে। যদি স্ত্রী স্বামীর প্রদত্ত অপবাদের সত্যতা স্বীকার করে তবে তাকে শরীয়ত ঘোষিত ব্যাভিচারের শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু যদি সে-ও চারবার শপথ বাক্য উচ্চারণ করে এবং উভয় পক্ষ থেকে

পরস্পরের প্রতি লানত দেয়া হয় তবে তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ঐ স্বামীর জন্যে এই স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে। যদি স্বামী নিজেই তাকে তালাক দিয়ে দেয় তবে তাই উত্তম। যদি তা না হয় তবে বিচারক তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘোষণা করে বলবে, "আমি তোমাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিলাম"। বিচারকের তরফ থেকে বিবাহ বিচ্ছেদের এই ঘোষণা তালাকে বায়েন বলে বিবেচিত হবে।

এখানে একথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য, আলোচ্য আয়াত সমূহে স্বামী স্ত্রীর একে অন্যকে লানত দেয়ার যে কথা বলা হয়েছে শরীয়তের পরিভাষায় তাকে 'লেয়ান' বলা হয়।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠﴾

"এবং তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ ও দয়া না থাকতো (তবে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেতনা।) আর নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তওবা গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময়।"

লেয়ানের এই ব্যবস্থা তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নয়। যদি আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম দয়া এবং রহমত না থাকতো তথা লেয়ানের এই আদেশ নাজিল না হত তবে স্বামী স্ত্রী উভয়কেই সারা জীবন চরম অশান্তি ভোগ করতে হত। এটি নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ দান। এর কারণ এই, যদি লেয়ানের ব্যবস্থা না হত, আর স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বামী অভিযোগ করলে এবং চারটি সাক্ষী হাজির করতে না পারলে তাকে অপবাদের শাস্তি স্বরূপ আশিটি বেত্রাঘাত সইতে হত। পক্ষান্তরে, যদি স্ত্রীর অপরাধ সম্পর্কে অবগত হয়ে তা গোপন রাখত তবে তাকে আজীবন চরম অন্তর জ্বালা ভোগ করতে হত।

এখানে একথাও বিশেষভাবে উল্লখযোগ্য, লেয়ানের বিধানে স্বামী স্ত্রী উভয়ের সুবিধা অসুবিধাকে বিশেষ বিবেচনায় রাখা হয়েছে। যদি শুধু স্বামীর শপথে স্ত্রীর অপরাধ প্রমাণিত হত তবে ক্ষেত্র বিশেষে অপরাধিনী নয় এমন স্ত্রীও শাস্তি ভোগ করতো। আর কলংকের বোঝা তাকে সারা জীবন বইতে হত। পক্ষান্তরে, যদি শুধু স্ত্রীর শপথেই তাকে নিস্পাপ বলে মেনে নেয়া হত তবে মিথ্যা অপবাদের দায়ে স্বামীকে শাস্তি ভোগ করতে হত। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয যে লেয়ানের এ ব্যবস্থা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত, শুধু তাই নয়; বরং নারী পুরুষ উভয়ের জন্যে আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত এবং অনুগ্রহ।

اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ

"নিশ্চয়ই যারা এ অপবাদ রচনা করেছে, তারাতো তোমাদেরই একটি দল।"

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে সাধারণ মুসলমান এবং সতী সাধ্বী নারীদের উপর অপবাদ দেয়ার শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে উম্মুল মোমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি মোনাফেকরা যে অপবাদ দেয়ার ধৃষ্টতা দেখায়, তার বিবরণ দেয়ার পর অপবাদ প্রদানকারীদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এ আয়াত থেকে দশটি আয়াত পর্যন্ত এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে, পরে উম্মুল মোমিনীনের পবিত্রতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

এ নিন্দনীয় কাজের প্রধান হোতা ছিল আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুল। সে ছিল দূরাত্মা মোনাফেকদের নেতা। ভুল বোঝাবুঝির কারণে কয়েকজন মুসলমানও তার সঙ্গে শরীক হয়েছিল। তারা ছিলেন তিনজন। দু'জন পুরুষ হযরত হাছ্যান এবনে সাবেত (রাঃ) ও মেসতাহ (রাঃ) এবং হামনা বিনতে জাহাশ। মোনাফেকদের কাজই ছিল ইসলামের ক্ষতি সাধন করা, প্রিয়নবী (দঃ)-কে কষ্ট দেয়া। আর এ উদ্দেশ্যে মোনাফেক নেতা আবদুল্লাহ এবনে উবাই একটি জঘন্য মিথ্যা কথাকে প্রায় এক মাস যাবত রটাতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের এ আয়াত সমূহ নাজিল করে উম্মুল মোমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর পবিত্রতার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন এবং যে মোনাফেকরা এ মিথ্যা কথা রটায়, তাদের শাস্তির কথাও ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে ঘোষণা মোতাবেক অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে افك শব্দটির অর্থ জঘন্য মিথ্যা। আভিধানিক অর্থ হলো কোন কিছুকে পরিবর্তন করা, উল্টে দেয়া। হযরত আয়েশা (রাঃ) উম্মতে মোহাম্মদীয়ার সর্বোত্তম ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কন্যা এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহা মানব, সৈয়্যদুল মুরসালীন, রহমতুললিল আলামীন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রী, উম্মুল মোমেনীন বা মোমেন-জননী। তাঁর সম্মান করা প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্তব্য, অথচ মানবতার দুশমন মোনাফেকরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এবং তাঁর উপর অপবাদ আরোপ করে এর চেয়ে বড় মিথ্যা, ধোকা, জালিয়াতি আর কিছুই হতে পারেনা।

অপবাদের ঘটনা

ষষ্ঠ হিজরীর কথা। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বণী মোস্তালেকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমন করেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) এই জেহাদে তাঁর সঙ্গী ছিলেন। তিনি একটি পর্দা ঘেরা হাওদায় (উষ্ট্র পৃষ্ঠের আসন বিশেষ) উপবিষ্ট

থাকতেন। উষ্ট্র চালক ঐ হাওদাটিকে উষ্ট্রের পৃষ্ঠদেশে রেখে দিত। হাওদাটি পর্দা ঘেরা থাকার কারণে তার ভেতরে লোক আছে কি-না তা বোঝা যেতনা। উম্মুল মোমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর জন্যে একটি স্বতন্ত্র উষ্ট্রের ব্যবস্থা ছিল। যুদ্ধের পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা মোনাওয়ারা প্রত্যাবর্তন কালে একটি স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। সেখান থেকে রওয়ানা হবার পূর্বক্ষণে উম্মুল মোমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রকৃতির ডাকে কাফেলা থেকে দূরে নির্জন জঙ্গলে গমন করেন। প্রত্যাবর্তন কালে তাঁর গলার হার কোথাও পড়ে যায়। ঐ হারের অনুসন্ধানে তাঁর কিছুটা বিলম্ব হয়। এরই মধ্যে কাফেলা সেই স্থান থেকে রওয়ানা হয়ে যায়। তাঁর উষ্ট্রচালকও যথারীতি যাত্রা শুরু করে এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) হাওদার ভেতর আছেন একথাই তিনি মনে করেন কেননা, হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন ক্ষীণকায়, তাঁর দেহের ওজন ছিল অত্যন্ত হালকা। তাই উষ্ট্র চালক তাঁর অনুপস্থিতি টের পাননি। তিনি মনে করেছেন যে হযরত আয়েশা (রাঃ) হাওদায় রয়েছেন এবং তাঁকে নিয়েই তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন। এদিকে উম্মুল মোমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) সেই স্থানে ফিরে এসে দেখেন কাফেলা সেখান থেকে চলে গেছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) তখন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন, তিনি সে স্থানেই অবস্থান করেন কেননা, তিনি ভাবলেন পরবর্তী মঞ্জিলে পৌঁছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন তাঁকে পাবেন না তখন তাঁর অনুসন্ধানের জন্যে তিনি এখানেই লোক পাঠাবেন। সেজন্যে তিনি ঐ স্থানে অবস্থান করাই সমীচিন মনে করেন। রাত্রিকাল ছিল। তিনি সেখানেই বসে ছিলেন। আর ঐ অবস্থায় তিনি সেখানেই নিদ্রিত হন।

প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যাবতীয় কাজ অত্যন্ত সুশৃংখল হত। প্রত্যেকটি ব্যাপারেই তিনি তাঁর নিজস্ব নিয়ম কানুন প্রবর্তন করেন, যাতে করে ঐ শৃংখলা রক্ষা করা যায়। সফরের ব্যাপারে তাঁর একটি নিয়ম ছিল, কাফেলার কোন কিছু যেন ভুলক্রমে পড়ে না থাকে তার জন্যে একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত থাকত যে সকলের পরে রওয়ানা হত। কোন কিছু পড়ে থাকলে সে তা নিয়ে আসত। এ সফরে যাকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছিল তিনি ছিলেন হযরত সাফওয়ান (রাঃ)। তিনি ঐ স্থানে সকলের শেষে উপস্থিত হন। যখন কাফেলা সেখান থেকে চলে যায় তখন সেখানে হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে একা অবস্থান করতে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তাঁর রসনায় উচ্চারিত হয় "ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।" এখানে উল্লেখ্য, পর্দা প্রথা প্রচলনের পূর্বে হযরত সাফওয়ান (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে দেখেছিলেন। তাই তাঁকে দেখা মাত্রই তিনি চিনে ফেলেছিলেন। হযরত সাফওয়ান (রাঃ)-এর মুখ থেকে উচ্চারিত বাক্যটি শ্রবণ মাত্র হযরত আয়েশা (রাঃ) জাগ্রত হয়ে বসে গেলেন এবং তাঁর চেহারা

ঢেকে ফেললেন। হযরত সাফওয়ান (রাঃ) সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উটটি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সম্মুখে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বিনা বাক্য ব্যয়ে উটের পিঠে পর্দা করে বসে পড়লেন। হযরত সাফওয়ান (রাঃ) উটের লাগাম ধরে পদব্রজে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলেন এবং দ্বিপ্রহরের সময় মূল কাফেলার সঙ্গে মিলিত হন। এটিই ছিল প্রকৃত ঘটনা।১

মোনাফেকরা সর্বদা ইসলাম ও মুসলমানের ক্ষতি সাধনের অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকত। তারা তিলকে তাল বানিয়ে মিথ্যে রটনায় ব্যস্ত হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেও মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ এবনে উবাই উম্মুল মোমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নামে মিথ্যে অপবাদের ঝড় তোলে। মোনাফেকদের এ ষড়যন্ত্রের সূক্ষ্ম জালে তিনজন সরল প্রাণ মুসলমানও জড়িয়ে পড়েন এবং তাদের সুরে কথা বলতে থাকেন।

অপবাদের এ ঘটনা সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত সহ দশটি আয়াত নাজিল হয় এবং এর দ্বারা একদিকে উম্মুল মোমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর পবিত্রতা এবং মর্যাদার কথা ঘোষণা করা হয় অন্যদিকে মোনাফেকদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায় ও তাদের মুখে চুন কালি পড়ে এবং যারা অপবাদ দেয় বা এ অপবাদের অপপ্রচারের অংশ নেয়, তাদেরকে অপবাদের শাস্তি ভোগ করতে হয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ

নিশ্চয়ই যারা অপবাদের ঝড় তুলেছিল, তারা অন্য কেউ নয়; বরং তোমাদেরই এক শ্রেণী। কেননা, তারাও নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়। তাদেরই কিছু দুরাত্মা সমবেত হয়ে এই বানোয়াট ঘটনাকে প্রচার করতে থাকে, মোনাফেক ব্যতীত যে তিনজন মুসলমান এ অপপ্রচারে শরীক হন, তারা শুধু মোনাফেকদের চাতুর্যের জালেই জড়িয়ে পড়েন, প্রকৃত সত্য বুঝতে তারা অক্ষম হন।

আলোচ্য আয়াতের عصبة শব্দটির অর্থ হলো দল, আর সেই দল হয় দশ থেকে চল্লিশ জনের।

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা -৭১২
তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৭
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৮, পৃষ্ঠা-৪০-৪১
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১০৭-০৮

মুমেন–জননী হযরত আয়েশা (রাঃ) এর অবস্থা

বর্ণিত আছে, উম্মুল মোমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) যখন এ বানোয়াট ঘটনা শ্রবণ করলেন, তখন তাঁর বিস্ময়ের কোন সীমা রইলনা। তিনি বলেন, আমার উপর যেন দুশ্চিন্তার এক পাহাড় এসে পড়েছে, আমি নিজেকে চরম অসুস্থ উপলব্ধি করলাম, এমন সময় হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম গৃহে তশরিফ আনয়ন করলেন, তিনি সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার কি অবস্থা? আমি আরজ করলাম, যদি আমাকে অনুমতি দান করেন, তবে আমি একটু আব্বা জানের নিকট যেতে পারি। আমি বাড়ীতে এসে আমার আম্মাজানকে জিজ্ঞাসা করলাম, লোকেরা এসব কি বলছে? তিনি বললেন, এসব মামুলি ব্যাপার। এসব বাজে কথায় তুমি মন খারাপ করোনা, যদি কারো কোন ভাল স্ত্রী থাকে আর সে স্ত্রী স্বামীর প্রিয় হয়, আর সে স্ত্রীলোকটির সতীনও থাকে, তবে এমন কথাবার্তা হওয়া অতি স্বাভাবিক। আমি বললাম, সোবহানাল্লাহ! লোকেরা কি আমার সম্পর্কে এমন গুজব রটায়! এরপর আমার কান্না এসে গেল। মনের দুঃখে, ব্যথায়, ক্ষোভে আমি কাঁদতে থাকলাম, যথারীতি পানাহার করাও সম্ভব হলোনা। দিবা–রাত্রি এভাবেই অতিবাহিত হতে লাগল। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এখনো কোন ওহী নাজিল হয়নি। এমন সময় হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত উসামা এবনে জায়েদ (রাঃ)–কে ডাকলেন এবং তাঁদের সংগে এ সম্পর্কে কথা বললেন। হযরত উসামা (রা) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা আপনার পরিবার সম্পর্কে কোন মন্দ কথা জানিনা, আমাদের অন্তর তাঁর সম্মান, মর্যাদা এবং শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ, আর এর উপর সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে উপস্থিত। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আপনার প্রতি কোন সংকীর্ণতা বা অসুবিধা রাখা হয়নি, তিনি ব্যতীত আপনার আরো স্ত্রী রয়েছেন, এ সম্পর্কে আপনি গৃহের পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, এমন অবস্থায় সত্য প্রকাশ পেতে পারে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখনই গৃহ পরিচারিকা হযরত বোরায়রা (রাঃ)–কে ডাকেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে আয়েশার ব্যাপারে সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করেছ কি? হযরত রোরায়রা (রাঃ) বললেন, সেই আল্লাহ পাকের শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন, আমি তাঁর মধ্যে এমন কিছু দেখেনি। শুধু এতটুকু যে বয়স কম হওয়ার কারণে এমন হয় যে তিনি রুটির জন্যে আটা তৈরী করে রাখেন আর ঘুমিয়ে পড়েন। এরই মধ্যে বকরী এসে তা খেয়েও ফেলে। এছাড়া আমি তাঁর মধ্যে কোন দোষ লক্ষ্য করিনি। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মিম্বরে দন্ডায়মান হয়ে এরশাদ করেনঃ কে আছে যে আমাকে এই ব্যক্তির কষ্টদায়ক আচরণ থেকে রক্ষা

করবে? সে আমাকে কষ্ট দিতে দিতে এখন আমার স্ত্রী সম্পর্কেও কষ্ট দেয়া আরম্ভ করেছে। আল্লাহর শপথ! আমি জানি যে আমার স্ত্রীদের মধ্যে কল্যাণ ব্যতীত আর কিছুই নেই। একথা শ্রবণ করে হযরত সাদ এববে মাআজ (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, যদি সে আমাদের আওস গোত্রের হয়, তবে এখনই আমরা তাকে মৃত্যুদন্ড দেব। আর যদি সে খাজরাজ গোত্রের লোক হয়, তবে আপনি হুকুম করুন, আপনার হুকুম পালনে কারোই কোন আপত্তি থাকবে না। উম্মুন মোমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এ–তো ছিল সেখানের কথা, এদিকে আমার অবস্থা ছিল এই, দিন–রাত কান্নাকাটি করা ছাড়া আমার কোন কাজ ছিলনা। এ অবস্থায় সুদীর্ঘ একটি মাস অতিবাহিত হয়েছে। এদিকে আমার আব্বা–আম্মাও আমার ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যাথিত এবং চিন্তিত থাকতেন। একদিন একজন আনসারী মহিলা আমার নিকট আসলেন, আমাকে ক্রন্দণ করতে দেখে তিনিও ক্রন্দণ করতে লাগলেন। এমন সময় হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার গৃহে আগমন করলেন এবং সালাম দিয়ে আমার কাছে বসলেন অথচ যখন থেকে এই ভিত্তিহীন গুজব রটেছে, তিনি কখনও আমার কাছে বসেননি। এদিকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে কোন ওহী আসেনি যার ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত হতে পারে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসন গ্রহণ করেই সর্ব প্রথম তাশাহহুদ পাঠ করলেন এবং এরশাদ করলেন, হে আয়েশা! তোমার সম্পর্কে আমার নিকট এসব খবর এসেছে, যদি তুমি পবিত্র হও, তবে আল্লাহ পাক অবশ্যই তোমার পবিত্রতার কথা ঘোষণা করবেন, কিন্তু যদি সত্যিই তুমি কোন পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে থাক, তবে আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তওবা কর। কোন বান্দা দ্বারা যদি কখনো কোন গুণাহ হয়, যদি সে গুণাহর কথা মনে করে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয় তবে আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করেন।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এসব কথা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্রন্দণ বন্ধ হয়ে গেল। আমার নয়ন যুগলের অশ্রু যেন শুকিয়ে গেল। আমি সর্ব প্রথম আমার আব্বাজানের নিকট আবেদন করলাম যে, আমার পক্ষ থেকে তিনি যেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জবাব দেন। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আমি কি জবাব দেব? এরপর আমি আমার আম্মাজানের দিকে নজর করলাম এবং তাঁকে বললাম, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জবাব দিন, তিনিও একই কথা বললেন। এরপর আমি নিজেই এভাবে তাঁর জবাব দেয়া আরম্ভ করলাম।

আমার বয়স তেমন হয়নি আর পবিত্র কোরআনও আমি অনেক বেশী কণ্ঠস্থ করিনি।

আপনারা একটা কথা শ্রবণ করেছেন, আর তাকে যেন সত্য মনে করে বসেছেন, যদি আমি বলি যে আমি সম্পূর্ণ পবিত্র, আর আল্লাহ পাক জানেন যে আমি অবশ্যই পবিত্র, তবে আপনারা আমার কথা মানবেন না, আর যদি আমি কোন বিষয়ের স্বীকৃতি দেই, আর আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত যে আমি নিস্পাপ, তখন কিন্তু আপনারা মেনে নেবেন। আমার এবং আপনাদের দৃষ্টান্ত হলো এরূপই যেমন হযরত ইউসুফ (আঃ)–এর পিতা ইয়াকুব (আঃ) বলেছিলেন, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ

"তাই আমার জন্যে সবরই উত্তম, যাতে কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না থাকে। আল্লাহ পাক আমাকে সাহায্য করুন।" একথা বলে আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, যেহেতু আমি পবিত্র, তাই আল্লাহ পাক অবশ্যই আমার পবিত্রতার কথা তাঁর রসূলকে জানিয়ে দেবেন। তবে আমার সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাজিল হবে তা আমি কল্পনা করিনি। আমি নিজেকে এর উপযুক্ত মনে করিনি, আমার ধারণা ছিল, হয়তো স্বপ্নযোগে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আমার পবিত্রতার কথা জানিয়ে দেবেন। ঠিক এমন সময় যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর স্থান ত্যাগ করেননি এবং বাড়ীর কোন লোকও সরে যাননি, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ওহী নাজিল হওয়া আরম্ভ হল আর তাঁর চেহারায় ঐ অবস্থা প্রকাশিত হল যা ওহী নাজিল হওয়ার সময় হয়ে থাকে। তাঁর ললাট মোবারক থেকে ঘাম নিঃসৃত হচ্ছিল। প্রচন্ড শীতের সময়ও ওহী নাজিল হলে তিনি ঘর্মাক্ত হয়ে যেতেন।

যাহোক, যখন ওহী নাজিল হওয়া সমাপ্ত হল তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকে অত্যন্ত আনন্দের ভাব প্রকাশিত হল এবং তিনি সর্ব প্রথম আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, আয়েশা আনন্দিত হও, আল্লাহ পাক তোমার পবিত্রতার কথা ঘোষণা করে আয়াত নাজিল করেছেন, আর তখন আলোচ্য আয়াত থেকে দশ আয়াত পর্যন্ত নাজিল হয় এবং এতে আল্লাহ পাক সান্ত্বনা দিয়েছেন এভাবে–

لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

তোমরা এ বিষয়কে নিজেদের ব্যাপারে অকল্যাণকর মনে করোনা; বরং এটি তোমাদের জন্যে উত্তম।

অর্থাৎ এই মর্মান্তিক ঘটনায় তোমরা ব্যথিত, মর্মাহত হয়োনা, এ ঘটনা আপাতঃদৃষ্টিতে যত মর্মান্তিকই হোক না কেন, এতে রয়েছে তোমাদের জন্যে কল্যাণ। কেয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির সম্মুখে উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)–এর পবিত্রতা, নিস্কলংকতা চিরভাস্বর হয়ে রইল এবং তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পেল এবং তাঁর মাধ্যমে যে আদেশ জারী হল তা সমগ্র মানব জাতির জন্যে একটি বিধানে পরিণত হল।

উম্মুল মোমিনীন হযরত আয়েশার পবিত্রতা এবং মহিমা সম্বলিত আয়াত সমূহ কেয়ামত পর্যন্ত নামাজে পাঠ করা হবে এবং যারা তাঁর প্রতি অপবাদ দিয়েছে, তাদের শাস্তির কথাও পঠিত হতে থাকবে।

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি যে পরিমাণ গুণাহ করেছে, তাদের প্রত্যেকের জন্যে তাই রয়েছে, আর যে লোকটি এর প্রধান ভূমিকা পালন করেছে তার জন্যে রয়েছে বিরাট শাস্তি। অর্থাৎ এ মহাপাপে এবং অন্যায় প্রচারে যে যতখানি অংশ গ্রহণ করেছে ততখানি শাস্তিই তাকে ভোগ করতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, কেউ অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে মহা আনন্দে এ গুজব রটাতে থাকে। পক্ষান্তরে, কেউ আক্ষেপের সুরে তার প্রচার করে। আর কেউ কোনভাবে বিষয়টিকে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে উথাপন করে তাঁকে কষ্ট দিতে চায়, আর কারো মনে এ সম্পর্কে সন্দেহ জাগে আর কেউ হয়তো কথাটি শ্রবণমাত্র এমন কথা হতে পারেনা বলে তা উড়িয়ে দেয়। আর কোন কোন লোক একথাটি শ্রবণ করে মুচকি হাসল, মুখে কিছু বললনা। আর কেউ হয়তো এ কথাটি শ্রবণ করে নীরব রইল, নিজে কোন কথা বলল না।

যাহোক, যে যতখানি গুণাহ করে তার শাস্তিও হবে ততখানি।

وَالَّذِي

আর যে এ অপবাদ প্রচারে মূল হোতার ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার জন্যে রয়েছে কঠিন কঠোর শাস্তি। অর্থাৎ যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শত্রুতায় অপবাদের এ ঝড় তুলেছে, তার শাস্তি হবে চরম কঠিন।

জহুরী লিখেছেনঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, ঐ ব্যক্তি হল আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুল, তার জন্যে রয়েছে দোজখের কঠিন শাস্তি।১

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৮, পৃষ্ঠা –৩০০

لولا
إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنت بأنفسهم خيرا وقالوا
هذا إفك مبين ﴿١٢﴾ لولا جاءو عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا
بالشهداء فأولئك عند الله هم الكذبون ﴿١٣﴾ ولولا فضل الله
عليكم ورحمته في الدنيا والأخرة لمسكم في ما أفضتم فيه
عذاب عظيم ﴿١٤﴾ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما
ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ﴿١٥﴾ و
لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحنك
هذا بهتان عظيم ﴿١٦﴾ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن
كنتم مؤمنين ﴿١٧﴾ ويبين الله لكم الأيت والله عليم حكيم ﴿١٨﴾

তরজমা

(১২) যখনই তোমরা তা শ্রবণ করেছিলে তখনই কেন মোমেন নর–নারী মাত্রই নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করেনি এবং একথা বলে ওঠেনি যে এটি নির্জলা মিথ্যা অপবাদ।

(১৩) তারা কেন এ ব্যাপারে চারটি সাক্ষী পেশ করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে পারেনি তাই আল্লাহ পাকের নিকট তারা নিজেরাই মিথ্যাবাদী।

(১৪) যদি দুনিয়া এবং আখেরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত তবে এ অপপ্রচারের কারণে তোমাদের উপর কোন কঠিন শাস্তি আপতিত হতো।

(১৫) যখন তোমরা তা মুখে মুখে ছড়িয়ে ছিলে এবং এমন বিষয় তোমরা মুখে উচ্চারণ করেছিলে যার কোন জ্ঞানই তোমাদের ছিলনা। তোমরা বিষয়টিকে মামুলি মনে করছিলে, অথচ আল্লাহ পাকের নিকট তা ছিল অত্যন্ত গুরুতর বিষয়।

(১৬) আর যখন তোমরা একথা শুনেছিলে, তখন কেন বললেনা যে আমাদের মুখে এমন কথা শোভা পায়না। আল্লাহ্ পবিত্র মহান তুমি, এ–তো এক গুরুতর অপবাদ।

(১৭) আল্লাহ পাক তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যদি তোমরা সত্যিকার মুমেন হও তবে আর কখনো অনুরুপ আচরণ করোনা।

(১৮) আর আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে তাঁর আয়াত সমূহকে সুস্পষ্ট ভাবেই বর্ণনা করেন। আল্লাহ পাক সব কিছু জানেন, তিনি প্রজ্ঞাময়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে মোমেন–জননী হযরত আয়েশা (রাঃ)–এর সম্পর্কে যে মোনাফেকরা অপবাদ দিয়েছে, তাদের কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে যে সব মুমেনগণ এ ভিত্তিহীন, বানোয়াট, জঘন্য মিথ্যা কথা শ্রবণ করে বিশ্বাস করেছেন, অথবা এ সম্পর্কে নীরব রয়েছেন, তাদের উদ্দেশ্যে বিশেষ উপদেশ রয়েছে এবং মুসলমানদের পরস্পরের সম্পর্কের একটি দিক–নির্দেশনাও এতে রয়েছে।

মুসলমান মাত্রকে অন্য মুসলমান সম্পর্কে সৎ ও মহৎ ধারণা রাখতে হবে যে পর্যন্ত না শরীয়ত সম্মত প্রমাণ দ্বারা কোন অপরাধের কথা সাব্যস্ত না হয় সে পর্যন্ত কারো সম্পর্কে কোন প্রকার অপবাদ রটানোর অনুমতি নেই। যদি কারো সম্পর্কে এমন কোন কথা প্রচারিত হয়, যার প্রমাণ মুসলমানদের নিকট না থাকে, তবে এ সম্পর্কে নীরবতা পালন নয়; বরং জোর প্রতিবাদ করা মুসলমান মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

لَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا

যখনই তোমরা তা শ্রবণ করেছিলে তখনই কেন মোমেন নর–নারী মাত্রই নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করেনি এবং একথা বলে ওঠেনি যে এটি নির্জলা মিথ্যা অপবাদ।

অর্থাৎ যখনই মোনাফেকরা উম্মুল মোমিনীন সম্পর্কে এ জঘন্য মিথ্যা কথা রটায়, তখন মোমেনদের যে কর্তব্য ছিল, তারা যথা সময়ে কেন তা পালন করেনি, তাদের কর্তব্য ছিল অন্য মোমেন সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখা। নিজের সম্পর্কে যেমন মানুষ সঠিক এবং সুস্পষ্ট ধারণা রাখে, ঠিক তেমনিভাবে অন্য মোমেন সম্পর্কেও

উত্তম ধারণা রাখা মোমেনদের কর্তব্য। প্রত্যেকে নিজের ব্যাপারে এমন ঘটনা ঘটলে যেমন প্রতিবাদ মুখর হয়, তেমনি ভাবে অন্য মোমেনের ব্যাপারেও এমন বাজে কথা রটানো হলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা প্রত্যেকেরই একান্ত কর্তব্য, আর সুস্পষ্ট ভাষায় একথা জানিয়ে দেয়া যে এসব নির্জলা মিথ্যা, এসব কথায় কর্ণপাত করা মুসলমানদের শানের খেলাফ।

মোমেন-জননী হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর পবিত্রতা প্রশ্নাতীত, কেননা তিনি আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের স্ত্রী। আর যে এই মিথ্যা কথা রটায় সে হলো মোনাফেকদের দলপতি, মদীনা মোনাওয়ারায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সব চেয়ে বড় শত্রু আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুল। অতএব, আল্লাহর রসূলের দুশমনের পক্ষ থেকে রটানো এ মিথ্যের প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়া প্রত্যেকেরই একান্ত করণীয় কাজ ছিল। যেমন হযরত আবু আইউব খালেদ এবনে জায়েদ আনসারী (রাঃ)-এর স্ত্রী উম্মে আইয়ুব (রাঃ) তাঁকে বলেছিলেন, আপনি কি শুনেছেন হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে কি সব কথা বলা হচ্ছে? তখন তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ শুনেছি, তবে এসব হল জঘন্য মিথ্যা। উম্মে আইয়ুব তুমিই বল, তুমি এমন অন্যায় কাজ করতে পার? তিনি বললেন, নাউজুবিল্লাহ, অসম্ভব। তখন হযরত আবু আইউব বললেনঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) তোমার চেয়ে কোটি কোটি গুণ উত্তম, তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কন্যা, তিনি আল্লাহর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রী, তাঁর পক্ষে এমন কাজ সম্পূর্ণ অকল্পনীয়।১

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মোমেন মাত্রেরই কর্তব্য হল অন্য মোমেনদের সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখা। মোমেনদের সমালোচনা থেকে বিরত থাকা। আর কোন লোক যদি কারো সমালোচনা করে বা কারো সম্পর্কে কোন ভিত্তিহীন কথা-বার্তা রটায়, তবে তার প্রতিবাদ করা, এটিই ঈমানের দাবী, মোমেনের বৈশিষ্ট্য। গীবত বা পরনিন্দা, চোগলখুরি প্রভৃতি থেকে আত্মরক্ষা করা মুসলমান মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য। কেননা, এসব গুণাহর কারণে মানুষ ফাসেক হয়ে যায়। আর ফাসেকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়না।

এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার সাহায্য করে, আল্লাহ পাকও তার অনুপস্থিতিতে তাকে সাহায্য করবেন।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৮, পৃষ্ঠা-৪৬
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১০৭

আত্মরক্ষার পন্থা

বস্তুতঃ সঠিক দলিল প্রমাণ ব্যতীত কারো উপর অপবাদ আরোপ করা সম্পূর্ণ ঈমান বিরোধী কাজ। এসব ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার পথ হলো মানুষ যেন অন্যের মান মর্যাদাকে নিজের মান মর্যাদার ন্যায় মনে করে–অর্থাৎ যার ব্যাপারে অপবাদ আরোপ করা হচ্ছে তার বদলে যদি আমার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করা হতো, তবে যে করণীয় কাজ হয়, তাই অন্যের ক্ষেত্রেও করা, যেমনটি করেছিলেন হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ)। এভাবে মানুষ এমন অন্যায় কাজ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।

এ পর্যায়ে আরো একটি কথা উল্লেখযোগ্য, কাল কেয়ামতের কঠিন দিনে প্রত্যেকটি মানুষকে তার জীবনের যাবতীয় কথা ও কাজের হিসেব দিতে হবে, তখন আমার কি অবস্থা হবে? একথাটি চিন্তা করলেও পরনিন্দা বা পরচর্চার মন্দ অভ্যাস থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। এ প্রসংগে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান কাঙ্গাল কে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, যার অর্থ–সম্পদ নেই, সেই তো কাঙ্গাল। তিনি এরশাদ করলেন, এই কাঙ্গাল নয়, আখেরতের কাঙ্গাল কে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই অবগত। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে তার অনেক নেক আমল থাকবে, সে বেহেস্তের অনুমতি লাভ করবে, কিন্তু এরই মধ্যে তার পানাদার হাজির হবে। কেউ বলবে, হে আল্লাহ! এই ব্যক্তির নিকট আমি অনেক টাকা পাই যা সে পরিশোধ না করেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। কেউ বলবে, এ ব্যক্তি আমার প্রতি জুলুম করেছে। কেউ বলবে, এ ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করেছিল। এমনিভাবে আরো পানাদার হাজির হবে। আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, এ ব্যক্তির সমস্ত নেক আমল তার পানাদারদের মধ্যে বিতরণ করা হোক, তাই করা হবে, কিন্তু ফেরেশতাগণ আরজ করবে, হে পরওয়ারদেগার! এ ব্যক্তির সমস্ত নেক আমল বিতরণ করা হয়েছে কিন্তু তার পানাদার এখনো বাকী। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, পানাদারদের গুণাহর বোঝাগুলো তার উপর চড়িয়ে দাও। এ অবস্থায় ঐ ব্যক্তিকে দোজখে প্রেরণ করা হবে। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ এই ব্যক্তিই হল কেয়ামতের ময়দানের কাঙ্গাল।

বস্তুতঃ মানুষ যখন কেয়ামতের কঠিন দিনের কথা স্মরণ করে, তখন পরচর্চা, পরনিন্দা প্রভৃতি মন্দ কাজ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।

لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿١٣﴾

তারা কেন এ ব্যাপারে চারটি সাক্ষী পেশ করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে পারেনি তাই আল্লাহ পাকের নিকট তারা নিজেরাই মিথ্যাবাদী।

অর্থাৎ শরীয়ত সম্মত নির্ভরযোগ্য চারটি স্বাক্ষী পেশ করতে যারা অক্ষম, তারা যদি কারো প্রতি ব্যাভিচারের অপবাদ আরোপ করে, তবে এর অর্থ হবে যে তারা মুসলমানের বদনাম করতে চায় এবং মুসলমানের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে। এমন অবস্থায় শরীয়তের দৃষ্টিতে তারা নিজেরাই আইনত মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে। তারা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হবে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ আয়াতের عِنْدَ اللّٰهِ (আল্লাহর নিকট) শব্দটির ব্যাখ্যা হল আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত শরীয়তের দৃষ্টিতে তারা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে এবং তাদেরকে অপবাদ আরোপের শাস্তি প্রদান করা হবে। ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহর হুকুমে সে সব লোক মিথ্যাবাদী, যারা হযরত আয়েশা (রাঃ)–এর প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম চার ব্যক্তিকে মিথ্যা অপবাদ আরোপের শাস্তি প্রদান করেন। (১) আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুল (মোনাফেক সর্দার যে এ গুজব রটনা করে) (২) হাস্যান এবনে সাবেত (রাঃ) (৩) মাছতাহ এবনে আছাছা (রাঃ) এবং (৪) হামনা বিনতে জাহাশ (রাঃ) (শেষোক্ত তিনজন মুসলিম মোনাফেকদের রটানো কথায় বিশ্বাস করেছিলেন)।

আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যেহেতু ইসলামী শরীয়ত কারো অপরাধ সাব্যস্ত করার জন্যে চারজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের শর্ত আরোপ করেছে, তাই অপরাধ সাব্যস্ত করার জন্যে চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদান একান্ত জরুরী। যদি কেউ কারো প্রতি ব্যাভিচারের অপবাদ দেয়, আর চারজন সাক্ষী উপস্থিত না করতে পারে, তবে আইনত সে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হবে এবং এমন কথা মুখে আনা অমার্জনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। তাই আলোচ্য আয়াতের عِنْدَ اللّٰهِ শব্দটির তাৎপর্য হলো, আল্লাহ পাকের হুকুমে বা আল্লাহ পাকের আইনে সে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হবে।১

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত–আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–১০৯
তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা –৭১৩

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ

যদি দুনিয়া এবং আখেরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে এ অপপ্রচারের কারণে তোমাদের প্রতি কোন কঠিন শাস্তি আপতিত হত।

অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বরকতে যদি তোমাদের প্রতি করুণাময় আল্লাহ্ পাকের বিশেষ এবং অশেষ দয়া ও অনুগ্রহ না থাকত, তবে তোমরা যে জঘন্য কথা বলেছ, তার কারণে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের আযাব আপতিত হত। শুধু আল্লাহ্ পাকের তওফিকে, তাঁর দয়ায় তিনি তোমাদেরকে মাফ করেছেন, তিনি তোমাদেরকে ইসলাম গ্রহণের তৌফিক দান করেছেন এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভের তৌফিক তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন। যে কারণে তোমরা আল্লাহ্ পাকের গজবে নিপতিত হওনি। দুনিয়াতে ইতিপুর্বে আদ জাতি, সামুদ জাতি লুত (আঃ)–এর সম্প্রদায় এবং হযরত শোয়ায়েব (আঃ)–এর সম্প্রদায় তাদের অন্যায় অনাচারের কারণে আল্লাহ্র গজবে পতিত হয়েছে এবং পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্র প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বরকতে, তাঁর সৌজন্যে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন।

বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ পাকের দরবারে উম্মতের জন্যে তিনটি দোয়া করেছিলেন।

(১) হে আল্লাহ্! আমার উম্মতকে তাদের গুণাহ্র কারণে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিওনা। যেমন আদ, সামুদ জাতিকে ধ্বংস করেছ। আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ দোয়া কবুল করেছেন।

(২) হে আল্লাহ্! পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মত আমার উম্মতকে শুকর বানরে পরিণত করোনা। আল্লাহ্ পাক এ দোয়াও কবুল করেছেন।

(৩) হে আল্লাহ্! আমার উম্মতে যেন মারামারি, খুন খারাবি না হয়। এ দোয়া কবুল হয়নি।

যাহোক, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে মুসলমানগণ! আল্লাহ্র নবীর কারণে যদি তোমাদের প্রতি দয়া ও রহমত না হত, তবে তোমরা কোপগ্রস্ত হতে, আসমানী গজবে পতিত হতে, কেননা, তোমরা এমন অন্যায় আচরণ করেছ যা আসমানী গজবের কারণ হয়।

তফসীরকারগণ লিখেছেনঃ এ আয়াতে সেই মোমেনদেরকেই বিশেষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে, যাঁরা এ গুজবে বিশ্বাস করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা প্রকৃত মোমেন

ছিলেন, মোনাফেক ছিলেন না। আর وَالَّذِىْ تَوَلّٰى আয়াত খানি মোনাফেক নেতা আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুলের উদ্দেশ্যে নাজিল হয়েছে।১

اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا

যখন তোমরা তা মুখে মুখে ছড়িয়েছিলে এবং এমন বিষয় তোমরা মুখে উচচারণ করেছিলে যার কোন জ্ঞানই তোমাদের ছিলনা, তোমরা বিষয়টিকে মামুলি মনে করেছিলে অথচ আল্লাহ পাকের নিকট তা ছিল অত্যন্ত গুরুতর বিষয়।

অর্থাৎ মোনাফেকদের তরফ থেকে উম্মুল মোমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অপবাদের যে ঝড় তোলা হয়েছিল, হে মোমেনগণ! তোমরাও তা মুখে মুখে বলাবলি করে প্রচার করছিলে, তোমরা ভেবেছিলে এর কোন গুরুত্ব নেই, এটি একটি মামুলী ব্যাপার।

তফসীরকার কালবী (রঃ) বলেছেন, তখন অবস্থা ছিল এই যে, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির সংগে দেখা হলে একজন আরেকজনকে বলতো, এমন খবর পেয়েছি, একি হতে পারে?

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, তখন এ ঘটনা একজন আরেক জনের নিকট বর্ণনা করত। সাধারণ ভাবে এ বিষয়টি আলোচনা করা হত, অথচ বিষয়টি মামুলি ছিলনা, তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ۝١٥

তা আল্লাহ পাকের নিকট ছিল অত্যন্ত গুরুতর, মহাপাপ এবং যে কোন সময় তার পরিণতিতে আসমানীগজব আসতে পারত কেননা; কোন সতী সাধ্বী নারীর প্রতি ব্যাভিচারের অপবাদ দেয়া অত্যন্ত বড় গুণাহ। তদুপরি স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিনীর প্রতি এমন অপবাদ দেয়া কত বড় জঘন্য মহাপাপ এবং তার পরিণতি কত ভয়াবহ, একথা চিন্তা করতেও ভয় হয়।

হযরত মাআজ এবনে জবল (রাঃ) বর্ণনা করেন,আমি আরজ করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কোন আমল শিক্ষা দিন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যায় এবং দোজখ থেকে দূরে রাখে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ অত্যন্ত বড় কথা জিজ্ঞাসা করেছ, কিন্তু যার জন্যে আল্লাহ পাক সহজ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -৩০৩-০৪

করেন, তার জন্যে সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ্ পাকের এবাদত কর, কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করোনা, নামায কায়েম করো, যাকাত আদায় করো, রমজানের রোজা রাখ, কা'বা শরীফের হজ্ব কর। অবশেষে তিনি বলেন, আমি কি তোমাকে কল্যাণের পথ বলবনা? মনে রেখ, রোজা আল্লাহর আযাব থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ঢাল স্বরূপ। দান খয়রাত পাপাচারের অগ্নিকে এভাবে নিভিয়ে দেয় যেমন পানি অগ্নিকে। আর মধ্যরাতে নামাজ আদায় করাও গুনাহর অগ্নিকে নিভিয়ে দেয়। এরপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করেন।

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ.

(অর্থাৎ নেককার বান্দাদের পাঁজর বিছানা থেকে দূরে থাকে। কেননা, তাঁরা সারা রাত আল্লাহ্ পাকের বন্দেগীতে মশগুল থাকেন) এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি কি তোমাদের দ্বীনি বিষয়ের মাথা, খুঁটি এবং পাঁজরের কথা বলবো না, ইসলাম হলো তার মাথা, নামাজ হলো তার খুঁটি আর জেহাদ হলো তার পাঁজর।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আমি কি তোমাকে সে কথা বলবো না যার উপর সব কিছু নির্ভর করে। আমি আরজ করলাম, অবশ্যই এরশাদ করুন। তখন তিনি নিজের রসনা স্পর্শ করে এরশাদ করলেন, এই জিনিষটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখ। আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রসূল! কথা বলার উপরও কি আমাদের শাস্তি হবে? তিনি এরশাদ করলেন, মাআজ! তোমার প্রতি তোমার মা রোদন করুক, কথা বলার পরিণতিতেই মানুষকে উল্টোমুখি করে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে।[১]

(আহমদ, তিরমিযী, এবনে মাজা)

এ পর্যায়ে আল্লামা সয়ুতি (রঃ) হযরত হোজায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তেবরানী সংকলিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোন সতী সাধ্বী নারীর উপর ব্যাভিচারের অপবাদ দেয়া একশ' বছরের আমলকে বাতিল করে দেয়।[২]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র সহধর্মিনী সম্পর্কে এমন অন্যায় কথা নিঃসন্দেহে কবীরা গুনাহ। এজন্যেই আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল করে উম্মুল মোমিনীন হযরত আয়েশার (রাঃ) পবিত্রতার কথা ঘোষণা করেছেন। প্রত্যেক নবীর স্ত্রীকে আল্লাহ পাক এমন অন্যায়-অশ্লীল কাজ থেকে পবিত্র রেখেছেন, আর যিনি নবীগণের দলপতি, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল, সর্বোত্তম সৃষ্টি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে এমন কথা সম্পূর্ণ কল্পনাতীত। কাজেই তোমরা যে কথাকে অত্যন্ত মামুলি মনে করেছিলে, তা

---

[১]। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩০৪-০৫

[২]। তফসীরে আদ্‌দুররুল মানসুর-খন্ড-৫, পৃষ্ঠ-২৭

আদৌ মামুলি নয়; বরং এমন কথা অত্যন্ত ভয়ংকর এবং ভয়াবহ পরিণতির কারণ হতে পারে।[১]

আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) এ পর্যায়ে লিখেছেন, কোন নবীর স্ত্রী কাফের হতে পারে, যেমন হযরত নূহ (আঃ) এবং হযরত লুত (আঃ)-এর স্ত্রী কাফের ছিল, কিন্তু কোন নবীর স্ত্রী ফাজের বা অসতী হতে পারে না। কখনো তা সম্ভব নয়। হযরত আব্দুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এজন্যে বলেছেন–

مابغت امرأة نبى قط

কখনো কোন নবীর স্ত্রী অশ্লীল কাজ করেননি, আল্লাহ পাক সর্বদা তাঁর নবীগণের সম্মানের হেফাজত করেছেন। যারা কোন নবীর স্ত্রী সম্পর্কে এমন অন্যায় কথা বলে তার নিঃসন্দেহে মহাপাপী, তাদের শাস্তি অবধারিত।

মোনাফেকরা যখন এ মিথ্যা কথা রটনা করে, মুসলমানদের তখন কর্তব্য ছিল তারা প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়া এবং এ অন্যায়কে প্রতিরোধ করা। এজন্যে পরবর্তী আয়াতে এ পর্যায়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ.

আর যখন তোমরা একথা শুনেছিলে তখন কেন বললে না যে, আমাদের মুখে এমন কথা শোভা পায় না আল্লাহ তুমি পবিত্র, মহান, এ হল এক গুরুতর অপবাদ।

অর্থাৎ এমন ঘৃণ্য কুৎসিত ধারণাকে প্রশ্রয় দেয়াই অনুচিত হয়েছে। হে মোমেনগণ! .তামরা যখন মোনাফেকদের নিকট এসব জঘন্য কথা শুনেছিলে, তখনই কেন তাদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেনা যে এমন জঘন্য কথা উচ্চারণ করাই আমাদের জন্যে শোভনীয় নয়।

আলোচ্য আয়াতের مَا يَكُوْنُ لَنَا শব্দটির অর্থ হলো হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কন্যা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সহধর্মিনী সম্পর্কে এমন জঘন্য মিথ্যা কথা বলা কোন মোমেনের পক্ষে সম্ভবই নয়।

سُبْحٰنَكَ

হে আল্লাহ! তুমি মহান, তুমি পবিত্র তোমার নবীর স্ত্রী এমন হতেই পারেন না। যিনি সমগ্র মানব জাতির জন্যে একমাত্র আদর্শ, তাঁর গৃহে এমন কাজ শুধু যে অসম্ভব তাই নয়; বরং অচিন্তনীয়ও বটে।

هٰذَا بُهْتَانٌ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৮, পৃষ্ঠা-৪৭

অর্থাৎ এটি এমন একটি জঘন্য মিথ্যা কথা যা মোনাফেকরা রটনা করেছে, কিন্তু যে প্রকৃত মোমেন সে এমন অবান্তর কথা উচ্চারণও করতে পারেনা।

يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖۤ اَبَدًا.

আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, আর কখনো পুনরায় এমন আচরণ করোনা। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক এমন গর্হিত কাজের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করেছেন এবং তাঁর আযাবের কথা তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

যদি তোমরা প্রকৃত মোমেন হও, তবে এমন আচরণ কখনো করবে না এবং আল্লাহ্ পাকের উপদেশ মেনে চলবে। জেনে রেখ, এমন আচরণ সম্পূর্ণ ঈমান বিরোধী কাজ।

وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ.

আর আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্যে তাঁর নিদর্শন সমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, তাঁর বিধি-নিষেধ ঘোষণা করছেন এবং দ্বীন ইসলামের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিচ্ছেন। আর এ সম্পর্কেও তোমাদেরকে অবগত করছেন যে এই অপবাদের ঝড়ের মূল উৎস কোথায়? কোন্ দুরাত্মা এই মিথ্যা কথা রটায় এবং ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে কে এই ষড়যন্ত্র করে, এসব কিছুই আল্লাহ্ পাক জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিয়েছেন।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

আর আল্লাহ্ পাক সর্বজ্ঞ, সব কিছুই তাঁর নখদর্পণে কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই। তিনি উম্মুল মোমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর পবিত্রতা সম্পর্কে অবগত এবং মোনাফেকদের ষড়যন্ত্র ও মিথ্যাবাদিতা সম্পর্কেও ওয়াকেফহাল। আর তিনি বিজ্ঞানময়, তাঁর প্রতিটি কাজ হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ, তাঁর কৌশল সূক্ষ্ম, সব কিছুর রহস্য সম্পর্কে তিনি অবগত, তাঁর কোন কাজই অযৌক্তিক নয়।

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ۙ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ
رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ
بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا
زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

তরজমা

(১৯) নিশ্চয় যারা মোমেনদের মধ্যে ব্যাভিচারের চর্চা করতে চায়, তাদের জন্যে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে আর আল্লাহ পাক সবই জানেন, তিনি প্রজ্ঞাময়।

(২০) যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের দয়া এবং অনুগ্রহ না থাকত তবে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেতনা। আর আল্লাহ পাক অত্যন্ত দয়াবান, পরম দয়ালু।

(২১) হে মোমেনগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করোনা, কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শয়তানতো অশ্লীল ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের দয়া ও রহমত না থাকলে তোমাদের কেউ কখনো পবিত্র হতে পারত না। তবে আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে পবিত্র করে থাকেন এবং আল্লাহ পাক সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে উম্মুল মোমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ব্যাপারে যে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়েছিল, তার বিবরণ এবং শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

আর আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ

নিশ্চয় যারা সমাজে ব্যাভিচারের ন্যায় অশ্লীল কাজের প্রচার-প্রসারে অংশগ্রহণ করে বা এমন মন্দ কথার প্রচার কামনা করে তাদের জন্যে فِي الدُّنْيَا দুনিয়াতে শাস্তি রয়েছে আর তা হলো আশিটি বেত্রাঘাত।

وَالْآخِرَةِ

আর শুধু দুনিয়ার এ শাস্তিই যথেষ্ট নয়; বরং তাদেরকে আখেরাতেও শাস্তি দেয়া হবে আর তা হবে দোজখের শাস্তি।

وَاللَّهُ يَعْلَمُ

আর আল্লাহ পাক জানেন কার অন্তরের গোপনতম প্রকোষ্ঠে কি কথা আছে, কার নিয়্যত সঠিক এবং কার নিয়্যত মন্দ। কে কি উদ্দেশ্যে এই মন্দ কথার প্রচার করে এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত।

وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

আর হে লোক সকল। তোমরা জাননা অর্থাৎ কে কোন্ উদ্দেশ্যে এই মিথ্যা রটনায় অংশ গ্রহণ করেছে তা তোমরা জাননা। অতএব, তোমাদের কর্তব্য হলো শরীয়তের বিধানের উপর আমল করা। যদি কারো বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের অভিযোগ করা হয় তবে তার প্রমাণ স্বরূপ শরীয়ত মোতাবেক চারজন সাক্ষী উপস্থিত করা, যদি সে যথারীতি চারজন সাক্ষী হাজির করে তবে তার সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখ যে সে শরীয়তের বিধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই এ অভিযোগ করেছে। কোন মুসলমানের মান হানির উদ্দেশ্যে নয়; বরং আল্লাহ পাকের বিধান কায়েম করার উদ্দেশ্যেই সে এ কাজ করেছে। পক্ষান্তরে, যদি শরীয়ত মোতাবেক চারজন সাক্ষী সে উপস্থিত না করে, তবে আল্লাহ পাকের বিধান মোতাবেক অপরাধের শাস্তি হবেনা, একথা জানা সত্ত্বেও মুসলমানকে অপমানিত করার লক্ষ্যেই সে কারো প্রতি ব্যাভিচারের অপবাদ আরোপ করেছে, তাই তার জন্যে আশিটি বেত্রাঘাতের শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে ব্যাভিচারের তথা অশ্লীল কাজের প্রচার করার ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে এবং প্রত্যেককে সতর্ক হওয়ার তাগিদ করা হয়েছে। এ মর্মে যে, যদি সে শরীয়ত মোতাবেক দলীল-প্রমাণ ব্যতীত কারো প্রতি ব্যাভিচারের অভিযোগ করে তবে এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হবে যে তার উদ্দেশ্য হলো কোন মুসলমানকে অপমানিত করা।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের বর্ণনা শৈলীর দ্বারা এ ব্যাপারে সতর্ক বাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, অন্যের মান সম্মান বিনষ্ট করতে যেয়োনা, কারো বিরুদ্ধে অপপ্রচারে অংশগ্রহণ করোনা, যদি তা কর তবে একথা নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ যে, তোমার নিজের সম্মানও নিরাপদ থাকবেনা। এজন্যে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যে ব্যক্তি কারো সম্পর্কে এমন কথা শ্রবণ করে তার কর্তব্য হলো এমন মন্দ কথার প্রচার না করা। যদি তা শরীয়ত মোতাবেক প্রমাণিত না হয়, তবে তাকে অপবাদের শাস্তি দেয়া হবে আর আখেরাতে দোজখের শাস্তিও হবে। হাদীস শরীফেও এ সম্পর্কে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সয়ুতি (রঃ) এবনে আবি হাতেমের সূত্রে আতা (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যে ব্যক্তি অশ্লীল কাজের কথা প্রচার করে বেড়ায়, তাকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে যদিও সে সত্যবাদী হয়। ইমাম বোখারী (রঃ) এবং বায়হাকী (র.) হযরত আলী (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, অশ্লীল কাজে লিপ্ত ব্যক্তি এবং অশ্লীল কাজের প্রচারে লিপ্ত ব্যক্তি পাপকার্যে সমান।[২]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন যে, এ আয়াত দ্বারা মুসলমানদের মানহানি না করার প্রতি বিশেষ তাগিদ করা হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.

"প্রকৃত মুসলমান সে ব্যক্তিই, যে অন্য মুসলমানকে তার কথা ও আচরণ দ্বারা কষ্ট দেয় না"।

অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে কোন মোমেন বান্দার দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোন বান্দা সে পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারেনা যে পর্যন্ত সে নিজের জন্যে যা পছন্দ করে, তা তার মুসলিম ভ্রাতার জন্যে পছন্দ না করে।

ইমাম রাজী (রঃ) একথাও লিখেছেনঃ যেহেতু মোনাফেকরা এ ঘটনা দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিতে চেয়েছে, তাই তাদের জন্যে দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জাহানের আযাবের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা, যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়ার ইচ্ছা করে সে কাফের, আর কাফেরদের আযাব অবধারিত। তাদের দুনিয়ার শাস্তি স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের

---

[১]। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩০৭-০৮
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৮, পৃষ্ঠা-২৮

[২]। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৭

হাতেই হয়েছে, আর তাদের পরকালীন শাস্তি কবরের আযাব এবং দোজখের আযাব অবধারিত।[১]

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহ না থাকত তবে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেতনা। আর আল্লাহ পাক অত্যন্ত দয়াবান, তিনি পরম দয়ালু।

এ আয়াতে বিশেষ করে তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যারা প্রকৃত মুসলমান তবে তাঁরা মোনাফেকদের রটানো গুজবে বিশ্বাস করেছিলেন। যেমন হযরত হাস্যান এবনে সাবেত (রাঃ), মাছতাহ (রাঃ) এবং হামনা বিনতে জাহাশ (রাঃ)। এরশাদ হয়েছেঃ যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের অসাধারণ দয়া না থাকত, তবে তোমাদের উপর এমন ভয়াবহ আযাব নাজিল হত যা তোমাদের মূলোৎপাটন করে দিত। আর আখেরাতেও তোমাদের কঠিন শাস্তি হত। যেহেতু আল্লাহ পাক অত্যন্ত দয়াবান, তিনি করুণাময়, তাই তিনি তোমাদেরকে এ মহাবিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। যারা তওবা করে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছে, আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। আর কোন কোন লোককে অপবাদের শরীয়ত ঘোষিত শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্র করেছেন। যারা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এই অপবাদ রটায়, তাদেরকেও আত্মসংশোধনের এবং তওবা করার সুযোগ দেয়া হয়েছে।

তফসীরকারগণ বলেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ

আয়াত দ্বারা এ অপবাদের ঝড়ের হোতা মোনাফেক নেতা আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুলকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে আর তার শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ অর্থাৎ তাদের জন্যে দুনিয়াতে বেত্রাঘাতের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে আর আখেরাতে দোজখের চিরস্থায়ী শাস্তি অপেক্ষা করছে। আর আলোচ্য আয়াত দ্বারা সে সব মোমেনদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা আবদুল্লাহ এবনে উবাই দ্বারা প্রতারিত হয়ে এ অন্যায় কথাকে বিশ্বাস করেছিলেন।

শয়তানের অনুগামী হয়োনা

এরপর মোমেনদেরকে সম্বোধন করে বিশেষভাবে শয়তানের অনুগামী না হওয়ার তাগিদ করা হয়েছে।[২]

এরশাদ হয়েছেঃ

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-১৮৩

২। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-১৮৪

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟

অর্থাৎ হে মোমেনগণ! তোমরা শয়তানের অনুগামী হয়োনা, তার চক্রান্ত থেকে সর্বদা সতর্ক থাক। আর যে শয়তানের অনুগামী হয়, তার ধ্বংস অনিবার্য। কেননা, শয়তান সর্বদা অন্যায় অশ্লীল কাজের প্ররোচনা দেয়। অতএব, কেউ যেন শয়তানের ফাঁদে না পড়ে। সর্বদা শয়তানের প্রতারণা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করা প্রত্যেকেরই একান্ত কর্তব্য। মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী তথা পাপ কার্য শুধুমাত্র শয়তানের অনুগমন ছাড়া আর কিছুই নয়।

এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমি অমুক জিনিষ খাওয়ার শপথ করেছি। তিনি বললেন, এটি হলো নিতান্ত শয়তানের ধোঁকা। অতএব, তুমি শপথের কাফ্ফারা আদায় কর।

এক ব্যক্তি ইমাম শা'বী (রহঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমি আমার পুত্র সন্তানকে জবেহ্ করার মানত করেছি। তিনি বললেন, এটি হলো শয়তানের ধোঁকা, তুমি খবরদার এমন কাজ করবেনা আর এর বদলে একটি দুম্বা জবেহ্ কর।

আবু রাফে (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার বেশ ঝগড়া হয়। সে রাগান্বিত হয়ে বলে যদি তুমি আমাকে তালাক না দাও, তবে আমি একদিন ইহুদী একদিন খৃষ্টান হবো এবং আমার সমস্ত গোলাম বাদী আযাদ হয়ে যাবে।

আমি হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে ওমর (রাঃ)-এর নিকট এ সম্পর্কে মাসআলা জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, এটি হলো শয়তানী কাজ। জয়নব বিনতে উম্মে সালামা তদানীন্তন কালে দ্বীনি ব্যাপারে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনিও অনুরূপ ফতোয়া দিলেন। আর আসেম এবনে ওমর (রাঃ) একই কথা বলেছেন। এরপর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন, যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ না হতো তবে তোমাদের কেউই মন্দ কাজ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারতে না। এটি শুধু আল্লাহ্ পাকের বিশেষ দান যে তিনি তোমাদেরকে তওবা করার তওফিক দান করেন এবং তোমাদেরকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করেন।[১]

তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

---

[১] । তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩০৭

অর্থাৎ তোমরা কখনো নিজের শক্তিতে অপবাদের এই ঝড় থেকে আত্মরক্ষা করতে পারতেনা কিন্তু করুণাময় আল্লাহ পাকই তোমাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে এই পাপকার্য থেকে পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্র করেন, তাকে তওবা করার তওফিক দান করেন এবং তার তওবা কবুল করেন। আর আল্লাহ্ পাক সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাত। তিনি সকলের কথা শ্রবণ করেন এবং সকলের নিয়ত সম্পর্কে অবগত রয়েছেন, তোমরা এ ঘটনায় কে কি ভূমিকা পালন করেছ এবং কে কি বলেছ সবই তিনি জানেন। অতএব, তাঁর যাবতীয় নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষা করা প্রত্যেকেরই একান্ত কর্তব্য।

আল্লামা সয়ুতি (রঃ) এবনে জরীর, এবনুল মুনজের এবং এবনে আবি হাতেমের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ্ পাকের মর্জি না হলে কেউ নেক আমল করতে পারতনা এবং কেউ কল্যাণ লাভ করত না।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, ঈমানদারগণকে তওবা করার যে তওফিক প্রদান করা হয় তা শুধু আল্লাহ্ পাকের বিশেষ দয়া ও মেহেরবানীতেই হয়। কোন ব্যক্তি যেন তওবার এ তওফিককে নিজের যোগ্যতার ফলশ্রুতি মনে না করে বরং এটি নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্ পাকের রহমতের উপর।

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ
أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ
أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ
اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾ الْخَبِيثَاتُ
لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

তরজমা

(২২) তোমাদের মধ্যে যারা প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন এই শপথ গ্রহণ না করে যে তারা নিজেদের আত্মীয়-স্বজন, দারিদ্র-প্রপীড়িত, এবং আল্লাহর রাহের মুজাহেদদেরকে কিছু দেবেনা, তাদেরকে তারা যেন ক্ষমা করে এবং তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি পছন্দ কর না যে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ক্ষমা করেন, আল্লাহ পাক অত্যন্ত মার্জনা-প্রিয়, তিনি অতিশয় দয়াবান।

(২৩) নিশ্চয়ই যারা সতী সাধ্বী, সরলমনা মোমেন নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, দুনিয়া ও আখেরাতে তারা অভিশপ্ত, আর তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ংকরআযাব।

(২৪) যেদিন তাদের রসনা, তাদের হাত তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে (তাদের কীর্তিকলাপ প্রকাশ করে দেবে)।

(২৫) সেদিন আল্লাহ পাক তাদেরকে পুরোপুরি ভাবে শাস্তি দেবেন। আর তারা সেদিন জানতে পারবে যে আল্লাহ পাক ধ্রুব সত্য, তিনি সত্য প্রকাশ করে থাকেন।

(২৬) নোংরা নারীরা নোংরা পুরুষদের জন্যে, আর নোংরা পুরুষরা নোংরা নারীদের জন্যে এবং পবিত্র পরিচ্ছন্ন নারীরা পবিত্র পরিচ্ছন্ন পুরুষদের জন্যে। পবিত্র পরিচ্ছন্ন পুরুষরা পবিত্র পরিচ্ছন্ন নারীদের জন্যে। তারা যা কিছু বলে (অপবাদ দেয়) এরা তা থেকে পবিত্র। এদের জন্যে রয়েছে মাগফেরাত এবং সম্মানজনক জীবিকা।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে শয়তানের অনুগামী না হওয়ার তাগিদ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে আত্মীয়-স্বজন বা দারিদ্র প্রপীড়িত মানুষের দ্বারা যদি কোন ভুল ভ্রান্তি হয়ে যায়, তবে তাদেরকে ক্ষমা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

শানে নজুল

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, উম্মুল মোমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সম্পর্কে পুর্বোল্লেখিত ঘটনা যখন ঘটে, তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) শপথ করে বলেছিলেন যে মেসতাহ্ এবনে আসাসাকে আর সাহায্য করব না। মেসতাহ ছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খালাত ভাই। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র, তিনি মোহাজের ছিলেন এবং বদরের যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন তবে উম্মুল মোমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ঘটনায় যে সব সরল প্রাণ মুসলমান মোনাফেকদের চক্রান্ত ও প্রতারণার জালে জড়িয়ে পড়েছিলেন, হযরত মেসতাহ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। আল্লাহ্ পাক যখন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর পবিত্রতার কথা ঘোষণা করলেন, তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর সাহায্য বন্ধ করে দিলেন এবং শপথ করে বললেন যে, আর তাঁকে সাহায্য করবেন না। আল্লাহ্ পাক হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর পবিত্রতা, নিঃস্কলংকতার কথা ঘোষণা করার পর এ ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করলেন যে, যারা মোনাফেকদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে ভুল করেছে, তাদের ভুল ভ্রান্তি মাফ করা এবং তাদের সাহায্য অব্যাহত রাখা সম্পদশালী মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য। তাই এরশাদ হয়েছেঃ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ

তোমাদের মধ্যে যারা সম্পদশালী, তারা যেন আত্মীয়-স্বজন, মিসকিন এবং আল্লাহর রাহের মুজাহেদদেরকে দান খয়রাত না করার শপথ গ্রহণ না করে।

উদারতা মহানুভবতার আদর্শ গ্রহণের নির্দেশ

পবিত্র কোরআন এ পর্যায়ে সম্পদশালী, প্রাচুর্যের অধিকারী মুসলমানদেরকে অধিকতর উদার-চিত্ত হওয়ার এবং মহানুভাবতার আদর্শ গ্রহণের নির্দেশ দেয়। মন্দের জবাবে মন্দ নয়; বরং ভাল ব্যবহারের নির্দেশই দেয় ইসলাম। মক্কার যে কাফেররা সুদীর্ঘ তেরটি বছর যাবত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের উপর অকথ্য নির্যাতন করেছিল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের ঐতিহাসিক দিনে তাদের সকলকে ক্ষমা করেছিলেন। অতএব, ক্ষমা ও ঔদার্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামেরই আদর্শ। চতুর্থ

হিজরীতে জাতুর রেকা যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে একাকী পেয়ে যে ইহুদী তাঁর প্রতি হামলায় উদ্যত হয়েছিল এবং তাঁর প্রাণ নাশের অপচেষ্টা করেছিল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উদারতা ও মহানুভবতার পূর্ণ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে তাকেও ক্ষমা করেছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ মহান আদর্শের বাস্তবায়নের তাগিদই রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

হযরত আবু বকর (রাঃ) মেসতাহ এবনে আসাসার (রাঃ) সাহায্য বন্ধ করার যে শপথ গ্রহণ করেছিলেন, তার প্রেক্ষিতেই এ আয়াত নাজিল হয়েছে এবং সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে উদারতা মহানুভবতার আদর্শ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর একথাও এরশাদ হয়েছেঃ

وليعفوا

অর্থাৎ যদি কারো দ্বারা কোন দোষ-ত্রুটি হয়ে থাকে তবে তা ক্ষমা কর এবং তাদের ভুল-ত্রুটির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করোনা।

أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

তোমরা কি পছন্দ করনা যে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ক্ষমা করুন অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ পাকের যাবতীয় বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করতে পারনা, এতদসত্বেও তোমরা কি চাওনা যে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। যদি তা চাও আর অবশ্যই চাও, তবে তোমাদেরও কর্তব্য হল, যারা তোমাদের নিকট দোষ-ত্রুটির জন্যে ধৃত হয়, তাদেরকে ক্ষমা করা। আল্লাহ পাক অপরাধীদেরকে যে কোন অবস্থায় শাস্তি দিতে সক্ষম, তিনি সর্ব শক্তিমান, তাঁর ক্ষমতা সর্বত্র বিরাজমান, কোন অপরাধীকে শাস্তি প্রদানে কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারেনা,

এতদসত্ত্বেও তিনি পাপীদেরকে ক্ষমা করেন।

অতএব, তোমাদের এ শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে রয়েছে, এ আয়াত নাজিল হবার পর হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যে আমি চাই আল্লাহ্ পাক যেন আমার দোষ-ক্রটি মাফ করে দেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ভাষায়ঃ

بلى يا ربنا انا نحب

হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমরা চাই যেন আমাদেরকে ক্ষমা করুন।

এরপর হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত মেসতাহের (রাঃ) সাহায্য পুনরায় জারী করেন এবং শপথ করেন যে আর কখনো তা বন্ধ করবেন না এবং পূর্বে কৃত শপথের কাফফারা আদায় করেন, দ্বিগুণ করে দেন হযরত মেসতাহ (রাঃ)-কে দেয়া সাহায্যের বরাদ্দ।

হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকারী সে ব্যক্তি নয় যে কারো অন্যায়ের সম পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করে; বরং আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকারী সে ব্যক্তি, যে তোমার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তা পুনঃ প্রতিষ্ঠা কর।[১]

(বোখারী শরীফ)

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে

أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ

বলা হয়েছে

তোমাদের মধ্যে যাদের দ্বীনি ফজিলত এবং মাহাত্ম রয়েছে, তাদের উচ্চ মরতবার দাবী হল এই যে, তারা যেন এমন ঘটনা ঘটলে দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য বন্ধ না করে। তবে এ আদেশ সাধারণ লোকের জন্যে নয়; রবং বিশিষ্ট এবং বিশেষ দ্বীনি মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের জন্যে।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩০৮-০৯

তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৮, পৃষ্ঠা-৪৯

তফসীরে কবীর, খন্ড- ২৩, পৃষ্ঠা-১৮৬

তফসীরে রুহুল মা'আনী, খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-১২৫

এ উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তি

এ আয়াত দ্বারা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর বিশেষ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে কেননা, তাঁকে اولوا الفضل বলা হয়েছে

অর্থাৎ তাঁর বিশেষ দ্বীনি ফজিলত ও মর্যাদা রয়েছে, আর এটি হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর উচ্চ মর্যাদার প্রকৃষ্ট প্রমান।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে উম্মতে মোহাম্মদীয়ার মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)।১

আয়াত সম্পর্কে কয়েকটি কথা

তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ আয়াত দ্বারা একথাও প্রমাণ করেছেন, কোন নেককার পরহেজগার দ্বীনি মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তির দ্বারা যদি কোন ভুল-ভ্রান্তি হয়েও যায়, তবে তার অন্যান্য গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য বাতিল হয়ে যায় না, যেমন আলোচ্য আয়াতে হযরত মেসতাহ (রাঃ)-এর দ্বীনি খেদমত, হিজরত এবং বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ প্রভৃতি এমন গুণাবলী যা আলোচ্য অপবাদের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও পূর্বকৃত নেক আমলের উপর এর কোন প্রভাব পড়েনি।

দ্বিতীয়তঃ এ ঘটনার কারণে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর পবিত্রতার কথা পবিত্র কোরআনের আয়াত দ্বারা ঘোষণা করা হয়েছে যা তাঁর বিশেষ মর্যাদার কারণ হয়েছে। হযরত মরিয়ম (আঃ) ব্যতীত পৃথিবীতে হয়তো আর কারো এ বৈশিষ্ট্য নেই। তৃতীয়তঃ সুফী সাধকগণ এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণ করেছেন যে যদি মুরীদ কোন অন্যায়ও করে তবে তার জন্যে ফয়েজ বন্ধ করা সমীচিন নয়।

আলোচ্য আয়াতে এ শিক্ষাও রয়েছে যে তোমরা মানুষের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করতে থাক তবে আল্লাহ পাক তোমাদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করবেন। হাদীস শরীফেও রয়েছেঃ ارحم ترحم

তোমরা দয়া কর তাহলে তোমাদের প্রতিও দয়া করা হবে।

ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء

অর্থাৎ তোমরা জমিনবাসীর প্রতি দয়া কর তাহলে যিনি আসমানে রয়েছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেছেনঃ

১এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, তফসীরে কবীর খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-১৮৭

خير الناس من ينفع الناس

মানুষের মধ্যে সে-ই উত্তম ব্যক্তি যে অন্য মানুষের উপকার করে। আর নিঃসন্দেহে হযরত আবুবকর (রাঃ) সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদিয়ার মধ্যে উত্তম ব্যক্তি। কিন্তু যেহেতু উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ব্যাপারে হযরত মেসতাহ (রাঃ) মোনাফেকদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন তাই হযরত আবুবকর (রাঃ) এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। মানুষ যার উপকার করে তার তরফ থেকে আঘাত আসলে কষ্ট দ্বিগুণ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আলোচ্য আয়াত নাজিল হওয়ার সংগে সংগে হযরত আবুবকর (রাঃ) শুধু যে হযরত মেসতাহের সাহায্য জারী করেন তাই নয়; বরং সাহায্যের বরাদ্দ দ্বিগুণ করেছেন। এটি হযরত আবুবকর (রাঃ)-এরই বৈশিষ্ট্য।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর এ ঘটনার কারণে উম্মত শরীয়তের একটি বিধান লাভ করলো তা হলো "অপবাদের বিধান"।

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَٰتِ الْغَٰفِلَٰتِ الْمُؤْمِنَٰتِ

নিশ্চয়ই যারা সতী সাধ্বী সরলমনা মোমেন নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, দুনিয়া ও আখেরাতে তারা অভিশপ্ত, আর তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ংকর আযাব।

المحصنات — সতী সাধ্বী স্ত্রী লোকগণ

الغافلات — সরলমনা স্ত্রী লোক ব্যাভিচারের কথা যারা কখনো চিন্তাও করেনা।

عذاب عظيم — দোজখে তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি রয়েছে।

অর্থাৎ যারা সতী সাধ্বী সরলমনা মোমেন নারীদের উপর ব্যাভিচারের অপবাদ দেয়, তাদের প্রতি দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে রয়েছে লানত, আর দোজখে তাদের জন্যে রয়েছে কঠিনতর শাস্তি।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা সাতটি সর্বনাশা বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করে চল।

(১) আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করা

(২) যাদু বিদ্যা

(৩) অন্যায়ভাবে হত্যা করা

(৪) সুদখোরী

(৫) এতিমের সম্পদ গ্রাস করা

(৬) মুখোমুখি যুদ্ধ থেকে পলায়ন করা এবং

(৭) সতী সাধ্বী নারীদের প্রতি ব্যাভিচারের অপবাদ দেয়া।

এই হাদীসে অন্যান্য মহা পাপের পাশাপাশি সতী সাধ্বী নারীদের উপর অপবাদ আরোপ থেকে আত্মরক্ষা করার তাগিদ করা হয়েছে। যে কোন সতী সাধ্বী নারীর প্রতি কলংক আরোপ করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ, অমার্জনীয় অপরাধ। এমন অবস্থায় যিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কন্যা, যিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহা মানব হযরত রসূলে করীম (রাঃ) এর সহধর্মিনী, তাঁর প্রতি অপবাদ আরোপ করার শাস্তি কত কঠিন হবে তা অনুমান করা কঠিন নয়। এ কারণেই ওলামায়ে কেরাম এ সম্পর্কে একমত যে এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর যদি কেউ মোমেন-জননী হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর উপর অপবাদ আরোপ করে, তবে সে নিঃসন্দেহে কাফের। আর দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে সে অভিশপ্ত। আর উলামায়ে কেরাম একথাও বলেছেন যে এই আদেশ সকল উম্মাহাতুল মোমিনীনদের ব্যাপারেও। তাঁরাও হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ন্যায় উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী। কেননা এই হুকুম উম্মুল মোমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ব্যাপারে নাজিল হলেও তা অন্যদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) একথাও লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) একবার সুরায়ে নূরের তফসীর বয়ান করতে গিয়ে এ আয়াত সম্পর্কে বলেছিলেন যে, এ আয়াত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সহধর্মিনীগণ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।১

يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ

যেদিন তাদের রসনা তাদের হাত এবং পা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে (তাদের কীতির্কলাপ প্রকাশ করে দেবে)।

অর্থাৎ দুনিয়াতে যে যা কিছুই করুক, অবশেষে কেয়ামতের ময়দানে তা কোন অবস্থাতেই গোপন রাখতে পারবেনা। কেননা, সেদিন মানুষের অংগ প্রত্যংগ তার কীর্তিকলাপের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবে। যেমন কোরআনে করীমের অন্য আয়াতেও আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ
اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

(সূরা ইয়াসীন)

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দূ), পারা-১৮, পৃষ্ঠা-৫০

আজকের দিনে আমি তাদের মুখের উপর মোহর মেরে দেব এবং তাদের হাতগুলো আমাদের সংগে কথা বলবে আর তাদের পা গুলো সাক্ষ্য দেবে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে।

হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে।

এবনে জরীর, এবনে আবি হাকেম, হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে কেয়ামতের দিন হিসাবের জন্যে মোমেনকে তলব করা হবে, আল্লাহ পাক মোমেন বান্দার আমল তার সম্মুখে পেশ করবেন, (যে আমল আল্লাহ পাকের হক সম্পর্কীয় হবে বান্দা সেগুলো সম্পর্কে ওয়াকেফ হবে, আল্লাহ পাক সেই আমলগুলো তার সম্মুখে পেশ করবেন) মোমেন বান্দা সেই আমলের কথা স্বীকার করবে যা সে করেছে এবং আরজ করবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি এ কাজ করেছি, আমি এ কাজ করেছি। মোমেন বান্দার স্বীকারোক্তির পর আল্লাহ পাক তার উপর আবরণ ফেলে দেবেন, তাকে মাফ করবেন এবং তার গুণাহগুলো এভাবে গোপন করা হবে যে কোন সৃষ্টি তা দেখতে পাবেনা, শুধু তার নেক আমলের বিবরণই প্রকাশ্যে থাকবে, সকলে তাই দেখবে আর তারা এ সম্পর্কে আলোচনাও করবে।

মোনাফেককে যখন হিসাবের জন্যে তলব করা হবে, এবং তার প্রতিপালক তার জীবনের কার্যকলাপের বিবরণ তার সম্মুখে রেখে দেবেন, তখন সে অস্বীকার করে আরজ করবে, হে আমার প্রতিপালক! তোমার ইজ্জতের শপথ! আমি এসব কাজ করিনি, অথচ ফেরেশতারা আমার সম্পর্কে তা লিখে দিয়েছে, ফেরেশতাগণ বলবেন, তুমি কি অমুক দিন অমুক স্থানে এ কাজ করনি? মোনাফেক বলবে, প্রতিপালকের ইজ্জতের শপথ! আমি তা করিনি। তখন তার মুখ সীল করে দেয়া হবে (এরপর তার অঙ্গ প্রতঙ্গ সাক্ষ্য দেবে)।

হযরত আবু মুসা (রাঃ) বলেন, আমার ধারণা যে সর্ব প্রথম তার ডান উরু কথা বলবে। এরপর হযরত আবু মুসা (রাঃ) সূরা ইয়াসীনের পূর্বোল্লেখিত আয়াত তেলাওয়াত করেন।১

মসনদে আহমদে হযরত আকাবা এবনে আমের (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যেদিন মুখ সীল করে দেয়া হবে, সেদিন সর্ব প্রথম বাম উরুর হাড় কথা বলবে।

হযরত মাবিয়া এবনে জায়েদা থেকে বর্ণিত হাদীস নেসায়ী শরীফ, মসনদে আহমদ সহ অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩১১-১২

তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৮, পৃষ্ঠা-৫০-৫১

এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন মোনাফেকরা এ অবস্থায় হাজির হবে যে তাদের মুখ বন্ধ থাকবে, তারা কথা বলতে পারবেনা। সর্ব প্রথম তাদের উরু এবং হাত কথা বলবে।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে মানুষের কার্যকলাপ সম্পর্কে তার রান, তার গোশত এবং তার হাড় কথা বলবে আর এ ব্যক্তি হবে মোনাফেক যার উপর আল্লাহ পাকের গজব হবে।

ইমাম কুরতবী (রঃ) লিখেছেন, যারা আমলনামায় লিপিবদ্ধ বিবরণকে অস্বীকার করবে, তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।১

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মোশরেকরা যখন দেখবে, নামাজী ব্যতীত কোন লোক বেহেশতে প্রেরণ করা হয়না, তখন তারা বলবে, আস আমরা আমল নামার বিবরণ অস্বীকার করি। তাই তারা শেরকের কথা অস্বীকার করবে। তখনই তাদের মুখ সীল করে দেয়া হবে এবং তাদের হাত পা সাক্ষ্য দেবে। আর একথা আলোচ্য আয়াতে (يَوْمَ تَشْهَدُ) ঘোষণা করা হয়েছে।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন কাফেরদের সম্মুখে তাদের কীর্তি কলাপের বিবরণ দেয়া হবে তখন তারা তা অস্বীকার করবে এবং নিজেদের নিষ্পাপ হওয়ার কথা বলতে থাকবে, তখন তাদেরকে বলা হবে, এই হল তোমাদের প্রতিবেশী, তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে। তারা বলবে, এরা মিথ্যাবাদী। তখন বলা হবে, তোমাদের গোত্রের লোক বর্তমান রয়েছে। তারা বলবে, এরাও মিথ্যাবাদী। তখন বলা হবে, ঠিক আছে তোমরা শপথ কর তখন তারা শপথ করে ফেলবে, এরপর আল্লাহ পাক তাদেরকে বধিরে পরিণত করবেন এবং তাদের হাত পা তাদের কৃত অন্যায়ের উপর সাক্ষ্য দেবে, এরপর ঐ লোকদেরকে দোজখে প্রেরণ করা হবে। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির ছিলাম, তিনি একটু হাসলেন, এরপর এরশাদ করলেন, তোমরা কি জান আমি কেন হাসলাম? আমরা আরজ করলাম আল্লাহ পাকই জানেন। তখন তিনি এরশাদ করলেন, বান্দা কেয়ামতের দিন স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে আরজী পেশ করবে এই কথা বলে, হে আল্লাহ! তুমি কি আমাকে জুলুম থেকে বিরত রাখনি? আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন হাঁ, তখন বান্দা আরজ করবে, তাহলে আজ সেই সাক্ষীর স্বাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হোক যাকে আমি সত্যবাদী মনে করি। আর সেই সাক্ষী আমি ব্যতীত

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩১২-১৩

আর কেউ নয়। আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, তাই হোক, তুমি তোমার জন্যে সাক্ষী হও, এরপর তার মুখ সীল করে দেয়া হবে এবং সেই ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে প্রশ্ন করা হবে এবং সকল রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে। তখন বান্দা নিজেকে নিজে বলবে, তোমার ধ্বংস অনিবার্য।

(মুসলিম শরীফ)

ইমাম কাতাদা (রঃ) বর্ণনা করেন, হে বণী আদম! তুমি নিজেই তোমার পাপাচারের সাক্ষী। তোমার সারা দেহের প্রতিটি অঙ্গ তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। অতএব, এ দিকে খেয়াল রাখ। আল্লাহ পাককে ভয় কর, গোপন প্রকাশ্য সব ব্যাপার তাঁর নিকট সুস্পষ্ট, কোন কিছু গোপন নেই। তাঁর নিকট অন্ধকারও আলোকময়। আল্লাহ পাকের শানে ভাল ধারণা রাখা অবস্থায় মৃত্যুবরণ কর। আমাদের সব কিছুর ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ পাকের হাতেই।১

এ কারণেই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ

সেদিন আল্লাহ পাক তাদেরকে পুরোপুরি শাস্তি দেবেন। আর তারা সেদিন জানতে পারবে যে আল্লাহ পাক ধ্রুব সত্য। তিনি সত্য প্রকাশ করে থাকেন। কেননা, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক প্রত্যেকের আমল সুস্পষ্টভাবে তার সম্মুখে তুলে ধরবেন। সেদিন কারো প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা হবেনা। এ সত্য সকলেই স্বচক্ষে দেখতে পাবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

আর সেদিনকে ভয় কর যেদিন তোমরা আল্লাহ পাকের নিকট ফিরে যাবে। এরপর প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বদলা পুরোপুরি দেয়া হবে আর তাদের প্রতি এতটুকুও জুলুম করা হবে না।

আর তারা এ সত্য সুস্পষ্টভাবে জানতে পারবে যে নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক ধ্রুব সত্য, তিনি সত্য প্রকাশ করে থাকেন। তিনি সকল রহস্য উদ্‌ঘাটন করে দেবেন। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৮, পৃষ্ঠা-৫।

যেদিন গোপন বিষয় পরীক্ষিত হবে সেদিন তার কোন সামর্থ্য থাকবে না এবং কোন সাহায্যকারীও নয়।

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের সর্বশেষ বাক্যটির ব্যাখ্যা হল আল্লাহ পাক দুনিয়াতে যে ওয়াদা করেছেন তা কেয়ামতের দিন প্রকাশ করবেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলাচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, মোনাফেক দলপতি আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুল দ্বীন ইসলামের সত্যতায় সন্দিহান ছিল।

কেয়ামতের দিন সে জানতে পারবে যে আল্লাহ পাকই ধ্রুব সত্য, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তাঁর আধিপত্য সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত।১

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ

নোংরা নারীরা নোংরা পুরুষের জন্যে আর নোংরা পুরুষরা নোংরা নারীদের জন্যে।

বিয়ে-শাদীতে রুচির মিল হওয়াটা স্বাভাবিক, তাই নোংরা ব্যাভিচারিনী নারীরা নোংরা ব্যাভিচারী পুরুষের যোগ্য। পরিচ্ছন্ন পবিত্র চরিত্রের অধিকারী পুরুষরা কখনো নোংরা ব্যাভিচারী নারীর পাণি গ্রহণ করেনা, করতে পারেনা। ঠিক এমনিভাবে সতী সাধ্বী নারী পবিত্র চরিত্রের অধিকারী পুরুষের জন্যেই মানায়, এটিই সর্বজন স্বীকৃত নিয়ম, আর এ কারণেই হযরত আবদুল্লাহ এবেন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, কখনো কোন নবীর স্ত্রী ব্যাভিচারিনী হয়নি, কেননা আল্লাহ পাক স্বয়ং তাঁর নবীদের সম্মানের হেফাজত করেছেন। ক্ষেত্র বিশেষে নবীর স্ত্রী কাফের হয়েছে, কিন্তু ব্যাভিচারিনী কখনো হয়নি। যেমন হযরত লুত (আঃ)-এর স্ত্রী এবং নূহ (আঃ)-এর স্ত্রী। যখন তাদের কাফের সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ পাকের আযাব আপতিত হয়েছিল, তখন এই কাফের স্ত্রীদ্বয়ও ধ্বংস হয়েছে।

পক্ষান্তরে, ফেরাউনের ন্যায় অবাধ্য, কাফের, জালেমের স্ত্রী আছিয়া ছিলেন মোমেন। পবিত্র কোরআনেই রয়েছে এসব ঘটনার বিবরণ। মূলতঃ হেদায়েত একমাত্র আল্লাহ পাকের হাতেই রয়েছে। তিনি দয়া করে যাকে হেদায়েত দান করেন, সে-ই হেদায়েত লাভে ধন্য হয়। আর যাকে এই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করেন, সে হয় পথভ্রষ্ট। কোন কোন তফসীরকার

الخبيثات للخبيثين

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩১৩

এর অন্য অর্থ লিখেছেন। তারা বলেছেন, এর অর্থ নোংরা পুরুষ নোংরা নারী নয়; বরং নোংরা চরিত্র, নোংরা কথা, নোংরা আচরণ। আলোচ্য আয়াতের অর্থ হল নোংরা, অপবিত্র কথা নোংরা লোকের মুখেই শোভা পায়। পবিত্র কথা, পবিত্র আচরণ পবিত্র চরিত্রের অধিকারী মানুষেরই বৈশিষ্ট্য। এ ব্যাখ্যা করেছেন জুযাজ (রঃ)। তিনি বলেছেন, সব চেয়ে নোংরা কথা হল শেরক ও কুফরের কথা, মিথ্যা ধোকা ও ব্যাভিচারের কথা বা কোন সতী সাধ্বী নারীর প্রতি ব্যাভিচারের অপবাদ দেয়া। যেমন আবদুল্লাহ্ এবনে উবাইয়ার ন্যায় মোনাফেকদের পক্ষেই এমন নোংরা কথা বলা সম্ভব হয়েছে। কোন ঈমানদার, নেককার, পরহেজগার লোকের পক্ষে এমন কথা চিন্তা করাও সম্ভব নয়। ঈমানদার, নেককার লোকগণের মুখে কলেমায়ে তৈয়্যেবা শ্রুত হয়। কি নারী কি পুরুষ সকলেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পেশ করতে থাকেন। কোরআনে করীমের তেলাওয়াতে, আখেরাতের নাজাত ও মাগফেরাত লাভের প্রার্থনায় তারা মশগুল থাকেন। ভাল কথা, উপকারী কথা, উদারতা ও মহানুভবতার কথাই তাদের রসনা থেকে উচ্চারিত হয়।

এবনে জায়েদ বলেছেন, خَبِيثَاتٌ শব্দের অর্থ নোংরা স্ত্রীলোক, আর خَبِيثِينَ অর্থ নোংরা পুরুষ। আয়াতের অর্থ হল সাধারণতঃ নোংরা স্ত্রীলোকের সঙ্গে নোংরা পুরুষেরই বিয়ে শাদী হয়। পক্ষান্তরে, সাধু সজ্জন পবিত্র চরিত্রের অধিকারী পুরুষের সঙ্গে বিয়ে হয় সতী সাধ্বী নারীদের। একথার তাৎপর্য হল এই যে, উম্মুল মোমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন পুত পবিত্র চরিত্রের অধিকারিনী। এ কারণেই তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হওয়ার জন্যে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এবং দূরাত্মা মোনাফেকরা তাঁর প্রতি যে অপবাদ দিয়েছিল, তা ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বানোয়াট এবং সত্যের অপলাপ মাত্র।

হযরত হিন্দ এবনে আবি হালা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতী ব্যতীত কোন স্ত্রী লোকের সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়া আল্লাহ পাকের অপছন্দনীয়।১

এজন্যে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ

তারা (মোনাফেকরা) যা কিছু বলে তার সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ উম্মুল মোমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি মোনাফেকরা যে অপবাদ দেয় তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩১৩-১৪

لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝

"তাদের জন্যে ক্ষমা, মাগফেরাত এবং সম্মানের জীবিকা রয়েছে"।

অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং তাঁর ন্যায় নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তিবর্গের জন্যে রয়েছে মাগফেরাতের সুসংবাদ এবং সম্মানের উপ জীবিকা তথা জান্নাত।

হযরত আয়েশা (রাঃ)–এর বৈশিষ্ট্য

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, বর্ণিত আছে যে হযরত আয়েশা (রাঃ) কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কারণে গৌরব বোধ করতেন যা শুধু তাঁকেই দান করা হয়েছে; অন্য কোন স্ত্রীলোককে নয়।

একঃ হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হযরত আয়েশা (রাঃ) এর ছবিকে একটি রেশমী কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে এসেছেন এবং বলেছেন ইনি আপনার স্ত্রী। ইমাম তিরমিজী (রাঃ) হযরত আয়েশার বর্ণনা সংকলন করেছেন যে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হযরত আয়েশার ছবি নিয়ে এসেছিলেন।

দুইঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) ব্যতীত হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আর কোন কুমারীর পাণি গ্রহণ করেননি।

তিনঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এন্তেকালের সময় তাঁর মাথা মোবারক হযরত আয়েশা (রাঃ) এর কোলে ছিল।

চারঃ হযরত আয়েশা (রাঃ)–এর কক্ষে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দেহ মোবারক দাফন করা হয়েছে।

পাঁচঃ হযরত রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) যখন একই চাদরে আবৃত থাকতেন (কখনও এই অবস্থায়ও) ওহী নাযেল হয়েছে (অন্য কোন স্ত্রী এই মর্যাদা লাভ করেননি)।

ছয়ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ)–এর পবিত্রতার কথা আসমান থেকে ঘোষণা করা হয়েছে।

সাতঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রথম খলীফার কন্যা।

আটঃ তিনি ছিলেন সিদ্দীকা পবিত্রা।

নয়ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে মাগফেরাত এবং সম্মানের রিজিক প্রদানের ওয়াদা করা হয়েছে।

তফসীরকার মস্রুক (রঃ) যদি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সূত্রে কোন হাদীস বর্ণনা করতেন তবে তিনি এভাবে বর্ণনা শুরু করতেনঃ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর কন্যা সিদ্দীকা যিনি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রিয় স্ত্রী ছিলেন, যাঁর পবিত্রতার কথা আসমান থেকে নাযিল হয়েছে।

আল্লামা বায়জাবী (রঃ) লিখেছেনঃ যদি সমগ্র কোরআনে অনুসন্ধান করা হয় তবে দেখা যাবে যে কারো জন্যে এত কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়নি যত কঠোর সতর্কবাণী হযরত আয়েশা (রাঃ) এর প্রতি অপবাদ আরোপ কারীদের ব্যাপারে হয়েছে।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে রয়েছে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, আমাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাকে অর্থাৎ তোমার আকৃতিকে একাধারে তিন রাত স্বপ্নে আমার সম্মুখে আনা হয়েছে। ফেরেশতা একটি রেশমী কাপড়ে জড়িয়ে তোমাকে পেশ করতো এবং আমাকে বলতো ইনি আপনার স্ত্রী। আমি তোমার চেহারা থেকে আবরণ সরালে দেখতাম তোমারই আকৃতি। তখন আমি বলেছি, যদি এই স্বপ্ন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হয় তবে অবশ্যই তিনি তা পূরা করবেন।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে রয়েছে হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ইনি জিব্রাঈল আমীন, তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। আমি জবাব দিলাম, ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখতেন আমি দেখতাম না।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বিশেষ ফজিলত

হযরত আয়েশা (রাঃ) একথাও বর্ণনা করেছেন যে লোকেরা ইচ্ছা করে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে সেদিন বিশেষভাবে হাদীয়া পেশ করত যেদিন তিনি আমার নিকট থাকতেন। এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হত হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি লাভ করা।

একবার উম্মুল মোমিনীন উম্মে সালমা (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করেন, আপনি মানুষকে বলে দিন মানুষ যদি

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাদিয়া পেশ করতে চায় তবে তিনি যে স্ত্রীর ঘরে থাকেন, সেখানেই যেন পাঠায় (শুধুমাত্র আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরেই পাঠাবে এমন নয়)। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমরা আমাকে আয়েশার (রাঃ) ব্যাপারে কষ্ট দিওনা। আয়েশা ব্যতীত আর কারো নিকট আমি যখন থাকি তখন আমার নিকট ওহী আসেনা। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) তখন বললেন, আমি আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা করি। এরপর তাঁর স্ত্রীগণ এ ব্যাপারে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে প্রেরণ করেন। হযরত ফাতেমা এ ব্যাপারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, হে আমার সন্তান। তোমার কি সেকথা পছন্দ, যা আমার নিকট অপছন্দনীয়। হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলেন, অবশ্যই নয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তাহলে তুমিও তার সঙ্গে মহব্বত রাখ।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আয়েশার (রাঃ) ফজিলত অন্য স্ত্রী লোকদের উপর এমন যেমন সরীদের (বিশেষ ধরণের খাবার) ফজিলত রয়েছে অন্য খাবারের উপর।

হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) বলেছেন, সাহাবায়ে কেরাম যখনই কোন হাদীসের মর্ম উদ্ধারে সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তখনই আমরা হযরত আয়েশার নিকট জিজ্ঞাসা করতাম এবং ঐ হাদীসের এলম তাঁর নিকট পেতাম।

হযরত মুসা এবনে তালহা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে সঠিক সুন্দর বর্ণনাকারী আর কাউকে পাইনি।

(তিরমিজী শরীফ)

আল্লামা বয়জাভী (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাক চার ব্যক্তির পবিত্রতার কথা ঘোষণা করেছেন চারজনের দ্বারা।

(১) হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর চরিত্রের পবিত্রতা ঘোষিত হয়েছে জোলায়খার বাড়ীর একটি শিশুর সাক্ষ্য দ্বারা।

(২) হযরত মুসা (আঃ)-এর প্রতি ইহুদীরা যে অপবাদ দিয়েছিল, তা দূরীভূত হয় একটি পাথর দ্বারা। যে পাথরটি তাঁর পোষাক নিয়ে পলায়ন করেছিল।

(৩) মরিয়ম (আঃ)-কে তাঁরই সন্তান ঈসা (আঃ)-এর সাক্ষ্য দ্বারা।

(৪) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর পবিত্রতা ঘোষিত হয়েছে আলোচ্য আয়াত দ্বারা।

হযরত আয়েশা (রাঃ) এর পবিত্রতা ঘোষণার ব্যাপারে এত জোরালো ভাষা ব্যবহারের কারণ হলো, প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্যাদা এবং হযরত আয়েশা
(রাঃ)-এর সম্মান বৃদ্ধি করা। কেননা, এ বিবরণ দ্বারা আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিতে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর উচ্চ মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে।

যে দোয়ার বরকতে হযরত আয়েশা (রাঃ)–এর কষ্ট দূর হয়

উম্মুল মোমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, অপবাদ আরোপের কঠিন বিপদের সময় যখন স্বাভাবিক ভাবেই পানাহার করাও আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিলনা, এমন একদিন আমি ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত অবস্থায় ঘুমিয়েছিলাম, স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে দেখলাম সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম, মানুষের অন্যায় কথার কারণে আমি বড় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তখন লোকটি বলল, তুমি এই বাক্যগুলি দ্বারা দোয়া কর। আল্লাহ পাক তোমার কষ্ট দূর করে দেবেন, আমি বললাম, সেই বাক্যটি কি? সে বলল, এভাবে দোয়া করঃ

يَا سَابِغَ النِّعَمِ وَيَادَافِعَ النِّقَمِ وَيَا فَارِجَ الْغُمَمِ وَيَا كَاشِفَ الظُّلَمِ
يَا اَعْدَلَ مَنْ حَكَمَ يَا حَسْبَ مَنْ ظُلِمَ يَا وَلِيَّ مَنْ ظُلِمَ يَا اَوَّلُ
بِلاَ بِدَايَةٍ وَيَا اٰخِرُ بِلاَ نِهَايَةٍ يَا مَنْ لَهُ اسْمٌ بِلاَ كُنْيَةٍ
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّيْ مِنْ اَمْرِيْ فَرَجًا وَّمَخْرَجًا

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি যখন জাগ্রত হলাম, তখন দেখলাম আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই এবং আমার দুশ্চিন্তাও দূরীভূত হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক কোরআনে করীমের আলোচ্য আয়াত সমূহ নাজিল করে আমার কষ্ট দূরীভূত করেন।[১]

১। তফসীরে রুহুল মা'আনী, খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-১৩৩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا
وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا
فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا
فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ
وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا
فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

তরজমা

(২৭) হে মোমেনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে প্রবেশ করোনা যে পর্যন্ত না উক্ত গৃহবাসীর সংগে কথা বল এবং তাদেরকে সালাম কর। এটিই তোমাদের জন্যে উত্তম; হয়তো তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।

(২৮) যদি তোমরা গৃহে কোন লোককে না পাও তবে তাতে প্রবেশ করবেনা যে পর্যন্ত না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়, যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও তবে তোমরা ফিরে যেও। এটিই তোমাদের জন্যে উত্তম আর আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

(২৯) যে গৃহে কেউ বাস করেনা তাতে তোমাদের দ্রব্য সামগ্রী থাকলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোন গুণাহ নেই আর আল্লাহ পাক জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর।

(৩০) হে রসূল! মোমেনদেরকে বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে আর তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটিই তাদের জন্যে উত্তম। নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে ব্যাভিচার এবং ব্যাভিচারের অপবাদ সম্পর্কীয় বিধানের বিবরণ রয়েছে। আর এ আয়াতে কারো গৃহে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ না করার নির্দেশ রয়েছে, যাতে করে ব্যাভিচার বা ব্যাভিচারের অপবাদের পথ বন্ধ হয়।

শানে নজুল

এবনে জরীর হযরত আদি এবনে সাবেত (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একজন আনসারী স্ত্রীলোক প্রিয়নবী হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে আরজ করল, আমি আমার গৃহে কখনো এমন অবস্থায় থাকি যে আমি চাইনা ঐ অবস্থায় কেউ আমাকে দেখুক। কিন্তু আমার বাড়ীর লোকদের মধ্যে কেউ না কেউ এমন অবস্থায় বিনা বাধায় আমার ঘরে প্রবেশ করে এবং আমাকে দেখে। এমন পরিস্থিতিতে আমি কি করব? এ প্রশ্নের জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟

হে মোমেনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে প্রবেশ করোনা যে পর্যন্ত না উক্ত গৃহবাসীর সংগে কথা বল এবং তাদেরকে সালাম কর।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। মানব জীবনের এমন কোন দিক নেই যে সম্পর্কে ইসলাম তার বিধি-নিষেধ পেশ করেনি। ব্যক্তি জীবন হোক কী পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন হোক কী জাতীয়, এমনকি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ইসলাম দিয়েছে সুষ্ঠু দিক-নির্দেশনা, প্রকৃত মোমেন হতে হলে এ দিক-নির্দেশনা মেনে চলতে হয়। একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে ইসলামী জীবন-বিধানের সঠিক বাস্তবায়নের মধ্যে। বর্তমান দুনিয়ায় মানব-জীবন অশান্ত, এ অশান্তির একমাত্র কারণ হলো আল্লাহ পাকের প্রদত্ত পবিত্র কোরআনে বর্ণিত এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত জীবন বিধানের বাস্তবায়নে অনীহা। পৃথিবীর যে জাতিই পবিত্র কোরআনে বর্ণিত বিধি-নিষেধ পালন করবে, তাদের জীবনে শান্তি হবে সুনিশ্চিত। উদারতা, মহানুভবতা, শিষ্টাচার, পরস্পরের ভ্রাতৃত্ববোধ এককথায় যাবতীয় আধ্যাত্মিক গুণাবলী অর্জনের তাগিদ করে পবিত্র কোরআনে এমনি কয়েকটি একান্ত জরুরী বিধানের বিবরণ স্থান পেয়েছে আলোচ্য আয়াতে। তাই মোমেনদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে এরশাদ

হয়েছেঃ হে মোমেনগণ। তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে প্রবেশ করোনা যে পর্যন্ত না গৃহবাসীর সংগে কথা বল এবং তাদেরকে সালাম কর।

মূলতঃ মানুষ তার নিজের গৃহে কখন কি অবস্থায় থাকে, তা কারোরই জানার কথা নয়। হঠাৎ যদি কারো ঘরে কেউ প্রবেশ করে তবে নিজেকেই লজ্জিত হতে হয়, আর কোন আগন্তুকের এভাবে কারো গৃহে প্রবেশ করা গৃহবাসীর জন্যে বিব্রতকর হতে পারে, আর পরিণামে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে। ইসলাম শান্তির ধর্ম, তাই অশান্তির যাবতীয় উপকরণ বন্ধ করার বিধান রয়েছে ইসলামে। আলোচ্য আয়াতের এ বিধান হয়ত এমনি প্রয়োজনেই ঘোষণা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি মানুষকে যেমন তার নিজের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হয়, ঠিক অন্যের ব্যাপারেও সতর্ক অবস্থায় আচরণ করতে হয়। বিনা অনুমতিতে কারো ঘরে প্রবেশ করার কারণে উভয় পক্ষের বা কোন এক পক্ষের অশান্তির কারণ হতে পারে বলেই এ বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে।

غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ

আলোচ্য আয়াতের غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ শব্দটির ব্যাখ্যা হল সে সব গৃহ ব্যতীত যাতে তোমরা বাস কর, (যদিও সেই গৃহগুলোর তোমরা মালিক হও। কেননা, যদি কেউ নিজের বাড়ীকে অন্য কারো নিকট ভাড়া অথবা বিনা ভাড়ায় থাকতে দেয়, যদিও সে বাড়ীর মূল মালিক, তবুও বাড়ীতে অবস্থান কালে অনুমতি ব্যতীত তাতে প্রবেশ করা তার জন্যেও বৈধ নয়। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর হযরত আবু সওরা (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আলোচ্য আয়াতে কোন গৃহে প্রবেশ করার জন্যে সালাম করার যে কথা রয়েছে তাতো আমরা বুঝি, কিন্তু تَسْتَأْنِسُوا বলতে কি বুঝায়? এর কি অর্থ? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ এর অর্থ হল ঐ গৃহের বাইরে থেকে সোবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার বলবে এবং গলা খাকারী দ্বারা শব্দ করবে যাতে করে গৃহের অধিবাসীরা তার আগমন সম্পর্কে অবগত হয়। যখন তারা অনুমতি দেবে, তখন গৃহে প্রবেশ করবে।

وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا

অর্থাৎ গৃহবাসীকে তুমি সালাম দিও। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন তুমি ঘরে যাও-তখন ঘরের অধিবাসীদেরকে সালাম কর; তোমার এবং তাদের জন্যে হবে বরকত। (তিরমিজী)

নিজের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে প্রবেশ করার জন্যে আলোচ্য আয়াতে দু'টি কাজের নির্দেশ রয়েছে।

একঃ গৃহবাসী থেকে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করা,

দুইঃ তাদেরকে সালাম দেয়া।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে অনুমতি প্রার্থনার কথা আগে বলা হয়েছে এবং সালাম দেয়ার কথা পরে বলা হয়েছে। অতএব, আগে অনুমতি প্রার্থনা এবং পরে সালাম করতে হবে। কিন্তু আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মত হলো সর্বপ্রথম সালাম দিতে হবে, এরপর অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে। হযরত কালদা এবনে হান্বল (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান দরবারে হাজির হই; আমি অনুমতি প্রার্থনাও করিনি সালামও দেইনি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিলেন, তুমি ফেরত যাও এবং পুনরায় এসে বল 'আসসালামু আলাইকুম' আমি কি ভিতরে আসতে পারি?

(আবু দাউদ, তিরমিজী)।

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে প্রথমে সালাম না করবে তাকে প্রবেশের অনুমতি দিওনা। আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ এবনে ওমরের নিকট প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করে বললো, আমি কি ভিতরে আসতে পারি? হযরত এবনে ওমর (রাঃ) বললেন, না। তখন এক ব্যক্তি ঐ আগন্তুককে পরামর্শ দিল, তুমি আগে সালাম দাও, এরপর অনুমতি প্রার্থনা কর। পরামর্শ মোতাবেক সে তাই করলো। তখন হযরত আব্দুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) তাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আগন্তুক যদি কোন লোককে দেখে তবে প্রথমে সালাম দেবে এরপর অনুমতি প্রার্থনা করবে। কিন্তু যদি কোন লোককে না দেখে তবে প্রথমে অনুমতি প্রার্থনা করবে এরপর সালাম দিবে।

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) এবং হযরত হুজায়ফা (রাঃ) স্বগৃহে প্রবেশের সময়ও নিজেদের মুহরেমা মহিলাদের থেকে অনুমতি গ্রহণ করতেন। হযরত হাসান বসরী (রঃ) আতা এবনে ইয়াসারের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলো, আমি কি আমার মায়ের নিকট প্রবেশের সময়ও অনুমতি প্রার্থনা করবো? তিনি এরশাদ করলেনঃ হ্যাঁ। সে আরজ করলো, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি তো তাঁর কাছেই থাকি। তিনি এরশাদ করলেন, তবুও তার নিকট হাজির হওয়ার জন্যে অনুমতি প্রার্থনা কর। সে আরজ করলো, হুজুর আমি তো তাঁর খাদেম। তিনি এরশাদ করলেনঃ তবুও প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা কর। তুমি কি তোমার মাকে নগ্ন অবস্থায় দেখতে পছন্দ করবে? সে

আরজ করলো, না। তখন তিনি এরশাদ করলেন, তাহলে তার নিকট হাজির হওয়ার পূর্বে অনুমতি প্রার্থনা কর।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, যদি কোন লোককে বাহক পাঠিয়ে ডাকা হয় আর সে হাজির হয় তবে অনুমতি গ্রহণের কোন প্রয়োজন নেই। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি তোমাদের মধ্যে কোন লোককে কোথাও আহবান করা হয় আর সে আহবায়কের সঙ্গে হাজির হয় তবে এটিই হবে তার জন্যে অনুমতি (আবু দাউদ শরীফ)।

ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ

"এটি তোমাদের জন্য উত্তম"।

অর্থাৎ হঠাৎ করে কারো গৃহে প্রবেশের চেয়ে অনুমতি প্রার্থনা করাই উত্তম। কেননা জাহেলিয়াতের যুগে অনুমতি প্রার্থনা করা হতো না।

হযরত এমরান এবনে হুসাইন (রাঃ) বর্ণনা করেন যে আমরা জাহেলিয়াতের যুগে 'আসসালামু আলাইকুম'–এর স্থলে বলতাম,

انعم الله بك عينا

"আল্লাহ পাক তোমার চক্ষুকে শুস্ক রাখুন"।

কিন্তু যখন ইসলাম আসলো, তখন তা' বন্ধ করা হলো।১

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"হয়তো তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে"।

অর্থাৎ হয়তো তোমরা এই সব নিয়ম–কানুন মেনে নেবে।

فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ

যদি তাতে কোন লোককে না পাও, তবে যে পর্যন্ত অনুমতি না দেয়া হয়, সে পর্যন্ত প্রবেশ করোনা, আর যদি তোমাদেরকে ফিরে যেতে বলা হয় তবে ফিরে যাও, এটিই তোমাদের জন্যে অতি উত্তম পন্থা।

অর্থাৎ যদি কারো বাড়ীতে প্রবেশ করার অনুমতি চাওয়ার পর কোন লোককে সেখানে দেখতে না পাও, তবে অনুমতি ব্যতীত সেই বাড়ীতে প্রবেশ করোনা। কেননা এতে অন্যের অধিকারে অনধিকার হস্তক্ষেপ করা হয়। এতদ্ব্যতীত যে বিষয়টি এ পর্যায়ে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য তা হল এই যে কারো বাড়ীতে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ শুধু এটিই নয় যে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করলে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৮, পৃষ্ঠা –৩১৮–১৯

হয়তো কোন মানুষকে অনাবৃত অবস্থায় দেখা যাওয়ার আশংকা থাকে। অথবা পর্দানসীন মহিলাদের বেপর্দা হওয়ার আশংকা থাকে, বরং কারো বাড়ীতে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ার আর একটি কারণ হল, এভাবে এমন কোন বিষয় প্রকাশ পেয়ে যায় যা গৃহকর্তা অন্য মানুষ থেকে গোপন রাখতে চায়। এতদ্ব্যতীত, এ আদেশের আর একটি কারণ হল এই, অন্যের কোন বস্তুকে তার অনুমতি ব্যতীত হস্তক্ষেপ করাও শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। ক্ষেত্র বিশেষে এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে মারাত্মক কলহ-দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়ে থাকে। কিন্তু যদি গৃহকর্তার প্রয়োজনেই প্রবেশ করতে হয়, যেমন ঐ গৃহে আগুন ধরে গেল বা চোর প্রবেশ করলো, অথবা হত্যা করার জন্যে ঘাতক হাজির হল, অথবা মদ বিক্রি হল তবে অনুমতি ব্যতীতও তাতে প্রবেশ করা যাবে। এমনিভাবে, গৃহের মালিকের পক্ষ থেকে যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অথবা মৌন অনুমতি থাকে, তবে এমন গৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকবে না।১

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে কারো গৃহে প্রবেশের জন্যে একবার নয় বরং তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ অনুমতি এমন লোক থেকে নিতে হবে, যার অনুমতি দেয়ার অধিকার আছে। তৃতীয়তঃ অনুমতি প্রার্থনার জন্যে এমন গৃহ হওয়া জরুরী নয়, যেখানে স্ত্রীলোকরাও বাস করে, বরং শুধু পুরুষই কোন গৃহে বাস করে, সেই গৃহে প্রবেশের জন্যেও গৃহকর্তার অনুমতি একান্ত প্রয়োজনীয়। পরস্পরের সম্পর্ক যেন বিনষ্ট না হয় এ উদ্দেশ্যে এ সব নিয়ম কানুনের উপর সঠিকভাবে আমল করা একান্ত জরুরী।

وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ

আর যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও, তবে ফিরে যেও, এটি তোমাদের জন্যে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে উত্তম পন্থা অর্থাৎ যদি প্রবেশের অনুমতি না দেয়া হয়, অথবা তিনবার অনুমতি প্রার্থনার পরও গৃহকর্তার তরফ থেকে কোন জবাব দেয়া না হয় তবে ফিরে যাওয়াই উত্তম। প্রবেশ করার জন্যে বার বার চেষ্টা করা অনুচিত।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমার নিকট হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) এসেছিলেন এবং বলেছেন, আমার নিকট হযরত ওমর (রাঃ) একজন লোক পাঠিয়ে আমাকে ডেকেছেন। (সেই ব্যক্তি খবর দিয়ে চলে গেছে। আমি হযরত ওমর (রাঃ)-এর ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর গৃহের দ্বারে উপস্থিত হয়েছি। তিনবার আমি বাইরে থেকে সালাম দিয়েছি। কিন্তু ভিতর থেকে হযরত ওমর (রাঃ) আমার সালামের কোন জবাব দেননি, তাই আমি প্রত্যাবর্তন করেছি। এরপর যখন তাঁর সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে তখন তিনি আমার নিকট থেকে কৈফিয়ত তলব করেছেন, কেন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম না? আমি জবাব দিলাম, আমি

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা -৩১৯-২০

আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে হাজির হয়েছিলাম এবং আপনার গৃহ দ্বারে দাঁড়িয়ে তিনবার সালাম দিয়েছিলাম, কিন্তু আপনার নিকট থেকে কোন জবাব না পেয়ে আমি প্রত্যাবর্তন করেছি। কেননা, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি তোমাদের মধ্যে কেউ তিনবার কারো গৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করে, আর তাকে তা না দেয়া হয়, তবে তার ফিরে যাওয়া উচিত। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ কথার উপর সাক্ষ্য পেশ কর। তখন আমি বললাম, আপনাদের মধ্যে কেউ যদি এই ফরমানের সাক্ষী থাকেন তবে আমার সঙ্গে চলুন এবং সাক্ষ্য প্রদান করুন। হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, তখন আমি দন্ডায়মান হলাম এবং তাঁর সঙ্গে হযরত ওমর (রাঃ)–এর নিকট গমন করে এই সাক্ষ্য প্রদান করলাম।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনবার বলবে আসসালামু আলাইকুম এবং একথাও বলবে আমি কি ভিতরে আসতে পারি? যদি অনুমতি পাওয়া যায় তবে ভেতরে যাবে।

(এবনে মাজা)

হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, প্রথমবার অনুমতি প্রার্থনা এবং সালামের মাধ্যমে আগমনকারীর আগমনের খবর দেয়া হয়। দ্বিতীয়বার সালাম দেয়া ও প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করা হয়। আর তৃতীয়বার ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করা হয়।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত সাদ এবনে ওবাদার নিকট তশরীফ নিয়ে গেলেন এবং ঘরে প্রবেশ করার জন্যে অনুমতি চাইলেন এবং বললেন,আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ। হযরত সাদ (রাঃ) অত্যন্ত নিম্নস্বরে জবাব দিলেন। ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহ। কিন্তু হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জবাব শ্রবণ করেননি। এমনকি, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তিনবার সালাম দিলেন। আর হযরত সাদ এমন নিম্ন স্বরে জবাব দিলেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তা শ্রবণ করেননি। তাই তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন হযরত সাদ পিছন থেকে দৌড়ে আসলেন বা দ্রুতবেগে আসলেন এবং আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি আমার পিতা মাতা কোরবান হোক, আপনি যতবার আমাকে সালাম দিয়েছেন আমি তা শ্রবণ করেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে জবাবও দিয়েছি, আর এত নিম্ন স্বরে জবাব দিয়েছি যেন আপনি শ্রবণ না করেন, আমার আন্তরিক আকাংখা ছিল এই যে আপনার পক্ষ থেকে শান্তির এবং বরকতের দোয়া অধিক পরিমাণে হতে থাকে। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সহ সাহাবায়ে কেরাম সাদের গৃহে প্রবেশ করলে তিনি কিসমিস পেশ করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তা আহার করলেন। এরপর এরশাদ করলেন,

তোমার খাবার নেককার লোকেরা খেয়েছে এবং ফেরেশতাগণ তোমার প্রতি রহমত নাজিল হওয়ার জন্যে দোয়া করছেন এবং রোজাদারগণ তোমার এখানে এফতার্ করেছেন।

কয়েকটি জরুরী বিষয়

যদি কোন ব্যক্তি কারো দ্বার প্রান্তে উপস্থিত হয় এবং প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা না করে এবং গৃহকর্তার বের হওয়ার অপেক্ষায় তার দ্বারপ্রান্তে বসে থাকে তবে তা বৈধ। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) একজন আনসারী সাহাবীর নিকট হাদীসে শরীফ শিখবার জন্যে হাজির হতেন এবং তাঁর দ্বার প্রান্তে অপেক্ষায় বসে থাকতেন, ভেতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করতেন না। আনসারী সাহাবী যখন বাইরে এসে দেখতেন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চাচার পুত্র এভাবে বাইরে বসে আছেন, তখন তিনি বলতেন, আপনি আমাকে আপনার আগমনের খবর কেন দিলেন না? হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলতেন আমি আপনার নিকট এলম হাসিল করার জন্যে এসেছি, আর আমাদেরকে এভাবেই এলম হাসিল করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ যদি কেউ কারো সঙ্গে মোলাকাতের জন্য তার গৃহদ্বারে উপস্থিত হয় এবং অনুমতি প্রার্থনা করে, আর গৃহদ্বারে কোন পর্দা না থাকে, তবে ঠিক সোজাসুজি গৃহদ্বারের দিকে মুখ করে যেন না দাঁড়ায় এবং ঘরের ভিতরের দিকে যেন না তাকায়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে বসর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন কারো বাড়ীতে গমন করতেন, ঠিক তার দুয়ারের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন না; বরং ডানে বাঁয়ে দাঁড়িয়ে বলতেন, আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম, এর কারণ এই যে, সে যুগে গৃহ দ্বারে সাধারণত পর্দা দেয়া থাকতো না।

(আবু দাউদ শরীফ)

হযরত সাহল এবনে সাদ সায়িদী বর্ণনা করেন, একবার এক ব্যক্তি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হুজরা শরীফের ভিতরে উকি দিয়ে দেখলেন। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাতে একটি ক্ষুরধার লৌহখন্ড ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যদি আমি জানতে পারতাম যে সে আমাকে দেখছে তবে আমি তার চক্ষুতে লৌহখন্ড প্রবেশ করাতাম, কারো গৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনার আদেশ শুধু গৃহের দিকে না

দেখার জন্যেই দেয়া হয়েছে। যখন দেখেই ফেলেছে তখন আর প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা অহেতুক।

(বগভী)

হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যদি কোন ব্যক্তি তোমার অনুমতি ব্যতীত উঁকি মেরে তোমাকে দেখে আর তুমি কোন কংকর তার প্রতি নিক্ষেপ কর, আর সেই কংকরের কারণে তার চক্ষু বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে তাতে তোমার কোন পাপ হবেনা। (আহমদ, বোখারী, মুসলিম)

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

আর আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

অর্থাৎ তোমাদেরকে আল্লাহ পাক যে সব আদেশ দিয়ে যাচ্ছেন, তোমরা তার উপর কতখানি আমল কর, আর কতখানি আমল করনা সে সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল।

মূলতঃ মানুষের জীবন বৈচিত্রময়। কখনও সে সুস্থ কখন অসুস্থ থাকে, কখনও সে আনন্দিত কখনও চিন্তিত থাকে, কখনও কারো সাক্ষাতে মন আনন্দিত হয়, আর কখনও মনের অবস্থা এমন হয় যে একই ব্যক্তির মোলাকাতে বিরক্তি বোধ করে। দুশ্চিন্তা, অসুস্থতা, ব্যস্ততা সবই ক্ষেত্র বিশেষে এর কারণ হতে পারে। এজন্যে কোন গৃহকর্তা যদি কোন আগমনকারীকে গৃহে প্রবেশের অনুমতি না দেয় তবে বিরক্তিবোধ করা বা অধৈর্য্য হওয়া উচিত নয়; বরং অসংকোচে বিনা দ্বিধায় ফিরে যাওয়াই শ্রেয়। মনে রেখ, আল্লাহ পাক তোমাদের দৈহিক মানসিক অবস্থা সম্পর্কে যেমন অবগত, ঠিক তেমনিভাবে তোমাদের আচরণ সম্পর্কেও তিনি সম্পূর্ণ অবহিত। এমনকি তোমাদের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে যে নিয়ত বা ইচ্ছা থাকে সে সম্পর্কেও তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। তোমাদের প্রয়োজনে এবং তোমাদের কল্যাণার্থে আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে তাঁর বিধান প্রবর্তন করেছেন। কারো ঘরে প্রবেশের জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করার এ বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে চোদ্দশ' বছর পূর্বে। আর এ বিধান এসেছে বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের তরফ থেকে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে, বিশ্ব মানবের কল্যাণের লক্ষ্যে। কিন্তু কোন কোন আধুনিক ব্যক্তি মনে করেন, এদেশে ইংরেজদের ক্ষমতার আমলে অনুমতি প্রার্থনার এ নিয়ম তারা প্রবর্তন করেছে। অথচ যারা এ ভুল ধারণা করেন, তারা এ সত্য সম্পর্কে অবগত নন যে পবিত্র কোরআন বহু পূর্বেই মানব জাতিকে পরস্পরের সম্পর্ক উন্নয়ন ও সংরক্ষণের প্রয়োজনে এ বিধান প্রবর্তন করেছে। বস্তুতঃ পবিত্র কোরআন মানব জাতির সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিধান প্রবর্তন করেছে। ক্ষেত্র বিশেষে অমুসলিমরাও পবিত্র কোরআনের কোন কোন বিধানের উপর আমল করে

লাভবান হচ্ছে, অথচ মুসলমানগণ এ সম্পর্কে গাফেল, শুধু তাই নয়; বরং পবিত্র কোরআনের বিধানকে অমুসলিমদের প্রবর্তিত বিধান মনে করতেও দ্বিধাবোধ করেনা।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ

যে গৃহে কেউ বাস করেনা, তাতে তোমাদের দ্রব্য সামগ্রী থাকলে, সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোন গুনাহ নেই।

শানে নজুল

এবনে আবি হাতেম মোকাতেল এবনে হাব্বানের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যখন কারো ঘরে প্রবেশের জন্যে অনুমতি প্রার্থনার হুকুম নাজিল হল, তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! কুরাইশের অনেক ব্যবসায়ী মক্কা মদীনা এবং সিরিয়ার মধ্যে যাতায়াত করেন। পথিমধ্যে তাদের অবস্থানের স্থান নিদৃষ্ট হয়। যে সব ঘরে কেউ থাকেনা, সেখানে কার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করবেন? কাকে সালাম দিবেন। এ কথার জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ মসজিদ, মাদ্রাসা, মুসাফিরখানা সরাই খানা প্রভৃতি যেখানে কোন নিদৃষ্ট লোক বাস করেনা, আর যেখানে যাতায়াত করতে কোন বাধা বিপত্তিও নেই, সেখানে যদি তোমাদের কোন মালপত্র থাকে অথবা ঐ সব স্থানে তোমাদের কোন প্রয়োজন থাকে, সেখানে প্রবেশের জন্যে তোমাদের কোন প্রকার অনুমতি প্রার্থনার প্রয়োজন নেই। আলামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, ওলামায়ে কেরাম এ সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করেন যে কোন্ ধরনের গৃহে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করা যায়।

ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে সে সব দোকান কক্ষ এবং বাড়ী-ঘর যা ভ্রমণকারীদের জন্যে প্রস্তুত করা হতো, তারা ঐ সব স্থানে অবস্থান করতো, নিজেদের মালপত্র রাখতো, এসব বাড়ী ঘরে অনুমতি ব্যতীতই প্রবেশ করা বৈধ ছিল।

তফসীরকার এবনে জায়েদ (রঃ) বলেছেন, এর দ্বারা ঐ সব বাড়ী ঘর উদ্দেশ্য যা ব্যবসার কেন্দ্র সমূহে প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্যে লোকেরা যাতায়াত করে।

হযরত ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ) বলেছেন, বাজারের দোকান সমূহে প্রবেশের জন্যে অনুমতি প্রার্থনার প্রয়োজন নেই।

আল্লামা এবনে সিরিন (রঃ) যখন বাজারের কোন দোকানে গমন করতেন, তখন বলতেন, আসসালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করবো? এরপর জবাবের অপেক্ষা না করেই তাতে প্রবেশ করতেন।

তফসীরকার আতা (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে গৃহ সমূহের কথা বলা হয়েছে তা হল বিরাণ বাড়ী ঘর। আর যে উপকৃত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা হল প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার ব্যবস্থা। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের بُيُوتًا শব্দের দ্বারা সে গৃহ সমূহ উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যেখানে কোন মানুষ বাস করেনা।

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

"আর আল্লাহ পাক জানেন যা কিছু তোমরা প্রকাশ কর এবং যা কিছু তোমরা গোপন কর।" এ সতর্কবাণী তাদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়েছে যারা আলোচ্য আয়াতের বিধানকে অমান্য করে এবং অনুমতি ব্যতীত মানুষের গৃহে প্রবেশ করে।

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

হে রসূল! মোমেনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।

অর্থাৎ যাদেরকে দেখা শরীয়ত মোতাবেক বৈধ নয়, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে বিরত থাকা মোমেন মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহর লানত সেই ব্যক্তির প্রতি যে বেগানা স্ত্রীলোককে দেখে আর সেই স্ত্রীলোকের প্রতিও যাকে দেখা হয়।

(বায়হাকী)

পূর্ববর্তী আয়াতে ব্যাভিচারের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে ব্যাভিচারের উপকরণ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে কেননা, কু-দৃষ্টিই হলো ব্যাভিচারের প্রথম সোপান। কু-দৃষ্টির মাধ্যমেই অন্যায় অশ্লীল কাজের পথ উন্মুক্ত হয়। তাই আল্লাহ পাক এ আয়াতে অন্যায় অশ্লীল কাজের উপকরণ সমূহ বন্ধ করার তাগিদ করে এরশাদ করেছেনঃ

প্রত্যেক মোমেন যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত এবং অবনমিত করে রাখে। এ পর্যায়ে হযরত বোরায়দা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)-কে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ হে আলী! অনিচ্ছাকৃত প্রথম দৃষ্টির অনুমতি রয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয়বারের দৃষ্টির অনুমতি নেই।

(আবু দাউদ, তিরমিজি)

অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃত দৃষ্টি যা হঠাৎ হয়ে থাকে তার জন্যে কোন শাস্তি নেই, কিন্তু দ্বিতীয় বারের দৃষ্টি স্বেচ্ছায় সাগ্রহে হয়ে থাকে, তাই তা অবৈধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এজন্যে আত্মশুদ্ধি লাভ করা একান্ত কর্তব্য।

হযরত জরীর এবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করি। হঠাৎ কোন পর পুরুষ বা পর নারীর প্রতি যদি দৃষ্টি পড়ে যায় তবে কি করণীয়? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আদেশ প্রদান করেন, সঙ্গে সঙ্গে চেহারা ফিরিয়ে নিবে।

হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে মুসলমানের কোন পর স্ত্রী লোকের সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি পড়ে যায় সে সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু বন্ধ করে ফেলে, আল্লাহ পাক তাকে তার এবাদতে বিশেষ স্বাদ প্রদান করেন।১

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে আল্লাহ পাক যে সব জিনিষ দেখা হারাম করেছেন সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করোনা; বরং চক্ষুকে অবনমিত করে রাখ। ঘটনাক্রমে যদি হঠাৎ কোন কিছ দেখা যায়, তবে দ্বিতীয়বার দেখবে না, অথবা পূর্ণ মাত্রায় দেখবে না; বরং চক্ষুকে অবনমিত করে রাখবে।

একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তোমরা রাস্তায় উপবিষ্ট হওয়া থেকে আত্মরক্ষা কর। লোকেরা বললো হুজুর কাজের জন্যে রাস্তায় বসারও প্রয়োজন হয়। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ তাহলে রাস্তার হক আদায় করতে থাক। লোকেরা বললো সেই হক কি? তিনি এরশাদ করলেনঃ দৃষ্টি অবনমিত করে রাখা, কোন লোককে কষ্ট না দেয়া, সালামের জবাব দেয়া, ভাল কথার শিক্ষা দেয়া, মন্দ কথা থেকে বিরত থাকা। তিনি এরশাদ করেনঃ তোমরা ছয়টি বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ কর, তাহলে আমি তোমাদের জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করছি। (১) কথা বলার সময় মিথ্যা কথা বলবে না। (২) আমানতের খেয়ানত করবে না। (৩) ওয়াদা খেলাফ করবে না (৪) দৃষ্টি অবনমিত করে রাখবে, (৫) হাতগুলোকে জুলুম থেকে রক্ষা করবে। (৬) নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে।

বোখারী শরীফে হাদীস সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার রসনা এবং লজ্জা স্থানকে আল্লাহ পাকের ফরমানের নিয়ন্ত্রনাধীন রাখে, তার জন্যে জান্নাতের দায়িত্ব নিলাম।

হযরত ওবায়দা (রাঃ) বলেন, যে কাজের পরিণতিতে আল্লাহ পাকের নাফরমানী হয় তা কবীরা গুণাহ। যেহেতু দৃষ্টিপাত অবশেষে ব্যাভিচারের ভূমিকায় পরিণত হয় তাই দৃষ্টিকে নিচু রাখার নির্দেশ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। যদি চক্ষু এবং দৃষ্টিকে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -৩২৩

অবনমিত রাখার অভ্যাস করা যায় এবং যা দেখা হারাম তা না দেখতে অভ্যস্ত হওয়া যায়, তবে আত্মশুদ্ধি লাভ করা সহজতর হয়। এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দৃষ্টি হলো শয়তানের তীরগুলোর মধ্যে একটি তীর। অতএব, কু-দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করা একান্ত কর্তব্য। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছেঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

হে রসূল! আপনি মোমেনদেরকে বলুন, তারা যেন চক্ষুকে অবনমিত করে রাখে তথা নিষিদ্ধ বস্তু সমূহের প্রতি তারা যেন কখনও দৃষ্টিপাত না করে। এরপরই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ

আর তারা যেন তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।

আবুল আলিয়া (রঃ) বলেছেন, পবিত্র কোরআনের এ আয়াত ব্যতীত আর যত স্থানে লজ্জাস্থানের হেফাজতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেখানে এর অর্থ হলো ব্যাভিচারে লিপ্ত না হওয়া। কিন্তু এ আয়াতে এর অর্থ হলো লজ্জাস্থান যেন কেউ না দেখে- তাকে আবৃত করে রাখা। শুধু নিজের স্ত্রী এবং বাঁদী ব্যতীত সকলের থেকে হেফাজত করা।

বাহ্জ এবনে হাকীমের দাদা বর্ণনা করেন যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, নিজের স্ত্রী এবং বাঁদী ব্যতীত আর সকলের থেকে লজ্জাস্থানের হেফাজত কর। আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! যদি মানুষ একা থাকে তবে কি আদেশ, তিনি এরশাদ করলেনঃ আল্লাহ পাক থেকে লজ্জা করা সর্বাধিক জরুরী (কেননা আল্লাহ পাক মানুষকে সর্বদা দেখেন)।

হযরত এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা নগ্ন হওয়া থেকে আত্মরক্ষা কর। কেননা তোমাদের সঙ্গে (সর্বদা) এমন সত্ত্বা (ফেরেশতাগণ) বর্তমান থাকে যারা কখনও তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। অতএব, প্রাকৃতিক প্রয়োজনের সময় অথবা কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকট গমন করার সময় ব্যতীত (সে যেন নগ্ন না হয়)। অতএব তোমরা তাদের থেকে লজ্জা কর এবং তাদের সম্মান কর।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ চোখের ব্যাভিচার হলো দেখা, রসনার ব্যাভিচার হলো কথা বলা, কানের ব্যাভিচার হলো কথা শ্রবণ করা, হাতের ব্যাভিচার হলো স্পর্শ করা, পায়ের ব্যাভিচার হলো চলা আর মন আকাঙ্খা করে এরপর লজ্জাস্থান এসবকে সত্যে প্রমাণিত করে অথবা মিথ্যায়।১

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -৩২৪

তফসীরে কবীর, খন্ড- ২৩, পৃষ্ঠা-২০৫

তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৮, পৃষ্ঠা-৫৬

ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ

অর্থাৎ চক্ষু অবনমিত করে রাখা তথা কু–দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করা তাদের জন্যে অত্যন্ত উত্তম আমল। কেননা, এভাবে মানুষ মানবতার অবমাননা তথা ব্যাভিচার থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।

إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক মানুষের কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই।

অতএব, মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য হল আল্লাহ পাককে ভয় করা। কেননা, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

এ আয়াতে রয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী যেন প্রতিটি মানুষ দৃষ্টিপাতের সময়ও সতর্কতা অবলম্বন করে। কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক কথাটিকে এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ

আল্লাহ পাক তোমাদের চোখের চুরিও জানেন এবং তোমাদের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে কি সব ভাবনার অবতারণা হয়, তা–ও তিনি জানেন।

যারা পাপাচার থেকে আত্মরক্ষা করতে স্বচেষ্ট হয়, আল্লাহ পাক তাদেরকে তৌফিক দান করেন। পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ পাকের বিধানকে অমান্য করে এবং অন্যায় অনাচার লিপ্ত হয়, তিনি তাঁর বিবেচনা অনুসারে তাদের যথাযোগ্য শাস্তির ব্যবস্থা করেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন প্রত্যেকটি চক্ষু ক্রন্দণ করবে, কিন্তু (এক) যে চক্ষু আল্লাহ পাকের নিষিদ্ধ বস্তু সমূহ দেখা থেকে বিরত থাকে।

(দুই) সেই চক্ষু যা আল্লাহর রাহে জাগ্রত থাকে।

(তিন) আর সেই চক্ষু যা আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে থাকে এবং অশ্রু নির্গত হয় যদিও সেই অশ্রু মাছির মাথার সমানই হোক না কেন।১

১। তফসীরে এবনে কাসির (উর্দু) পারা-১৮, পৃষ্ঠা-৫৬

وَقُلْ
لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ
زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا
يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ
اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ
بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ
اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى
عَوْرٰتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ
زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝٣١

তরজমা

(৩১) আর (হে রসূল।) ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনমিত করে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। আর যা কিছু আপনা-আপনি প্রকাশ পেয়ে থাকে তা ব্যতীত তারা যেন নিজেদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ না করে এবং তাদের ওড়না যেন নিজেদের বুকের উপর ফেলে রাখে, আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র এবং নিজেদের (অন্যান্য) স্ত্রী লোকগণ, তাদের দাস-দাসী এবং পুরুষদের মধ্যে কামনা-রহিত পুরুষ এবং বালকদের মধ্যে যারা এখনও নারীদের সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো সম্মুখে যেন তারা নিজেদের সাজ-সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সাজ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে মাটিতে পা না ফেলে। আর

হে মোমেনগণ। তোমরা সকলে আল্লাহ পাকের নিকট তওবা কর, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে পুরুষদেরকে দৃষ্টি নিচু করে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এ আয়াতে অনুরূপ ফরমান নারীদের উদ্দেশ্যে জারি করা হয়েছে। অর্থাৎ নারী পুরুষ মাত্রেরই কর্তব্য হলো নিজের দৃষ্টির হেফাজত করা। নৈতিক মান উন্নয়নে, চরিত্র সংশোধনে এর গুরুত্ব সর্বাধিক। এজন্যে মোমেন পুরুষ ও নারীদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, ব্যাভিচারের উপকরণ তথা নারী–পুরুষের অবাধ মেলা–মেশা এবং একে অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে যেন প্রত্যেকে বিরত থাকে। এজন্যে দৃষ্টির হেফাজতের তথা কু–দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করার বিশেষ তাগিদ রয়েছে আলোচ্য আয়াত সমূহে। এ নির্দেশের উপর আমল করার মাধ্যমে শুধু যে দৃষ্টির হেফাজত হয় তা নয়; বরং ঈমানের নূরের হেফাজত হয়।

শানে নজুল

এবনে আবি হাতেম মুকাতেল (রঃ)–এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ বলেছেন, একবার হযরত আসমা বিনতে মারছাদের (যিনি বণী হারেছার মহল্লায় বাস করতেন) কাছে কয়েকজন মহিলা আসলো, তারা ইজার পরিধান করা ছিল না। ফলে তাদের পায়ের গহণা দেখা যাচ্ছিল এবং তাদের বক্ষস্থলও খোলা ছিল। হযরত আসমা বললেন, কত নিকৃষ্ট এ আকৃতি, তখন এ আয়াত নাজেল হয়।

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ

"আর (হে রসূল!) মোমেন স্ত্রীলোকদেরকে বলে দিন যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে নিচু রাখে"।

অর্থাৎ যাকে দেখা বৈধ নয় তার জন্যে চোখ বন্ধ করে রাখে। এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে স্ত্রীলোকদের জন্যে বেগানা পুরুষকে দেখা সর্বক্ষেত্রেই নাজায়েজ। এটাই ইমাম শাফেয়ী (রঃ)–এর মত। আর ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন যে যদি আকৃষ্ট হওয়ার আশংকা না থাকে তবে স্ত্রীলোকেরা বেগানা পুরুষদের দেহের ঐসব অংশ দেখতে পারবে যেরূপ একজন পুরুষ অপর পুরুষের দেহের অংশ

দেখতে পারে। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) তাঁর মতের প্রমাণ স্বরূপ এ হাদীস পেশ করেছেন যে একবার হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) এবং হযরত মায়মুনা (রাঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় হযরত ইবনে উম্মে মকতুম সেখানে আসলেন। হযরত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা দু'জন পর্দায় চলে যাও। হযরত উম্মে সালমা বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! সে কি একজন অন্ধ ব্যক্তি নয়? তিনি এরশাদ করলেন, তোমরা দু'জনও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাওনা? (আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিজী)।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) তাঁর বক্তব্যের দলিল পেশ করেছেন যে বিদায় হজ্জের বছর খাছআম গোত্রের এক মহিলা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন এবং আরজ করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আল্লাহ পাক বান্দাদের উপর হজ্জ ফরজ করেছেন আর এ দায়িত্ব আমার বৃদ্ধ পিতার উপর অর্পিত হয়, এ অবস্থায় যে তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ। সঠিক ভাবে কোন যানবাহনে বসতেও পারেন না। তাই আমি কি তাঁর বদল হজ্জ করতে পারি? যা তার পক্ষ থেকে আদায় হবে, তিনি এরশাদ করলেন, হ্যাঁ। হযরত আব্দুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ঐ সময় ফজল হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পিছনে আরোহন করেছিল। সে ঐ স্ত্রী লোকটির দিকে দৃষ্টিপাত করলো আর স্ত্রীলোকটিও তার দিকে দেখছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজলের চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন (বোখারী শরীফ)। ইমাম তিরমিজী (রঃ) হযরত আলী (রাঃ)–এর সূত্রে এই হাদীস সংকলন করেছেন তবে তাতে এতটুকু বাড়তি কথা সংযোজন করেছেন যে হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আপনি আপনার চাচাত ভাইয়ের চেহারা ফিরিয়ে দিলেন? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি এক যুবককে আরেক যুবতীর দিকে আর এক যুবতীকে একজন যুবকের দিকে নজর করতে দেখেছি, তাদের উভয়ের মধ্যে শয়তানের অনুপ্রবেশ করার আশংকা হয়েছে। এবনে কাত্তান এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছেন, যদি ফেতনার আশংকা না থাকে তবে কোন পুরুষের দিকে স্ত্রীলোকের নজর করা বৈধ। কেননা রসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ স্ত্রীলোকটিকে মুখমন্ডল আবৃত করার হুকুম দেননি। আর যদি হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) স্ত্রীলোকটির দিকে দেখা বৈধ মনে না করতেন তবে প্রশ্ন করতেন না। আর হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) যা উপলব্ধি করছিলেন তা যদি সঠিক না হতো তবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে ঐ বিষয়ের উপর কায়েম রাখতেন না। অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েসকে যখন তার স্বামী তালাক দিলেন তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে হযরত এবনে উম্মে মকতুমের (অন্ধ) গৃহে ইদ্দতকাল

অতিবাহিত করার আদেশ দিয়েছিলেন। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে যদি কোন প্রকার আশংকা না থাকে তবে স্ত্রীলোক কোন অন্ধ পুরুষকে দেখতে পারে।১

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ এ আয়াতের মর্ম হলো এই যে স্ত্রীলোকদেরও কর্তব্য হলো তাদের চক্ষু অবনমিত করে রাখা, মন্দ,ঘৃন্য কাজ থেকে বিরত থাকা, নিজের সতীত্বের হেফাজত করা এবং পরপুরুষ থেকে নিজের সাজ-সজ্জা গোপন রাখা।

وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

আর তারা যেন তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, আর তারা তাদের সাজ সজ্জা প্রকাশ করবে না, তবে যা আপনা আপনি প্রকাশ পায়।

আলোচ্য আয়াতে زِيْنَتَ শব্দ দ্বারা পোষাক পরিচ্ছদ, অলংকারপত্র এক কথায় যাবতীয় সাজ সজ্জাকে বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ মেয়েরা তাদের দৈহিক সৌন্দর্য্য বা তাদের কোন সাজ-সজ্জাকে পর পুরুষের সম্মুখে প্রকাশ করবে না। এটি তাদের জন্যে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

অর্থাৎ যে সাজ সৌন্দর্য্য অনিচ্ছাকৃত ভাবে প্রকাশ পেয়ে যায়, যা গোপন রাখা সম্ভব হয়না, এমন কিছুর প্রকাশে অপরাধ নেই। কেননা এমন সাজ সজ্জার প্রকাশ যদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়, তবে তাদের পক্ষে কোন কাজ করাই সম্ভব হবেনা। এজন্যে মুখ ও হাতের তালু প্রকাশের অনুমতি রয়েছে। কেননা, হাতের তালু ও মুখ যদি ঢেকে রাখা হয় তবে তাদের কর্তব্য যথাযথ ভাবে পালন করা সম্ভব হয়না। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে زِيْنَتَ শব্দের অর্থ হল সৌন্দর্য্যের অংগ সমূহ। অথবা সাময়িকভাবে তারা যে সাজ সজ্জা গ্রহণ করে তা। ইমাম আবু হানিফা (রঃ), ইমাম মালেক (রঃ), ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এবং ইমাম আহমদ (রঃ) এর মতে মুখ এবং হাতের তালু অনিবার্য প্রয়োজনে প্রকাশ পেয়ে যায়, তাই এর অনুমতি রয়েছে। ইমাম তিরমিজী (রঃ) হযরত সাঈদ এবনে যুবাইর (রাঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর এ কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে مَا ظَهَرَ শব্দ দ্বারা চেহারা এবং হাতের তালুকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

তফসীরকার আতা (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর অনুরূপ অভিমতের কথাও বর্ণিত আছে। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে চেহারা, হাতের তালু এবং পা খুলে রাখার অনুমতি রয়েছে। তবে চার ইমামের মতে চেহারা এবং হাতের তালুর প্রকাশ নিষিদ্ধ নয়।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -৩২৫

এখানে উল্লেখযোগ্য যে একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত পর পুরুষের সম্মুখে মেয়েদের চেহারা প্রকাশ যেমন নিষিদ্ধ, তেমনিভাবে পুরুষদের জন্যেও পর নারীর চেহারা ও হাত দেখা বৈধ নয়। আর এ কারণেই পূর্ববর্তী আয়াতে পুরুষদেরকে তাদের দৃষ্টি অবনমিত করে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর তাৎপর্য হল, কোন নারী যদি একান্ত প্রয়োজনে তার হাত এবং চেহারা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়, তবে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করার অনুমতি পুরষদেরকে দেয়া হয়নি। আর এমনিভাবে নারীদের প্রতিও এই নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে, যেন তারা বেগানা পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে।

আল্লামা বয়জাবী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে অঙ্গ সমূহ গোপন রাখার নির্দেশ রয়েছে তার সম্পর্ক নামাজের সাথে। কেননা, স্বামী ও মোহরেম ব্যতীত অন্য কারো সম্মুখে স্ত্রী লোকের কোন অঙ্গই প্রকাশ করা বৈধ নয়, কিন্তু যদি অনিবার্য প্রয়োজনে তা করতে হয় তবে তার কথা স্বতন্ত্র, যেমন চিকিৎসার প্রয়োজনে এবং সাক্ষ্য প্রদানে এর অনুমতি রয়েছে।১

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, স্ত্রী লোকদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সবই ঢেকে রাখার যোগ্য। যখন সে গৃহ থেকে বের হয়ে আসে, তখন শয়তান তার দিকে উঁকি দেয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত এই হাদীস তিরমিজী শরীফে সংকলিত হয়েছে। অতএব, নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত এই আদেশের উপর সম্পূর্ণ ভাবে আমল করা নারী মাত্রেরই কর্তব্য। যদি দোকান থেকে সওদা আনার জন্যে কেউ না থাকে তবে এটিও তার একটি প্রয়োজন। আর এই প্রয়োজনের আয়োজন করতে পারে সে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে নেয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় কাপড় না থাকলে যথাসাধ্য নিজেকে ঢেকে সে বের হতে পারে। যাহোক, আলোচ্য আয়াতের زِيْنَتْ শব্দটির দু'টি অর্থ বর্ণিত হয়েছে। ১। পোষাক পরিচ্ছদ ২। অলংকার, সাজ-সজ্জা প্রভৃতি।

আল্লামা বয়জাবী (রঃ) এর মতে, আলোচ্য আয়াতের زِيْنَتْ শব্দের এটিই অর্থ। আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) এ আয়াতের زِيْنَتْ শব্দের অনুরূপ অর্থই বর্ণনা করেছেন। দলীল স্বরূপ তিনি পবিত্র কোরআনের অন্য একটি আয়াত তেলাওয়াত করেন।

خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

এ আয়াতে زِيْنَتْ অর্থ পোষাক পরিচ্ছদ, আর মসজিদ অর্থ নামাজ। অর্থাৎ প্রত্যেক নামাজের সময় তোমরা পোষাক পরিচ্ছদ গ্রহণ কর। এ অর্থ গ্রহণের তাৎপর্য হল এই, মেয়েদের পোষাক ও অলংকার প্রকাশ করা সুস্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ হবে।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -৩২৬-২৭

আর যেখানে পোষাক ও অলংকারের প্রকাশ নিষিদ্ধ, সেখানে নারী দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রকাশ করা অবশ্যই নিষিদ্ধ হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের زِيْنَتْ শব্দটির দ্বিতীয় অর্থ হল, সৌন্দর্য্যের স্থান। অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রকাশ নিষিদ্ধ। তবে চিকিৎসা বা সাক্ষ্য প্রদানের প্রয়োজনে যদি চেহারা বা হাতের তালু প্রকাশ পায়, তবে তা পর্দাহীনতা হবেনা। কিন্তু এমন অনিবার্য প্রয়োজন ব্যতীত পরপুরুষের সম্মুখে মেয়েদের চেহারা প্রকাশ করাও বৈধ নয়। যেমন, আল্লাহ পাক অন্য আয়াতেও এরশাদ করেছেন,

قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ

(হে রসূল!) আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে এবং মুসলমানদের স্ত্রীদেরকে বলুন, যেন তারা নিজেদের চাদর দ্বারা নিজেদেরকে ঢেকে নেয়। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াতে স্ত্রী লোকদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন তাদের মাথা ও চেহারাকে চাদর দ্বারা ঢেকে নেয়, যাতে করে একথা জানা যায় যে তারা স্বাধীন স্ত্রীলোক, বাঁদী নন। শুধু একটি চক্ষু উন্মুক্ত থাকবে যাতে করে তাদের পথ দেখতে অসুবিধা না হয়।

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ

"আর তারা যেন নিজেদের ওড়না তাদের বক্ষদেশে ফেলে রাখে"।

জাহেলিয়াতের যুগে আরবের স্ত্রী লোকেরা মাথায় ওড়না পরে তার দুই প্রান্ত তাদের পৃষ্ঠদেশে ঝুলিয়ে রাখতো। বক্ষদেশ অনাবৃত থাকতো। তাই এ কুপ্রথা বাতিল করে আলোচ্য আয়াতে ওড়নাকে বক্ষদেশে স্থাপন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ মেয়েরা যেন তাদের বক্ষদেশ গোপন রাখে। এভাবে তাদের চুল, ঘাড়, কর্ণ ও বক্ষ আবৃত থাকবে।

উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়শা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক সেই স্ত্রী লোকদের উপর রহম করুন, যারা প্রথমে হিজরত করেছিলেন এবং যখন এ আয়াত নাজিল হয়, তখন নিজেদের চাদরকে ছিঁড়ে ওড়না বানিয়েছিলেন, এরপর এর দ্বারা মাথা ঢেকেছিলেন। একবার হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট কয়েকজন মহিলা কোরাইশ বংশের মহিলাদের প্রশংসা করছিলেন। তখন হযরত আয়শা (রাঃ) বললেন, আমিও তাদের ফজিলত এবং উচ্চ মর্তবার কথা বলে থাকি, কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি আনসারী (মদীনাবাসী) মহিলাদের চেয়ে উত্তম কাউকে দেখিনি। তাদের অন্তরে আল্লাহ পাকের কিতাব পবিত্র কোরআনের প্রতি যে পরিপূর্ণ ঈমান রয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বিশেষ মর্যাদার দাবী রাখে। সূরায়ে নূরের এ আয়াত

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ

যখন নাজিল হয়, আর তাদের স্বামীরা যখন বাড়ীতে গিয়ে এ আয়াত তাদেরকে শুনিয়ে দেয়, সেই মুহূর্ত থেকেই আনসারী স্ত্রী লোকেরা তার উপর আমল শুরু করে দেয়। পরদিন ফজরের নামাজে যখন তারা হাজির হয় তখন তাদের মাথা ওড়না দ্বারা আবৃত ছিল।১

মেয়েরা কাদের সামনে প্রয়োজনে আসা যাওয়া করতে পারবে তার উল্লেখ রয়েছে পরবর্তী আয়াতে। তারা হল বারোজন। এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ

আর তাদের স্বামী, পিতা, স্বামীর পিতা, নিজেদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, নিজেদের ভাই, নিজেদের ভ্রাতুষ্পুত্র, নিজেদের ভাগ্নেয়, নিজেদের স্ত্রী লোকেরা, তাদের দাস–দাসী, তাদের নিজেদের কাজ কর্মের এমন পুরুষ যারা অন্য কোন গরজ রাখেনা, এমন বালক যারা এখনও নারী রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত আর কারো সম্মুখে যেন মেয়েরা নিজেদের সাজ সৌন্দর্য্য প্রকাশ না করে।

আলোচ্য আয়াতে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে যাদের সম্মুখে মেয়েরা যেতে পারে তন্মধ্যে সর্ব প্রথম এরশাদ হয়েছেঃ

اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ

অর্থাৎ তাদের স্বামীদের সম্মুখে তাদের সৌন্দর্য্য তারা প্রকাশ করতে পারবে। বরং তাদের সৌন্দর্য্য স্বামীদের উদ্দেশ্যেই হতে হবে। এখানে এ কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যে বারোজন মোহরেমের উল্লেখ রয়েছে এখানে, যাদের সম্মুখে মেয়েরা আসা যাওয়া করতে পারে, তারা কিন্তু সকলেই এক পর্যায়ের নন; কেননা স্বামীর পর পিতা, শ্বশুর এবং অন্যান্যদের উল্লেখ রয়েছে। অথচ যেভাবে স্বামীর সম্মুখে বেপর্দা হওয়া সম্ভব হয়, ঠিক তেমনিভাবে পিতা বা শ্বশুরের সামনে তা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ

اَوْ اٰبَآئِهِنَّ

অর্থাৎ তাদের পিতার সম্মুখে তারা যেতে পারবে, আর এতেই রয়েছে দাদা, নানা অন্তর্ভুক্ত।

اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ

এমনিভাবে স্বামীর পিতা তথা শ্বশুর এবং এ পর্যায়ে যারা রয়েছে

اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ

অর্থাৎ তাদের পুত্রদের এবং পৌত্রদের সকলকেই দেখা দেয়া বৈধ। আর

اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ তাদের স্বামীদের ছেলে।

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড–৮, পৃষ্ঠা –১৩৩

أَوْ إِخْوَانِهِنَّ তাদের ভ্রাতৃবৃন্দ। এমনিভাবে ভ্রাতস্পুত্র, ভাগ্নেয়-এই সকলের সম্মুখে আসা যাওয়া করার অনুমতি রয়েছে। أَوْ نِسَائِهِنَّ অর্থাৎ অন্য স্ত্রী লোকদের সামনেও তারা তাদের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করতে পারে। সেই স্ত্রী লোক মোমেন হোক বা অমুসলিম। অবশ্য কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য শব্দটি দ্বারা শুধু মুসলিম স্ত্রীলোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। অতএব, মুসলিম নারীর পক্ষে অমুসলিম নারীর সম্মুখে তাঁদের সৌন্দর্য্য প্রকাশ অনুচিত, কেননা, কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, পরপুরুষের ন্যায় এই শব্দ দ্বারা শুধু স্বাধীন মহিলাদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। তফসীরকার জুরায়েয (রঃ) এ মতই পোষণ করেছেন কেননা, পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ

অর্থাৎ তাদের বাঁদীদের সম্মুখে তারা সৌন্দর্য্য প্রকাশ করতে পারে।

أَوِ التَّابِعِينَ

চাকর বাকর, মেয়েদের প্রতি যাদের আকর্ষণ নেই, অতিবৃদ্ধ, অপ্রকৃতস্থ যারা শুধু খাবারের প্রয়োজনে পড়ে থাকে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল সে সব লোক যারা নপুংশক। আর সাঈদ এবনে জুবায়ের (রঃ) বলেছেন, তারা হল বুদ্ধিভ্রষ্ট, পাগল। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, তারা হল মুখান্নাস, অর্থাৎ পুরুষও নয়, নারীও নয়। (এ সমস্ত বিষয়ে ফেকাহ্‌র কিতাবে বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে)।

أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

অর্থাৎ সেই অপরিণত বয়স্ক বালক যারা নারীদের পর্দা সম্পর্কে অবগত নয়, তাদের সম্মুখে আসা যাওয়ায় অসুবিধা নেই।

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ

"আর তারা যেন এমনভাবে মাটিতে পা না ফেলে, যদ্বারা তাদের গোপন সাজ বুঝা যায়"।

এবনে জরীর হাজরামীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে একজন স্ত্রীলোক পায়ে ঝুমুর পরিধান করে লোকদের পার্শ্ব অতিক্রম করে এবং লোকেরা ঝুমুরের শব্দ শুনতে পায়, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

আল্লামা বগভী লিখেছেন, মেয়েরা যখন পায়ে ঝুমুর ব্যবহার করে মাটিতে সজোরে পা ফেলে, তখন পরপুরুষরা তাদের সম্পর্কে জানতে পারে। তাই এভাবে ঝুমুর পরিধান করে চলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা

বয়জাবী (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হল অলংকারের সাজসজ্জা প্রকাশ করা যেমন নিষিদ্ধ, ঠিক তেমনিভাবে অলংকারের শব্দও যেন শ্রুত না হয় সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এজন্যে বলা হয় যে স্ত্রীলোকের আওয়াজও স্ত্রীলোক। আর এ কারণেই স্ত্রীলোকের কোরআন শিক্ষা করা অন্য স্ত্রীলোকের নিকটই উত্তম। এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, পুরুষরা সোবহানাল্লাহ বলবে, মেয়েরা হাতে তালি বাজাবে।

এবনে হুমাম লিখেছেন, কোন স্ত্রী লোক যদি নামাজে উচ্চস্বরে পবিত্র কোরআন পাঠ করে তবে তার নামাজ ফাসেদ হয়ে যায়। পবিত্র কোরআন পর্দা প্রথার উপর কত বেশী গুরুত্ব আরোপ করে তা এ নির্দেশ দ্বারা সহজেই অনুমেয়।

وَتُوبُوا إِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا

আর হে মোমেনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা কর। প্রকৃত অবস্থা এই যে আল্লাহ পাকের বিধি নিষেধ পালনে প্রত্যেকেরই ত্রুটি হয়। এজন্যে সকলেরই তওবা করা উচিত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

كلكم خطاؤن......

তোমরা সকলে গুণাহগার, তবে ভাল গুণাহগার সে, যে তওবা করে।

(তিরমিজি, দারেমী, এবনে মাজাহ্)

কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে সূরায়ে নুরে আল্লাহ পাক যে বিধি-নিষেধ বর্ণনা করেছেন তা হলো, বর্বরতার যুগে তোমরা যা কিছু করতে তা থেকে তওবা কর। যদিও ইসলাম গ্রহণের কারণে আইয়ামে জাহিলিয়াতের কৃতকর্মের শাস্তি হবেনা, কিন্তু যখনই সে সব কথা মনে হয়, তখন লজ্জিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। আর ইসলাম গ্রহণের পর এসব গর্হিত কাজ না করার সংকল্প গ্রহণ করাও কর্তব্য।

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হয়তো তোমরা সফলকাম হবে"। অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে তওবা এবং ক্ষমা প্রার্থনার যে কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে তা গ্রহণের মাধ্যমে আশা করা যায়, তোমরা জীবন-সাধনায় সফল হবে।

তওবা ও এস্তেগফার

তফসীরকারগণ বলেছেন, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের সাফল্য তওবা

এস্তেগফারের সংগে সম্পৃক্ত। কেননা, প্রতি মুহূর্তে এবং প্রতিটি কথা ও কাজে মানুষ মাত্রেরই ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েই থাকে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় অন্যায় হয়েই থাকে, আর এর প্রতিকার শুধু তওবা এস্তেগফারের মাধ্যমেই হতে পারে।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-সে ব্যক্তির জন্যে অত্যন্ত আনন্দ যে তার আমল নামায় অধিক পরিমাণে এস্তেগফার দেখতে পাবে। হযরত আব্দুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নিজে শুনেছি, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, হে লোক সকল! তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের দিকে মনোনিবেশ কর। আমি নিজে দৈনিক একশত বার আমার পরওয়ারদেগারের নিকট তওবা করি। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহর শপথ! আমি দৈনিক সত্তরবারের চেয়ে বেশী স্বীয় প্রতিপালকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হই, তওবা করি। (বোখারী)

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি দৈনিক একশত বার ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তওবা করি।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে আমরা শুমার করতাম যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একশত বার বলতেনঃ

رَبِّ اغْفِرْلِى وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

অর্থাৎ হে পরওয়ারদেগার! আমাকে মাফ করুন, এবং আমার তওবা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি তওবা গ্রহণকারী এবং অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

(তিরমিজী, এবনে মাজা, আবু দাউদ)

আলোচ্য আয়াত সমূহে ব্যাভিচারের পথ বন্ধ করার কয়েকটি পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে, তন্মধ্যে একটি হলো, যে কোন মূল্যে মহিলাদের পর্দায় থাকা, পর্দার বিধানের উপর সুদৃঢ় ভাবে কায়েম থাকা, তাদের সৌন্দর্য কোন অবস্থাতেই পর পুরুষের সামনে প্রকাশ না করা, এমনকি তাদের পায়ে ব্যবহৃত অলঙ্কারের শব্দও যেন কোন পর পুরুষ শ্রবণ করতে না পারে সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের তাগিদ রয়েছে, যাতে করে তাদের চলা-ফেরা সম্পর্কে পর পুরুষরা জানতেও না পারে এমনি ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদ রয়েছে। ঝুমুরের আওয়াজ দ্বারা কেউ আকৃষ্ট হতে পারে বলে তা আলোচ্য আয়াতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এমনি অবস্থায় স্ত্রীলোকদের কোন বেগানা পুরুষের সঙ্গে কথা বলা, তাদের গান বাজনা করা, মজলিসে উপস্থিত হওয়া কত বড় অন্যায় অবৈধ কাজ তা সহজেই অনুমেয়।

পবিত্র কোরআনের এই সব বিধানের উপর আমল না করার ভয়াবহ পরিণতি

আজ সকলের সম্মুখেই প্রকাশ্য। সমাজ ও জাতীয় জীবনের অশান্তি ও দূর্গতির অন্যতম কারণ হলো পবিত্র কোরআনে বর্ণিত এই সব বিধানের প্রতি গাফলত। আজ শুধু পাশ্চাত্যের তথাকথিত উন্নত দেশেই নয়; বরং আমাদের দেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশ সমূহেও বেপর্দার বিষাক্ত হাওয়া অত্যন্ত জোরে শোরে বইছে, যা মানব জাতির মৌলিক অধিকারকে হরণ করছে। ইসলাম নারী জাতিকে যে অধিকার দিয়েছে তা রক্ষা করা হচ্ছে না। শুধু তাই নয়; বরং তার ইজ্জত সম্ভ্রমের কোন নিরাপত্তা এখন আর নেই, এমনকি প্রাণেরও নিরাপত্তা নেই। প্রতিদিন পত্র-পত্রিকায় সমাজ জীবনের যে কুৎসিত চিত্র প্রকাশিত হয় তা এ বক্তব্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রথমে নারীদেরকে বেপর্দা করা হয়, এরপর অবাধে মেলা-মেশা; এরপর ব্যাভিচার এবং পরিণতিতে হত্যাকান্ড পর্যন্ত হয়। এসবই অতি আধুনিকতার নামেই হয়। তাই পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা ব্যতীত মানব সভ্যতা রক্ষার আর কোন বিকল্প পথ নেই। পবিত্র কোরআন সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেঃ

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى

وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

(সুরায়ে আহযাব)

এবং তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে, আর প্রাচীন জাহেলিয়াতের যুগের ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। আর তোমরা নামাজ কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর। মূলতঃ আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে মানব জীবনের সাফল্য নির্ভর করে। পর্দা সম্পর্কীয় কোরআনী বিধান অমান্য করার কারণে সারা পৃথিবী আজ অশান্ত, সমস্যা জর্জরিত, সমাজ-জীবন কলুষিত। এ সমস্যার সমাধান দিয়েছে পবিত্র কোরআন, আর শুধু এতেই রয়েছে মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণ।

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ۚ اِنْ
يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٢﴾
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ
فَضْلِهٖ ۗ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ
اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۖ وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْۤ اٰتٰىكُمْ ۗ وَلَا
تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ﴿٣٣﴾

তরজমা

(৩২) তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী বা স্ত্রী নেই তাদের বিবাহ সম্পাদন কর; আর তোমাদের গোলাম বাঁদীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও, তারা যদি অভাবগ্রস্ত হয় তবে আল্লাহ পাক তাঁর দয়ায় তাদেরকে ধনী করে দেবেন। আর আল্লাহ পাকই তো স্বচ্ছলতা দান করেন, তিনি মহাজ্ঞানী।

(৩৩) আর যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই, যে পর্যন্ত না আল্লাহ পাক নিজ দয়ায় তাদের সামর্থ্য দান করেন, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে। আর তোমাদের গোলাম বাঁদীদের মধ্যে যারা তাদের মুক্তির জন্যে লিখিত চুক্তি করতে চায় তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণ লক্ষ্য কর। আর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ দান করেছেন তা থেকে তোমরা তাদেরকে দান কর, আর তোমাদের গোলাম বাঁদী যদি সততা রক্ষা করতে চায় তবে পার্থিব জীবনের লোভ লালসায় তাদেরকে ব্যাভিচারের জন্যে বাধ্য করোনা। আর যে তাদেরকে বাধ্য করে আল্লাহ তাদের অসহায় অবস্থার পর ক্ষমা করবেন, দয়া করবেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে ব্যাভিচারের ভয়াবহ পরিণতি এবং শাস্তির কথা ঘোষণার পর ব্যাভিচার থেকে আত্মরক্ষা করার পথ-নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন অনুমতি ব্যতীত কারো গৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। দৃষ্টি অবনমিত রাখার এবং পর্দা প্রথা কঠোরভাবে পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এমনিভাবে, মহিলারা যেন পায়ে ঝুমুর পরিধান করে সজোরে মাটিতে পা না ফেলে, এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে। ঝুমুর পরিধান করা নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু তার আওয়াজকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর উচ্চস্বরে নারীদের কথাবার্তাও নিষিদ্ধ এবং পর পুরুষের সম্মুখে যাতায়াতও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ সব কিছুই ব্যাভিচারের পথ বন্ধ করা এবং সমাজ জীবনকে পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতেও এই একই উদ্দেশ্যে আরও একটি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ

অর্থাৎ তোমাদের বিবাহযোগ্য নর-নারী তারা কুমার-কুমারীই হোক অথবা বিধবা বিপত্নীক হোক তাদের বিবাহ সম্পাদন কর, তাদের বিবাহ সম্পাদনে অযথা বিলম্ব করোনা। আলোচ্য আয়াতের ايامى শব্দটি ايم এর বহুবচন। এর অর্থ হল যে পুরুষের স্ত্রী নেই, অথবা যে নারীর স্বামী নেই, তারা অবিবাহিত, বিপত্নীক অথবা বিধবা যাই হোক না কেন। (লেসানুল আরব)

বিবাহের বিধান

তফসীরকারগণ লিখেছেন, যদিও আলোচ্য আয়াতের وَأَنكِحُوا শব্দটি আদেশ মূলক, তবে এ আদেশটি সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীগণ একমত যে আলোচ্য আয়াতের আদেশ অবশ্য কর্তব্য বা ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগেও বহু নারী পুরুষ অবিবাহিত ছিলেন। যদি এ আয়াতের আদেশ অবশ্য কর্তব্য হত, তবে এমনটি হওয়া সম্ভব ছিলনা। এমনিভাবে, আলোচ্য আয়াতে গোলাম বাঁদীর বিবাহ সম্পাদনের নির্দেশও রয়েছে। অথচ তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ ব্যাপারে একমত যে গোলাম বাঁদী যদি বিয়ে শাদীতে ইচ্ছুক না হয় তবে এজন্যে তাদেরকে বাধ্য করা যায় না। তবে ফেকাহবিদগণ বলেছেন, যদি কারো এমন অবস্থা হয় যে বিয়ে না করা হলে হারাম পন্থা অবলম্বনের আশংকা দেখা দেয়, এমন অবস্থায় বিয়ে করা ওয়াজেব হবে। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, যদি ব্যাভিচারে

লিপ্ত হওয়ার আশংকা হয় এবং সংযম অবলম্বনের শক্তির অভাব দেখা দেয় তবে এমন অবস্থায় বিয়ে করা ফরজ হয়ে যায়।

এবনে হুমাম লিখেছেন যে যদি এমন আশংকা দেখা দেয় যে বিয়ে না করলে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়ে যাবে, তবে বিয়ে ফরজ হবে। আর যদি অবস্থা এমন না হয় তবে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় তাহলে বিয়ে করা ওয়াজেব হবে। কিন্তু এ হুকুম তখনকার জন্যে যখন বিয়ের ব্যাপারে দায়িত্ব পালনে সঠিক যোগ্যতা থাকে। যদি এমন যোগ্যতার অভাব থাকে তবে বিয়ে মকরূহ হবে। ফেকাহবিদগণ একথাও লিখেছেন যে যদি যৌবনের উন্মাদনায় বিয়ের একান্ত প্রয়োজন হয়ে যায় এবং বিয়ে ফরজ বিবেচিত হয় তখনও মোহরানা আদায়ের সামর্থ্য থাকা পুর্বশর্ত হিসাবে বিবেচিত হবে।

হযরত সোমরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম চিরকুমার থাকতে নিষেধ করেছেন (তিরমিজী এবনে মাজাহ)। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিয়ে করার আদেশ দিতেন এবং অবিবাহিত অবস্থায় থাকতে নিষেধ করতেন এবং এরশাদ করতেন, এমন স্ত্রী লোককে বিয়ে কর যে স্বামীর সাথে অধিক পরিমাণে মহব্বত রাখে; আর অধিক পরিমাণে যার সন্তান হয়। কেননা আমি কেয়ামতের দিন তোমাদের সংখ্যাধিক্যের উপর গৌরব করবো (আহমদ, আবুদাউদ, নাসায়ী)।

অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, হে যুবক দল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিয়ের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিয়ে করে নেয়। আর যার আর্থিক সঙ্গতি না থাকে সে যেন রোজা রাখে। এই হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত আব্দুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস এবনে মাজাহ শরীফে সংকলিত হয়েছে যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني

বিয়ে আমার সুন্নত, যে আমার সুন্নতের উপর আমল করলো না; আমার আদর্শের সাথে তার সম্পর্ক রইলো না।

তোমরা বিয়ে কর, অন্য উম্মতদের মোকাবেলায় আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্যের উপর গৌরব করবো। যে সামর্থ্য রাখে তার বিয়ে করা উচিৎ। আর যার সামর্থ না থাকে তার রোজা রাখা উচিত। তিরমিজী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে পয়গম্বরগণের চারটি সুন্নত (১) লজ্জাশীলতা, (২) সুগন্ধির ব্যবহার (৩) মেসওয়াক এবং (৪) নিকাহ।

এবনে মাজাহ শরীফে সংকলিত একটি হাদীসে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি পাক পবিত্র অবস্থায় আল্লাহ পাকের সাথে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা রাখে তার উচিৎ যেন সে স্বাধীন স্ত্রীলোকদেরকে বিবাহ করে।

মোট কথা এই যে বিবাহ করার পর হক আদায় করতে না পারার আশংকা থাকলে অথবা বিবাহ করার পর কোন হারাম কর্মে জড়িত হওয়ার ভয় থাকলে বিবাহ করা হারাম অথবা মকরূহ তাহরীমী হবে। আর যে ব্যক্তি যৌবনের উম্মাদনায় পতিত হয় এবং ভয় হয় যে যদি বিবাহ না করে তবে ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং সে বিবাহের হক আদায় করতে সক্ষম থাকে তবে ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতে তার জন্যে বিবাহ করা ওয়াজেব।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, কয়েকজন সাহাবী উম্মুল মোমিনীনদের নিকট প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ঘরোয়া জীবনের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। এ জিজ্ঞাসার জবাবে তারা জানতে পারেন যে হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ঘরোয়া জীবনের সময়গুলো অসাধারণ এবাদতে অতিবাহিত হতোনা। তিনি নিদ্রিত থাকতেন, এবাদতও করতেন। তখন সাহাবায়ে কেরাম বলতে লাগলেন, আমাদের মধ্যে কে আছে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ন্যায় হতে পারে, আল্লাহ পাক তাঁর যাবতীয় ভুল-ত্রুটি মাফ করে দিয়েছেন। তখন একজন বললেন, আমি কখনও স্ত্রীলোকের কাছেও যাবনা। দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন, আমি গোশত খাবনা, তৃতীয় ব্যক্তি বললেন, আমি বিছানায় ঘুমাবনা।

এসব কথা সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অবগত হলেন, পরদিন তিনি সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দিলেন। আল্লাহ পাকের হামদ বর্ণনার পর তিনি এরশাদ করলেন, কি কারণে লোকেরা এসব কথা বলেছে? আমিতো নামাজ আদায় করি এবং নিদ্রিতও হই। রোযা রাখি এবং কখনও রোযা বাদ দেই এবং বিয়ে-শাদীও করি (এসবই আমার সুন্নাত)। যে আমার সুন্নত থেকে বিমুখ হবে, আমার সাথে তার সম্পর্ক নেই।

বোখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথা রয়েছে। তিনি বলেছেন, তোমরা বিয়ে শাদী কর, এই উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তির অনেক স্ত্রী ছিলেন, অর্থাৎ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি, যাঁর অনেক স্ত্রী ছিলেন, কিন্তু এ কারণে তাঁর মর্যাদা এতটুকু কমেনি।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, যে ব্যক্তি পারিবারিক জীবন যাপনকে আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে বাধা মনে করেনা, অর্থাৎ পারিবারিক জীবনের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেও সে আল্লাহ পাকের এবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকতে পারে, তার জন্যে বিয়ে করাই উত্তম। স্বয়ং হযরত রসূলে করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, আম্বিয়ায়ে কেরাম, সাহবায়ে কেরাম এবং অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এ আদর্শেরই অনুসারী ছিলেন। শত বাধা সত্ত্বেও আল্লাহর পথের সাধনায় তাঁদের কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি।

ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) শাগরেদ ছিলেন হযরত ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর। ইমাম আবু ইউসুফ ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর নিকট পাঠরত ছিলেন, ঠিক এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, আপনার পুত্রের এন্তেকাল হয়েছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঐ ব্যক্তিকে বললেন, আমি তোমাকে দায়িত্ব দিচ্ছি আমার পক্ষ থেকে ছেলের দাফন কাফনের ব্যবস্থা কর, আমি যদি এখান থেকে এখন যাই, তবে ছেলে ফিরে আসবেনা, কিন্তু ইমাম ছাহেবের নিকট থেকে এলম হাসিলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবো। এমনিভাবে হযরত গওসুল আযম শাহ আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) একবার বাগদাদের ঈদগাহে বক্তৃতারত ছিলেন, তাঁকে খবর দেয়া হলো "আপনার পুত্রের এন্তেকাল হয়েছে", হযরত গওসুল আযম (রঃ) সংবাদ দাতাকে বললেন, গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে তাকে নিয়ে আস। কিছুক্ষণ পর তাঁর পুত্রের জানাযা হাজির করা হল। তিনি নামাজে জানাযা আদায় করে দিলেন এবং বললেন, তোমরা তাকে দাফন করে দাও। এরপর তিনি পুনরায় বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। এটিই হলো সর্বোচ্চ মকাম যে দুনিয়ার কোন সম্পর্কই বন্দাকে আল্লাহর জিকির থেকে মাহরুম করেনা। মূলতঃ পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক একথাই এরশাদ করেছেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ
أَمْوَالُكُمْ ——— فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

"হে মোমেনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে যেন গাফেল না করে। আর যারা গাফেল হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত" (সূরা মুনাফিকুনঃ ৯ আয়াত)।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ ——— حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ

"(হে রসূল! আপনি) বলুন, যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ পাক, তাঁর রসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার চেয়ে অধিকতর প্রিয় হয় তোমাদের পিতা-মাতা, তোমাদের সন্তান-সন্ততি, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস; তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত" (সূরা তৌবাঃ ২৪ আয়াত)। অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ——— فَاحْذَرُوهُمْ

"হে মোমেনগণ! তোমাদের স্ত্রী এবং সন্তান সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থাক" (সুরা তাগাবুনঃ ১৪ আয়াত)।

একথা সুস্পষ্ট যে এবাদত যদি নফলও হয় তবু তা এবাদত। কিন্তু বিবাহের নিজস্ব মর্যাদা হলো এটি একটি জায়েয কর্ম। মৌলিক দিক থেকে এটা একটা এবাদত নয়। কারণ এবাদতের উদ্দেশ্যে এই কর্মকে নির্ধারিত করা হয়নি। যদি বিবাহ কর্মটি স্বয়ং একটি এবাদত হতো তবে বিবাহ করার জন্যে মুসলমান হওয়া জরুরী হতো। কারণ এবাদত হওয়ার জন্যে ইসলাম গ্রহণ করা পূর্বশর্ত। বোখারী এবং মুসলিম শরীফে হযরত ওমর এবনে খাত্তাব (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত আছে যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দুনিয়া হাছেল করার উদ্দেশ্যে অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে যার হিজরত হয় তার হিজরত (আল্লাহর উদ্দেশ্যে গণ্য হবে না) সেই কর্মের জন্যে গণ্য করা হবে যে উদ্দেশ্যে সে দেশ ত্যাগ করেছে। এখানে চিন্তার বিষয় হলো এই যে, যদি বিবাহ করা এবাদত হতো তবে কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করা (অর্থাৎ এবাদত) হিসেবে গণ্য করা হতো।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেছেন, জাগতিক বস্তু সমূহের মধ্যে আমার জন্যে তিনটি বস্তু পছন্দনীয় করা হয়েছে। (১) স্ত্রী, (২) সুগন্ধী, (৩) আর আমার নয়ন ও মনের তৃপ্তি রয়েছে নামাজে। (নেসায়ী, তেবরানী)

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"তারা যদি অভাবগ্রস্ত হয় তবে আল্লাহ পাক তাঁর দয়ায় তাদেরকে ধনী করে দেবেন"।

আয়াতের প্রথমাংশে বিবাহযোগ্য নর-নারীর বিবাহের ব্যবস্থা করার নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু এ নির্দেশ পালনে কোন কোন সময় বাধা সৃষ্টি হয় অভাব অনটনের কারণে, আশংকা দেখা দেয় যে বিবাহের পর স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করা কঠিন হবে। এ আশংকায় লোকেরা বিবাহ বিমুখ থাকে। আলোচ্য আয়াতে এমন বিবাহ-বিমুখ লোকদেরকে এ সম্পর্কে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং ঘোষণা করা হয়েছে, দারিদ্র দূরীভূত করা, ধন-সম্পদের অধিকারী করা আল্লাহ পাকের হাতেই রয়েছে। আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে ধন-সম্পদের মালিক করে দেন। তার দারিদ্র্যের দুঃখ দূরীভূত করে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ দান করেন। অতএব, তোমরা দারিদ্র্যের ভয়ে বিয়ে শাদীর ব্যাপারে শরীয়তের বিধানের কথা ভুলে যেওনা। সব কিছুই এক আল্লাহ পাকের হাতে, তাঁর মর্জি বিনা কিছুই হয়না। অতএব, বন্দার কর্তব্য হল আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস এবং ভরসা রাখা, আল্লাহ পাকের বিধান

মেনে চলা এবং তাঁর সন্তুষ্টির অন্বেষণ করা। অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا

"আর পৃথিবীতে যত প্রাণী রয়েছে সকলের রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহ পাকের উপরই রয়েছে"। বস্তুতঃ অর্থ-সম্পদ এমন এক বস্তু, যা সর্বদা আসা যাওয়া করে থাকে, কখনও তা একজনের হাতে থাকে, আবার কখনও অন্যজনের। এজন্যে অর্থ-সম্পদ হাতে থাকলে তার উপর ভরসা করতে নেই, যে কোন সময় তা চলেও যেতে পারে। আর অর্থ-সম্পদ না থাকলে নিরাশও হতে নেই কেননা যে কোন সময় তা আসতেও পারে।

কোন কোন তফসীরকার يُغْنِهِمُ اللّٰهُ (আল্লাহ পাক তাদেরকে সম্পদশালী করবেন) বাক্যের অর্থ বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে সম্পদশালী করে দেন, তথা অল্পে তুষ্ট করে দেন। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, বাক্যটির অর্থ হলো বিয়ের পর আল্লাহ পাক দ্বিগুণ রিজিক দান করবেন। অর্থাৎ স্বামীর রিজিক এবং স্ত্রীর রিজিক। এজন্যেই তো আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে এই ওয়াদা করেছেন যে বিয়ের পর আল্লাহ পাক তাদের অভাব দূর করে দেবেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, সেই ব্যক্তির প্রতি বিস্মিত হতে হয় যে বিয়ে শাদী না করে সম্পদের প্রার্থী হয় অথচ আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ

অর্থাৎ তারা যদি দারিদ্র প্রপীড়িত হয় তবে আল্লাহ পাক তাঁর দানে তাদেরকে ধন্য করে দেবেন।

বাজ্জার, খতীব এবং দারে কুতনী হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা বিয়ে কর স্ত্রী নিজেই সম্পদ নিয়ে আসবে। অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে অর্থ-সম্পদের দ্বার উন্মুক্ত করে দেবেন।

সা'লাবী এবং দায়লামী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে এ মর্মের হাদীস সংকলন করেছেন।

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ

আর যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই যে পর্যন্ত না আল্লাহ পাক নিজ দয়ায় তাদের

সামর্থ্য দান করেন সে পযন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে।

এ আয়াতে তাদের কথা বলা হয়েছে, যারা আদৌ বিয়ে করার সামর্থ্য রাখেনা, তাদের কর্তব্য হলো আত্মসংযম করা যে পর্যন্ত না আল্লাহ পাক তাদেরকে স্বচ্ছলতা দান করেন।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে نكاحا শব্দটির তাৎপর্য হলো বিয়ে–শাদীর আসবাবপত্র যা ব্যতীত সাধারণতঃ বিয়ে হয়না, যেমন স্ত্রীর মোহরানার হক্ব; এমনিভাবে স্ত্রীর খোরপোষ এবং অন্যান্য ব্যয় ভার, যাদের এ সামর্থ্য না থাকে, তাদের কর্তব্য হলো আত্মসংযম করা, আর তার পন্থা হলো স্বল্প পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করা, রোজা রাখা।

وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ

"আর তোমাদের মালিকানাধীন গোলাম–বাঁদীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্যে লিখিত চুক্তি করতে চাইলে তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও" (সূরা নূরঃ ৩৩ আয়াত)।

বগভী (রঃ) লিখেছেন, যখন এ আয়াত নাজিল হয়, তখন হাওতেব (রাঃ) তাঁর গোলামকে এক শত দীনার পরিশোধ করার শর্তে তাঁর সাথে লিখিত চুক্তি সম্পাদন করেন এবং (তেজারতের মাধ্যমে সেই টাকা অর্জনের জন্যে) তাকে ২০ দীনার প্রদান করেন। সুতরাং গোলাম (টাকা উপার্জন করে) একশত দীনার পরিশোধ করে দিল (এবং মুক্তি পেয়ে গেল)। এই গোলাম হোনাইনের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

অধিকাংশ ওলামার মতে, এ আয়াতের নির্দেশ পালন করা মোস্তাহাব পর্যায়ের (ওয়াজের নয়, অর্থাৎ কাউকে চুক্তির মাধ্যমে মোকাতেব বানানো ওয়াজেব নয়)। হেদায়া কেতাবের গ্রন্থকারও এরূপ লিখেছেন এবং এটাকেই সহীহ হিসাবে বহাল রেখেছেন। হেদায়ার গ্রন্থকার আরও উল্লেখ করেছেনঃ আমাদের কোন কোন ওলামা كاتبوهم (তাদেরকে মোকাতেব বানাও) নির্দেশকে একটি জায়েয পর্যায়ের নির্দেশ বলে মনে করেন তা সঠিক নয়। অর্থাৎ আয়াতের অর্থ এই নয় যে গোলাম বাঁদীকে মোকাতেব বানানো জায়েয আছে; বরং মোকাতেব বানানো মোস্তাহাব হওয়াই এ আয়াতের অর্থ। কেননা যদি এ নির্দেশ পালন করাকে জায়েয হিসাবে ধরা হয়, তবে গোলামের মধ্যে মোকাতেব হওয়ার যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক সর্বাবস্থায় তাকে মোকাতেব বানানো জায়েয হবে। আর তখন যোগ্যতার শর্ত আরোপ করা অনর্থক হয়ে দাঁড়াবে।

জায়েয হওয়ার যুক্তিকে এভাবে কর্তন করা যায় যে কাজটি জায়েয হলে তার জন্যে শর্ত আরোপ করা সর্বদা স্বাভাবিক হয়ে যেতো। অথচ নিয়ম হলো এই যে মালিক তার গোলামকে শুধু তখনই মোকাতেব বানায় যখন তার মধ্যে মোকাতেব

হওয়ার যোগ্যতা দেখতে পায়। আর সে জন্যে এ আয়াতে শর্ত আরোপ করা উল্লেখিত হয়েছে।

কোন কোন ওলামায়ে কেরামের মতে كاتبوا নির্দেশটি এই কর্মকে ফরজ করার উদ্দেশ্যে ঘোষিত হয়েছে (অর্থাৎ যদি গোলাম মোকাতেব হওয়ার জন্যে আবেদন জানায় এবং তার মধ্যে মোকাতেব হওয়ার যোগ্যতা অনুমান করা যায় তবে মোকাতেব বানানো ফরজ)। আতা (রঃ) এবং আমর এবনে দীনার (রঃ)-এর এটাই হলো মত। অপর একটি বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহমদ (রঃ) এরও এই মত। কিন্তু তা ফরজ হওয়ার জন্যে শর্ত হলো এই যে গোলাম সেই পরিমাণ অর্থ বিনিময়ের জন্য আবেদন করবে যে পরিমাণ বাজারে তার প্রকৃত মূল্য হবে, অথবা তার চাইতে অধিক পরিমাণ অর্থ পরিশোধের ওয়াদা করবে। বগভী (রঃ) তাঁর তফসীরে লিখেছেন যে এবনে সীরীন তার মালিক হযরত আনাস এবনে মালেক (রাঃ)-এর কাছে আবেদন করলেন যে আমাকে মোকাতেব বানিয়ে দিন। হযরত আনাস কিছুটা বিব্রত বোধ করলেন। এবনে সীরীন তখন হযরত ওমর (রাঃ)-এর দরবারে গিয়ে অভিযোগ করে দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) চাবুক হাতে হযরত আনাস (রাঃ) এর দিকে ছুটে গেলেন এবং মোকাতেব বানানোর নির্দেশ দিলেন। তখন হযরত আনাস এবনে মালেক (রাঃ) এবনে সীরীনকে মোকাতেব বানালেন।

إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

"যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণ দেখতে পাও"।

গোলাম বাঁদী যদি মোকাতেব হতে চায় তবে তাদেরকে মোকাতেব বানিয়ে দাও, যদি তাদের মধ্যে কল্যাণ লক্ষ্য কর। আলোচ্য আয়াতের خير শব্দটির ব্যাখ্যায় তত্ত্বজ্ঞানীগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। যদিও এ শব্দটির অর্থ সাধারণ ভাবে কল্যাণ বলা হয়, কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ), ইমাম মালেক (রঃ) এবং সুফিয়ান সওরী (রঃ)-এর মতে, আলোচ্য আয়াতের এ শব্দটির অর্থ আয় রোজগারের শক্তি। এমন অবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে কেনা গোলাম বাঁদী যদি নিদৃষ্ট অংকের অর্থ তার মালিককে আদায় করার শর্তে স্বাধীন হতে চায়, আর তার মধ্যে আয় রোজগার করার শক্তি সামর্থ থাকে তবে তাকে মোকাতেব বানাও। হাসান বসরী (রঃ), জাহ্যাক (রঃ) এবং মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের خير অর্থ ধন-দৌলত। তাঁরা তাদের বক্তব্যের পক্ষে দলীল হিসাবে অসিয়ত সম্পর্কীয় আয়াতাংশ ان ترك خيرا পেশ করেছেন, এর অর্থ হল, যদি মৃত ব্যক্তি অর্থ সম্পদ রেখে যায়। আয়াতাংশে خيرا শব্দের 'অর্থ-সম্পদ' গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্ণিত আছে যে হযরত সালমান ফারসীর (রাঃ) কোন গোলাম তাঁর নিকট

তাকে মোকাতেব বানাবার আরজী পেশ করলেন, হযরত সালমান তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার কাছে কি অর্থ-সম্পদ আছে? সে বললো, না। তখন সালমান ফারসী তাকে মুকাতেব বানাননি। তাকে বলেছেন, তুই আমাকে মানুষের হাতের ময়লা অর্থাৎ সদকা খয়রাত খাওয়াবি (কেননা তার নিকট টাকা পয়সা নেই, তা সে আগেই বলেছে)।১

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) আলোচ্য আয়াতের خيرا শব্দটির যে ব্যাখ্যা করেছেন, (ধন-সম্পদ) তা গ্রহণযোগ্য নয় কেননা, গোলামের নিকট তার নিজস্ব কোন ধন-সম্পদ থাকেনা, গোলাম যতক্ষণ গোলাম থাকে, তখন তার সমস্ত সম্পদের প্রকৃত মালিক হবে তার মুনীব। আর স্বাধীনতা পাওয়ার জন্যে মুনীবকে টাকা দেয়া গোলামের অবশ্য কর্তব্য হয়, অথচ ঐ মুহূর্তে সে কোন সম্পদের মালিক থাকেনা।

ইব্রাহীম এবনে জায়েদ এবং ওবায়েদ (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের خيرا শব্দের অর্থ হলো সত্যবাদিতা এবং আমানতদারী।

বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) পক্ষ থেকে এই অর্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, এ অবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে যদি কোন গোলাম বা বাঁদী নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায়ের মাধ্যমে মোকাতেব হতে ইচ্ছুক হয়, তবে তাকে মোকাতেব কর, যদি তাদের মধ্যে সততা এবং আমানতদারী দেখ।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেছেন, خيرا শব্দটির উত্তম অর্থ হলো, আয়-রোজগার এবং আমানতদারী। অর্থাৎ গোলাম বাঁদীদের মধ্যে যদি আয়-রোজগারের যোগ্যতা থাকে এবং আমানতদারীর গুণ থাকে, তবে তাদেরকে মোকাতেব বানাও।

ফিকাহ শাস্ত্রের সুবিখ্যাত গ্রন্থ হেদায়ায় خيرا শব্দের অর্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে, 'মুসলমানদের জন্যে ক্ষতিকর হবেনা'। কেননা, যদি গোলাম কাফের হয়, আর তার দ্বারা মুসলমানদের ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে, এমন কাফেরকে মোকাতেব বানানো বৈধ নয়। কেননা তার দ্বারা মুসলমানদের ক্ষতির আশংকা থাকে। এজন্যে এমন গোলামকে মোকাতেব বানানোর অনুমতি নেই।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, ওবায়েদ (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতে خير শব্দটির অর্থ হলো নামাজ কায়েম করা। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, বুদ্ধিমান, সাবালক; অর্থাৎ যদি গোলাম অল্পবয়স্ক হয় বা পাগল হয়, তবে তাকে মোকাতেব করা হবেনা।

এখানে এ কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, প্রাক-ইসলামিক যুগে দাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পর বিভিন্ন ভাবে দাস-প্রথাকে বিলোপ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে দাস প্রথা বিলোপ করার একটি প্রশংসনীয় পন্থা

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -৩৫৫

নির্দেশ করা হয়েছে। কোন গোলাম–বাঁদী যদি অর্থের বিনিময়ে স্বাধীনতা পেতে চায়, তবে তাকে এই সুযোগ দেয়ার নির্দেশ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। পরস্পরের মধ্যে একটা সমঝোতার স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ হবে যে, নির্দিষ্ট অর্থ আদায় করতে পারলে তাকে স্বাধীনতা দেয়া হবে। এ মর্মে মুনীব এবং গোলামের মধ্যে একটি দলিল লিপিবদ্ধ হবে। যে গোলাম বা বাঁদী সম্পর্কে দলিল লিপিবদ্ধ হয় তাকে মোকাতেব বলা হয়। এতে গোলাম বাঁদীর কল্যাণ থাকে নিহিত। এজন্যে যদি কোন মালিকের নিকট গোলাম বাঁদী এমন আরজি পেশ করে, তবে তা মঞ্জুর করা এবং স্বীকৃতি নামা লিখে দেয়া তার কর্তব্য। আলোচ্য আয়াতে একথারই নির্দেশ রয়েছে। অবশ্য ঐ স্বীকৃতি নামায় লিপিবদ্ধ থাকবে; স্বাধীনতা লাভের পর সে পথভ্রষ্ট হবেনা, চুরি করবেনা, অন্যায় অশ্লীল কাজে লিপ্ত হবেনা। যদি গোলাম সততাপরায়ণ, আমানতদার, আয় রোজগারে সমর্থ হয়, তার মধ্যে ঈমানদারী ও আমানতদারীর গুণ থাকে, তবে এমন গোলাম বাঁদীর সঙ্গে মোকাতেবাত হতে পারে তথা তাকে স্বীকৃতিনামা লিখে দেয়া যেতে পারে। এরপর আরো এরশাদ হয়েছেঃ

وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِیْٓ اٰتٰىكُمْ

"আর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে যে ধন–সম্পদ দান করেছেন, তা থেকে তোমরা তাদেরকে দান কর"।

একথা সর্ব সাধারণকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। গোলামকে মুক্তি পেতে সাহায্য করার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যাকাতের টাকাই হোক বা সাধারণ দান অথবা ওয়াজেব নয় এরূপ দান হোক, এ ব্যাপারে সাহায্য করা চলে। কোন কোন তফসীরকারের মতে, এখানে ফরজ যাকাতের সেই অংশের কথা বলা হয়েছে যা, فى الرقاب ('গোলাম মুক্তির জন্যে' সুরা তৌবাঃ ৬০ আয়াত) আয়াতাংশ দ্বারা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এটিই হযরত হাসান বসরী (রঃ) এবং যায়েদ বিন আসলামের মত। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ আয়াতে গোলামের মালিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে যে মালিকদের জন্যে এ কাজটি মোস্তাহাব এবং ভিন্ন মতে এটি ওয়াজেব, যেন চুক্তির মাধ্যমে নিজের কিছুটা স্বার্থ ত্যাগ করা হয়।

হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত যুবায়ের এবং তাবেঈন ও সাহাবাগণের এক দলের মত এটিই। ইমাম শাফেয়ী (রঃ)ও এ মত গ্রহণ করেছেন। তবে মোকাতেবকে তার বিনিময়ের কত অংশ ছেড়ে দিতে হবে এ বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানীদের একাধিক মত রয়েছে।

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, মোকাতেব হওয়ার জন্যে আবেদনকারী গোলামের

যে মূল্য নির্ধারিত হবে তার এক চতুর্থাংশ যেন মুনিব মাফ করে দেয়।

আবদুর রাজ্জাক, সায়ীদ এবনে মনসুর, আবদ এবনে হুমায়েদ, এবনে জরীর, এবনুল মুনজের, এবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী এবনে আবদুর রহমান সালমার সূত্রে হযরত আলী (রাঃ)-এর এ মতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ মত শুধু হযরত আলীরই (রাঃ) নয়, বরং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথাই হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর মত হলো, যে গোলাম মোকাতেব হতে ইচ্ছুক, তার নির্ধারিত বিনিময় মূল্যের এক তৃতীয়াংশ মাফ করে দেয়া উচিত।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, মুনিব গোলামকে কতখানি ছেড়ে দেবে তা নির্দিষ্ট নেই, যা ইচ্ছা ছেড়ে দেবে। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এ মতই পোষণ করেছেন।

নাফে' (রঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) একটি গোলামকে পঁয়ত্রিশ হাজার দেরহাম বিনিময় মূল্য নির্ধারণ করে মোকাতেব বানালেন। ত্রিশ হাজার দেরহাম আদায় হবার পর অবশিষ্ট পাঁচ হাজার দেরহাম মাফ করে দিয়েছিলেন।

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ

"আর তোমাদের বাঁদীদেরকে ব্যাভিচার করতে বাধ্য করো না"।

শানে নজুল

মুসলিম শরীফে হযরত যাবের বিন আব্দুল্লাহর (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত আছে যে মোনাফেকদের নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল তার বাঁদী দ্বারা ব্যাভিচারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতো। মুসলিম শরীফে এ কথাও বর্ণিত আছে যে আব্দুল্লাহ বিন উবাই এর দু'টি বাঁদী ছিল। একজনের নাম ছিল 'মুসাইকা' এবং অপরজনের নাম ছিল 'উমাইমা'। আব্দুল্লাহ উভয়ের দ্বারা ব্যাভিচারের অর্থ উপার্জন করতো। এই অবস্থায় উভয় বাঁদীই হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে দিল। তখন এ আয়াত নাজেল হয়।

হযরত যাবেরের সূত্রে আবু যুবাইরের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে হাকেম বর্ণনা করেন যে 'মুসাইকা' জনৈক নাসারার বাঁদী ছিল। সে অভিযোগ করেছিল যে আমার মালিক আমাকে ব্যাভিচারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে বাধ্য করছে, তখন এ আয়াত নাজেল হয়।

বাজ্জার এবং তিবরানী হযরত আব্দুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি

দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ এবনে উবাই এর একটি বাঁদী ছিল। সে বর্বরতার যুগে ব্যাভিচারে লিপ্ত থাকতো। ইসলামের আবির্ভাবের পর ব্যাভিচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। তখন ঐ বাঁদীটি শপথ করে বললো, আমি আর কখনও ব্যাভিচার করবো না। তার সম্পর্কে এ আয়াত নাজেল হয়।

সাঈদ এবনে মানছুর হযরত একরামার কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে মুসাইকা এবং মাআজা নাম্নী দু'টি বাঁদী ছিল আব্দুল্লাহ বিন উবাই এর। সে তাদের দ্বারা ব্যাভিচার করাতো। অবশেষে যখন ইসলামের আবির্ভাব হলো তখন তাদের একজন বললো, যদি এ কর্মটি ভাল হয় তবে তা আমি অনেক করেছি। পক্ষান্তরে, যদি তা ভাল না হয় তবে তা বর্জন করাই উচিৎ। তখন এ আয়াত নাজেল হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ একথাও বর্ণিত আছে যে একটি বাঁদী আব্দুল্লাহর কাছে ব্যাভিচারের দ্বারা উপার্জিত একটি চাদর নিয়ে উপস্থিত হলো এবং অপর বাঁদীটি একটি দীনার নিয়ে হাজির হলো। আব্দুল্লাহ বললো, যাও আরও কিছু কামাই করে নিয়ে এস। বাঁদীরা বললো, 'আল্লাহর কসম! আমরা একাজ আর করবো না। ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। আল্লাহ পাক ব্যাভিচারকে হারাম করে দিয়েছেন। কিন্তু তবু যখন আব্দুল্লাহ তাদেরকে বাধ্য করার চেষ্টা করলো তখন উভয়ে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে নিজেদের দুঃখের কথা বর্ণনা করলো। তখন এ আয়াত নাজেল হলো।

মোকাতেল (রঃ)-এর বর্ণনা মোতাবেক সা'লাবী (রঃ) বলেন যে আব্দুল্লাহর কাছে কুকর্মের জন্যে ছয়টি বাঁদী ছিল এবং এদের ব্যাপারেই উল্লেখিত আয়াত নাজেল হয়েছে।

إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا

যখন "তারা পবিত্র থাকতে চায়"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেন যে এ আয়াতাংশে إِنْ শব্দটি তার প্রকৃত অর্থ 'যদি' অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে 'যখন' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা যে ঘটনার প্রেক্ষাপটে আয়াতখানি নাজেল হয়েছে তার সাথে এই অর্থ সামঞ্জস্য পূর্ণ। কারণ এ ঘটনায় বাঁদীরা নিজেদেরকে পবিত্র রাখার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিল এবং যদিও তারা পবিত্র থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল কিন্তু বাঁদীদের তরফ থেকে পবিত্র থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করা সচরাচর কমই হয়ে থাকে। কারণ তাদের মধ্যে মুনিবের ধমকি এবং চোখ রাঙানির ভয় থাকে এবং বোধশক্তিও তাদের কম থাকে। অধিকন্তু তাদের জৈবিক চাহিদাও বিদ্যমান থাকে। এতদসত্ত্বেও যদি কখনও তারা পবিত্র থাকতে ইচ্ছা করে তবে তোমরা কেমন লোক? আর কেমন তোমাদের আত্মমর্যাদা?

যে তোমরা তাদেরক ব্যাভিচার করতে বাধ্য করছো?

সুতরাং এরূপ জঘন্য কর্ম তোমাদের করা উচিৎ নয়।

لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

"জাগতিক কিছু অর্থ (সুবিধা) অর্জনের উদ্দেশ্যে" (বাঁদীদেরকে ব্যাভিচার করতে বাধ্য করোনা)।

অর্থাৎ তোমরা তাদের অবৈধ কাজের দ্বারা অর্থ উপার্জন করতে চাও এবং তাদের সন্তান বিক্রয় করে সম্পদ লাভ করতে চাও এবং এজন্যেই তাদেরকে ব্যাভিচার করতে বাধ্য করছো; এমন ঘৃন্য কাজ চিরবর্জনীয়।

وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"আর যে তাদেরকে ব্যাভিচারের জন্যে বাধ্য করবে, গুণাহ তারই হবে, সুতরাং বাধ্য হয়ে বাঁদীরা যে গুনাহ করেছে আল্লাহ পাক তা ক্ষমা করবেন, কেননা তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।১

কেননা, তারা ছিল অত্যন্ত অসহায়, একান্ত অনন্যোপায়, শুধু নিজেদের প্রাণ রক্ষার্থেই তারা অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়েছে। তাই আল্লাহ পাকের রহমত থেকে তাদের নিরাশ হওয়া উচিত নয়।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ জাহেলিয়াত যুগে নিকৃষ্ট ও ঘৃন্য কাজগুলোর, মধ্যে এটিও একটা জঘন্যতম গুণাহ ছিল যে কাফেররা তাদের বাঁদীদেরকে ব্যাভিচার করতে বাধ্য করতো এবং সেই ব্যাভিচারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতো, ইসলাম আবির্ভূত হয়ে এই কু-প্রথাকে দূরীভূত করে দিল। বর্ণিত আছে যে এই আয়াত মোনাফেক সর্দার আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলূলের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। কেননা সে এই কু-কর্মে লিপ্ত ছিল যেন অর্থ-সম্পদও উপার্জন হয় এবং বাঁদীর গর্ভজাত সন্তান দ্বারা তার জনশক্তিও বৃদ্ধি হয়। তার বাঁদীর নাম ছিল 'মাআজাহ' অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে তার নাম ছিল 'মোসাইকা'। পরে এই মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি ব্যাভিচার করতে অস্বীকার করলেন। জাহেলিয়াতের যুগ থেকে একাজ চলে আসছিল। এমনকি তার অবৈধ সন্তান-সন্ততিও হয়েছিল। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তিনি একাজ করতে অস্বীকার করে দিলেন। ফলে এই মোনাফেক এবনে উবাই তাকে নানা রকম নির্যাতন করতে লাগলো। তখন এই আয়াত নাজেল হয়।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লাম এরশাদ করেছেন, যেহেতু এই বাঁদীদেরকে হীন কাজে কাফের মোনাফেকরা বাধ্য করতো তাই আল্লাহ পাক তাদেরকে মাফ করে দেবেন। কিন্তু যে সব মুনিবরা তাদেরকে অন্যায় কাজে বাধ্য করতো তাদের কঠিন শাস্তি হবে।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -৩৫৮-৫৯

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ
خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ۝٣٤ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ
الْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ
الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ
زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ
تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ
اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝٣٥ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ
أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝

তরজমা

(৩৪) আর নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট নাজিল করেছি সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ, অতীতের লোকদের দৃষ্টান্ত আর পরহেজগার লোকদের জন্যে উপদেশ।

(৩৫) আল্লাহ পাক আসমান জমীনের নূর। তাঁর নুর বা আলোর দৃষ্টান্ত যেন একটি তাক,যার উপর রাখা আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি কাঁচের ভেতরে এবং ঐ কাঁচটি যেন একটি উজ্জ্বল তারকা যার উপরে শুধু পূর্বের আলো অথবা শুধু পশ্চিমের রোদ্রই পড়েনা; বরং জয়তুন নামক একটি মহান বৃক্ষের তৈলও ঐ প্রদীপে জ্বলে, আগুনের স্পর্শ ব্যতীতই জ্বলে উঠবে মনে হয় এমন পরিচ্ছন্ন ঐ তৈল। আলোর উপর আলো, আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে পথ-নির্দেশ করেন তাঁর আলোর দিকে। আল্লাহ পাক মানুষের জন্যে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে থাকেন। আর আল্লাহ পাক সব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

(৩৬) সেই সকল গৃহে যাকে সমুন্নত করতে এবং যাতে আল্লাহ্ পাকের নাম স্মরণ করতে তিনি নির্দেশ প্রদান করেছেন, সকাল সন্ধ্যায় তারা তাঁর পবিত্রতার মহিমা ঘোষণা করে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে অন্যায় অনাচার, অশ্লীল, অসামাজিক কাজ পরিহার করার নির্দেশ রয়েছে। যারা অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয় তাদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে আর যেসব পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে অন্যায় অশ্লীল কাজ থেকে আত্মরক্ষা করা যায়, সে সব পন্থা অবলম্বনেরও পথ-নির্দেশ করা হয়েছে। সমগ্র মানব জাতির সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে বিশেষ নসীহত ও উপদেশ রয়েছে। যারা আত্ম-সংশোধন করে এবং অন্যায় অনাচার থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়, আত্ম-কল্যাণ সাধনে ব্রতী হয়, শুধু তারাই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রদত্ত বিধি-নিষেধ মেনে চলে, নিজেদের পরিণাম সম্পর্কে তারা চিন্তা করে এবং ভবিষ্যত জীবনকে উজ্জ্বল ও সাফল্যমণ্ডিত করার বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যারা বাস্তববাদী, পরিণামদর্শী, তারা কল্যাণের পথ গ্রহণে বিলম্ব করেনা। আলোচ্য আয়াতে তাই মোমেনদের প্রতি আল্লাহ পাকের এহসানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এরশাদ হয়েছে যে নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট সমুজ্জল আয়াত সমূহ নাজিল করেছি যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং অতীতে যারা এ পৃথিবীতে ছিল তাদের দৃষ্টান্তও তুলে ধরা হয়েছে এবং মুত্তাকী পরহেজগারদের জন্যে রয়েছে এতে বিশেষ নসিহত। আলোচ্য আয়াতে তিনটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(এক) পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহ সুস্পষ্ট, তাতে কোন আড়ষ্টতা নেই, পবিত্র কোরআনে বর্ণিত বিধি-নিষেধ পালনে কোন অসুবিধা নেই, বিষপানে যদি নীলকণ্ঠ হতে হয় তবে পবিত্র কোরআনের বিধি-নিষেধ অমান্য করেও অবশেষে ধ্বংস হতে হয়।

(দুই) আল্লাহ পাকের বিধান অমান্য করে ইতিপুর্বে যে সব জাতি কোপগ্রস্ত হয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ্ পাক পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন, তাদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে সতর্ক করা হয়েছে।

(তিন) যারা এ সমস্ত ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণে ইচ্ছুক হয়, তারা যেন উপদেশ গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনের বৈশিষ্ট্য

এজন্যে হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, পবিত্র কোরআনে রয়েছে সে সব বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা যে সব বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ কর। এমনিভাবে, পবিত্র কোরআনে রয়েছে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থার বিবরণ যা দেখে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার। আর ভবিষ্যতে যা কিছু ঘটবে তারও ইঙ্গিত রয়েছে পবিত্র কোরআনে। যে পবিত্র কোরআন সম্পর্কে অবহেলা করে, আল্লাহ পাক তাকে ধ্বংস করে দেবেন। আর যে পবিত্র কোরআন বর্তমান থাকা সত্ত্বেও অন্য কোন গ্রন্থে তার জীবন চলার পথ-নির্দেশনার সন্ধান করবে সে পথভ্রষ্ট হবে।১

وَّمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ

অর্থাৎ যারা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীতে ছিল তাদের ঘটনা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। যেমন হযরত ইউসুফ (আঃ) এবং হযরত মরিয়ম (আঃ)-এর বিস্ময়কর ঘটনা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে যে আল্লাহ পাকের বিধান অমান্য করলে যে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় তা নূতন কিছু নয়; রবং অতীত উম্মত সমূহের মধ্যেও এমন ঘটনা ঘটেছে এবং তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ উম্মতে মোমেন-জননী হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি যেভাবে অপবাদ আরোপ করা হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাতা হযরত মরিয়ম (আঃ)-এর প্রতিও দূরাত্মা লোকেরা অপবাদ আরোপ করেছিল। যেভাবে তাদের শাস্তি হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে মোমেন-জননী হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি যারা অপবাদ আরোপ করেছে তাদের শাস্তি হয়েছে, তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে। এর পাশাপাশি হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নিঃস্কলংকতা যেভাবে প্রমাণিত হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিঃস্কলংকতাও প্রমাণিত হয়েছে এবং পবিত্র কোরআনে তাঁর চরিত্র মহিমার কথা ঘোষিত হবার কারণে সর্বকালের মানুষ সে সম্পর্কে যেন অবগত হয় তার বাস্তব ব্যবস্থা করা হয়েছে।

وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ

অর্থাৎ এতে রয়েছে মোত্তাকীদের জন্যে উপদেশ। যারা আল্লাহকে ভয় করে,

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৮, পৃষ্ঠা-৬৩

পরহেজগারী অবলম্বন করে, আত্ম সংশোধনের ব্রতী হয় তারাই পাপাচার থেকে আত্মরক্ষা করতে সফল হয়। আর এ সফলতা আসে তাদের আত্ম সংযমের ফলশ্রুতি স্বরূপ। আর আত্ম সংযমের সুযোগ লাভ তাদের হয় যারা আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের ايت শব্দটির দ্বারা সমগ্র কোরআনে করীমকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে কেননা এ আয়াতে যে তিনটি বৈশিষ্ট্যর বিবরণ রয়েছে তা শুধু আলোচ্য সূরার নয়; বরং সমগ্র কোরআনে করীমের।১

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

"আল্লাহ পাক আসমান জমিনের নূর"।

এ সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন বিধি-নিষেধ, হেকমত পূর্ণ কথাবার্তা এবং বিশেষ উপদেশ স্থান পেয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ আমি সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ নাজিল করেছি যেন মানুষ গোমরাহীর অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোর দিকে আসে। এরপর হেদায়েত প্রাপ্ত লোকদের শুভ পরিণতি ও পথভ্রষ্ট লোকদের ভয়াবহ পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। এরপর অন্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের নূর। এরশাদ হয়েছেঃ

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا

"অতএব, তোমরা ঈমান আন আল্লাহ পাকের প্রতি এবং সেই নূরের প্রতি যা আমি নাজিল করেছি"।

আর আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে এ নূরের উৎস কোথায়। মূলতঃ এ নূরের উৎস হলেন স্বয়ং আল্লাহ পাক, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

"আল্লাহ পাকই আসমান জমিনের নূর"।

অর্থাৎ আসমান জমিনের সকল নূরের উৎসই হলেন স্বয়ং আল্লাহ পাক। আল্লাহ পাকের মহান দরবার থেকেই সমগ্র বিশ্ব জগৎ তার অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং নূর পেয়েছে। পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ পাকের দান। যদি তিনি কোন কিছু সৃষ্টি না করতেন তবে কোন কিছুই অস্তিত্ব লাভ করতো না।

মূলতঃ কয়েকটি বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে আছেঃ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -৩৬০

একঃ আসমান এবং জমিনে, দ্যুলোকে-ভূলোকে যা কিছু সৌন্দর্য্য বা নূর রয়েছে তা একমাত্র মহান আল্লাহ পাকেরই দান।

দুইঃ চন্দ্র-সূর্য, নক্ষত্র পুঞ্জের নূর বিশ্বব্যাপী, আর এসবই আল্লাহ পাকের দান ব্যতীত আর কিছু নয়।

তিনঃ মানুষের চোখের জ্যোতি যার দ্বারা মানুষ দেখতে পায় তা-ও আল্লাহ পাকেরই দান।

চারঃ চর্ম-চক্ষুর ন্যায় অন্তর দৃষ্টি যার আলোকে মানুষ ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে তা-ও আল্লাহ পাকের অপূর্ব সৃষ্টি, আল্লাহ পাকেরই দান। আল্লাহ পাকের নূর অনন্ত অসীম, আর আসমান জমিনের সমস্ত নূর সীমিত। আল্লাহ পাকের নূর চিরস্থায়ী। আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের হেদায়েতের জন্যে যে দলীল প্রমাণ বা নিদর্শন নাজিল করেছেন তা হল গায়েবী বা বাতেনী নূর। যার ফলে হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ পায় যা চন্দ্র সূর্যের আলো থেকেও অধিকতর আলোকময়। যেভাবে সূর্যের জ্যোতি থেকে বুদ্ধির দীপ্তি বা জ্যোতি অধিকতর, ঠিক তেমনিভাবে বুদ্ধির আলো থেকে ওহীর নূর অধিকতর শক্তিশালী। বুদ্ধির দৌড় যেখানে শেষ, সেখান থেকে ওহীর নূরের যাত্রা হয় শুরু। সূর্যের জ্যোতি দ্বারা তাই দেখা যায় যা প্রকাশ্য। আর বুদ্ধির নূর দ্বারা এমন কিছু দেখা যায় যা অপ্রকাশ্য। আর ওহীর নূর দ্বারা সে সব বিষয় প্রকাশ পায় যা মানব বুদ্ধির উর্দ্ধে। চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র পুঞ্জের আলো অথবা ফেরেশতা ও আউলিয়ায়ে কেরামের নিকট যে আলো বা জ্যোতি রয়েছে এ সবই আল্লাহ পাকের নূরেরই ঝলক মাত্র। আর এ অর্থেই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

আর আল্লাহ পাক আসমান জমিনের নূর। এবনে এসহাক লিখেছেন, তায়েফবাসী দূর্বত্তরা যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে চরম কষ্ট দেয়, তখন তিনি

اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

"হে আল্লাহ! তুমি আসমান জমিনের নুর" বলে আল্লাহ পাকের নিকট ফরিয়াদ করেছিলেন। আর এ আরজীও পেশ করেছিলেন,

وَاجْعَلْ لِّيْ نُوْرًا وَّاَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْنِيْ نُوْرًا

হে আল্লাহ! আমাকে নুর দাও, আমার নূরকে বড় করে দাও এবং আমার

আপাদমস্তককে নুর করে দাও। একখানি হাদীসে এরশাদ হয়েছেঃ

ان الله خلق خلقه فى ظلمة ثم القى عليهم من نوره فمن اصابه من نوره يومئذ اهدى و من اخطاه ضل

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক অন্ধকারেই তাঁর সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তিনি তাদের উপর তাঁর নূরের জ্যোতি উদ্ভাসিত করেছেন। যে ব্যক্তি সে আলো পেয়েছে সে-ই হেদায়েত লাভ করেছে। আর যে ঐ নূর থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

কোরআনে করীমে আল্লাহ্ পাক কথাটিকে এভাবে এরশাদ করেছেন।১

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ

যার অন্তরের কপাটকে আল্লাহ্ পাক ইসলামকে বুঝবার জন্যে খুলে দিয়েছেন সে তার প্রতিপালকের নূরের মধ্যে আছে। ইমাম গাজ্জালী (রঃ) লিখেছেন, নুরের তাৎপর্য হল যা নিজে পকাশ্য এবং অন্যকেও প্রকাশ করে।

নূরের তাৎপর্য

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, নুর সেই বস্তুর নাম যাকে মানব চক্ষু দেখতে পায় এবং এরপর ঐ নূরের মাধ্যমে অন্য বস্তু সমূহ দেখা যায়। যেমন চন্দ্র সুর্য তা এমন আলোকময় যে প্রথমে চন্দ্র সুর্য আলোকিত হয়, এরপর অন্য বস্তু সমূহ চন্দ্র সূর্যের আলো দ্বারা প্রকাশ পায়। এদিক থেকে বিচার করলে নূর শব্দটি আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহুর ব্যাপারে ব্যবহার করা সম্ভব হয়না। কেননা, এ নূর বা আলো জাগতিক। তাই এর ব্যাখ্যা দরকার। "আল্লাহ্ পাক আসমান জমিনের নূর" একথাটির অর্থ হল, আসমান জমিনকে নূর দানকারী হলেন আল্লাহ্ পাক। অথবা এর অর্থ হল আল্লাহ পাক জমিন আসমানকে, নক্ষত্র পুঞ্জকে আলোকিত করেন। এ মত পোষণ করেন তফসীরকার জাহ্যাক (রাঃ)। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, "আল্লাহ্ পাক নূর" একথার তাৎপর্য হল, সমস্ত নূর আল্লাহ্ পাকেরই তরফ থেকে।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, নূর অর্থ এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকই সমগ্র বিশ্ব জগতের মহা ব্যবস্থাপক। আল্লাহর ফেরেশতাগণও নূর, আম্বিয়ায়ে কেরামও নূর এবং সবার উপরে আল্লাহ পাকই নূর। একথার সমর্থনে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মন্তব্যের দৃষ্টান্ত দেয়া হয় যা আল্লামা বগভী (রঃ) উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১২৭-২৮

বাক্যটির অর্থ হল আল্লাহ পাক আসমান জমিনের পথ প্রদর্শক। আল্লাহ পাকের হেদায়েতের কারণেই মানুষ সত্যের পথে চলে এবং গোমরাহীর অন্ধকার থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।১

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অনুরূপভাবে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের এ বাক্যটির অর্থ হল, আসমান জমীনের অধিবাসীদের পথ প্রদর্শক হলেন আল্লাহ পাক। হযরত আনাস এবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাকের নূরই হল হেদায়েত। এবনে জরীর এ মতই পোষণ করেছেন।

কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাও করেছেন, যেহেতু আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্ত্বা সব কিছু থেকে সুস্পষ্ট, প্রকাশ্য, সমুজ্জ্বল, সুপ্রমাণিত এবং জ্যোতির্ময়, আর নিখিল বিশ্বের যেখানেই আলো বা জ্যোতি অথবা শোভা-সৌন্দর্য্য রয়েছে, সবই এক আল্লাহ পাকের নূরের প্রতিবিম্ব ব্যতীত আর কিছুই নয়। তিনি যাকে আলো দান করেছেন, সে-ই আলো পেয়েছে, তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ আল্লাহ পাকই আসমান জমীনের নূর। নিখিল বিশ্বের সব কিছু তাঁর দানে ধন্য হয়েই অস্তিত্ব লাভ করেছে। আল্লাহ পাকের নূর থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি, বিকাশ এবং উন্মেষ ঘটেছে। আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম তাঁর নিজের নূরের কথা ঘোষণা করেছেন, এরপর যে সব মোমেন বান্দাগণ তাঁর নূরের আলোকে আলোকিত হয়ে হেদায়েত লাভ করেছে, তাদের নূরের অবস্থা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণনা করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ

তাঁর আলোর দৃষ্টান্ত হল সেই তাকের ন্যায় যে তাকের উপর রয়েছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি রয়েছে কাঁচের ভেতরে এবং ঐ কাঁচটি যেন একটি উজ্জ্বল তারকা যার উপরে শুধু পূর্বের আলো অথবা শুধু পশ্চিমের রোদ্রই পড়েনা, জয়তুন নামক একটি মহান বৃক্ষের তৈল ঐ প্রদীপে জ্বলে, অগ্নি স্পর্শ ব্যতীতই জ্বলে উঠবে বলে মনে হয় এমন পরিচ্ছন্ন সেই তেল। বস্তুতঃ আলোর উপরে আলো, আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে তাঁর আলো দেখিয়ে থাকেন, আর মানুষের জন্যে আল্লাহ পাক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে থাকেন।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -৩৬১-৬২

হযরত উবাই এবনে কাব (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে مثل نوره (তাঁর নূরের দৃষ্টান্ত) বাক্যটির তাৎপর্য হলো সেই মোমেনের দৃষ্টান্ত যে আল্লাহ পাকের নূরের ধারক অর্থাৎ যার অন্তরে ঈমান ও কোরআন রয়েছে, তার অন্তরের দৃষ্টান্ত একটি তাকের ন্যায় যার মধ্যে তারকার ন্যায় উজ্জ্বল একটি কাঁচ বা বাল্ব রয়েছে, উর্ধ্ব জগতের সংগে ঐ বাল্বের নিগুঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে, আর ঐ কাঁচের ভেতর প্রজ্বলিত রয়েছে হেদায়েতের প্রদীপ, আর ঐ প্রদীপের তেল এত পরিস্কার যে অগ্নি স্পর্শ না করতেই তা জ্বলে উঠবে, শুধু পূর্ব বা পশ্চিমের আলোই তাতে পড়েনা; বরং সর্বক্ষণ তার উপর সূর্যের আলো পড়তে থাকে, এমন মহা গুণান্বিত জয়তুন বৃক্ষের তেল দ্বারাই ঐ প্রদীপটি আলোকময় হয়।

তফসীরকারগণ বলেছেন, সৃষ্টির প্রথম দিন মানুষের অন্তরে আল্লাহ পাক সত্যকে গ্রহণের এবং নেক আমল করার যে যোগ্যতা প্রদান করেছেন, এই তেল দ্বারা তাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আয়াতের মর্মকথা

মোমেন মাত্রেরই হৃদয় হলো যেন কাঁচ বা একটি বাল্ব। হৃদয়ের এই বাল্ব অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, আল্লাহ পাকের প্রদত্ত তৌফিকের কারণে ঐ অন্তরে সত্য গ্রহণের যোগ্যতা অত্যন্ত প্রবল। ম্যাচের কাঠি দেখা মাত্রই যেন তা জ্বলে উঠতে চায় অর্থাৎ পবিত্র কোরআন বা ওহীর আলো স্পর্শ করা মাত্রই অন্তর্নিহিত আলোও প্রজ্বলিত হয় এবং সেই আলো হল হেদায়েত, ঈমান বা বিশ্বাস বিশ্বস্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের প্রতি, তাঁর প্রেরিত নবী রসূলগণের প্রতি এবং তাঁর অবতীর্ণ মহান কালামের প্রতি। একদিকে মোমেনের অন্তর্নিহিত আলো, অন্যদিকে আল্লাহ পকের তরফ থেকে অবতীর্ণ ওহীর আলো, উভয় আলোর যখন বিপুল সমাবেশ ঘটে, তখনকার অবস্থাকেই কোরআন বর্ণনা করেছে

نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ

অর্থাৎ নূরের উপর নূর তথা আলোর উপরে আলো। তবে এই নূর বা জ্যোতির বিকীরণ ও দান সম্পূর্ণভাবে এক আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করে থাকেন, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ

আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে ঐ নূর দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা তাকে বঞ্চিত করেন, এ সব কিছু সম্পূর্ণ তাঁর ইচ্ছাধীন। পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক বিষয়টিকে এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ

যার সম্পর্কে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হয় যে তাকে হেদায়েত করবেন, তার মনের কপাট খুলে দেন, তার অন্তরকে তাঁর নিজের নূর দ্বারা আলোকিত করেন, সে তখন সত্য অসত্যের মধ্যেকার পার্থক্য যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং গোমরাহীর অন্ধকার সংগে সংগে দূরীভূত হয়। হেদায়েত লাভে তার আর কোন বাধা থাকেনা, সে হয় সত্য-সাধক এবং সত্য-সৈনিক, সত্য-প্রচারক এবং সত্য-প্রতিষ্ঠাতা। পক্ষান্তরে, যাকে হেদায়েত করা আল্লাহ পাকের মর্জি না হয়, তথা যার মধ্যে সৃষ্টির আদি থেকেই হেদায়েত লাভের যোগ্যতা না থাকে, তথা যার অন্তরে আল্লাহ পাকের নূর গ্রহণের পরিবেশ না থাকে, তার সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا
حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ

আর যার পথভ্রষ্ট হওয়া আল্লাহ পাক ইচ্ছা করেন, তার অন্তরকে সংকীর্ণ করে দেন, পরিণামে হেদায়েত লাভ করা তার পক্ষে এমন কঠিন হয়ে যায় যেমন তার আকাশে চড়া কঠিন হয়।

পবিত্র কোরআনের এ ঘোষণার বাস্তব রূপ দেখতে পাই আমরা ইসলামের প্রথম যুগে, হেরা গুহায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ধ্যান মগ্ন, তিনি সত্য-সাধনায় রত, লাইলাতুল কদরের পবিত্র ও মোবারক রাতে মহান আল্লাহ পাকের দরবার থেকে প্রেরিত হলেন জীব্রাঈল (আঃ), নাজিল হল পবিত্র কোরআন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানালেন, ঐ আহবানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিলেন হযরত খাদীজাতুল কোবরা (রাঃ), হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ), কিন্তু এ আহবানের বিরোধিতা করল আবু জেহেল, আবু লাহাব সহ আরো অনেক দূরাত্মা। এখানেই নূরানী অন্তর এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক তাই এরশাদ করেছেনঃ

وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ

আর আল্লাহ পাক মানুষের জন্যে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে থাকেন, যেমন হেদায়েত এবং গোমরাহীর তথা আলো এবং আঁধারের দৃষ্টান্ত আলোচ্য আয়াতে বর্ণনা করেছেন।

এ কারণে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, مَثَلُ نُوْرِهٖ এর অর্থ হ'ল সেই নূরের অবস্থা এবং বৈশিষ্ট্য যা আল্লাহ পাক মোমেন বান্দাকে দান করেছেন।

আর হযরত উবাই এবনে কাব (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল মোমেনের অন্তরের নূরের বৈশিষ্ট্য এই যে মোমেন সে ব্যক্তি যার অন্তরে আল্লাহ্ পাক ঈমান এবং পবিত্র কোরআন দান করেছেন। হাসান বসরী (রঃ) এবং জায়েদ এবনে আসলাম (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে نور শব্দ দ্বারা পবিত্র কোরআনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর সায়ীদ এবনে জুবায়ের (রঃ) এবং জাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের نور শব্দ দ্বারা স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর কোন কোন তফসীরকারের মতে, আলোচ্য আয়াতের نور শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

نُورٌ عَلٰى نُورٍ

(আলোর উপর আলো) অর্থাৎ এখানে দু'টি আলো একত্রিত হয়েছে, একটি জয়তুনের আলো, আরেকটি অগ্নির, দু'টি একত্রিত হলে আলোর উপর আলো হয়। ঠিক এমনিভাবে পবিত্র কোরআনের আলো এবং ঈমানের আলো যখন একত্রিত হয়, তখন মোমেনের অন্তর আলোকময় হয়।

يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ

হেদায়েত আল্লাহ্ পাকের দান

আল্লাহ্ পাক তাঁর বন্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েতের এ নূর দান করে থাকেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে কাফেররা আল্লাহ্ পাকের মর্জি হয়না বলে হেদায়েত পায়না; বরং এ বাক্যটির তাৎপর্য হচ্ছে, তাদের কর্তব্য হল হেদায়েত লাভের জন্যে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞ থাকা, আর সর্বদা এ সত্য উপলব্ধি করা যে আল্লাহ্ পাক তওফিক দিয়েছেন বলেই হেদায়েত লাভ হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ এ বাক্যটিতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রত্যেকেরই আল্লাহ্ পাকের দরবার থেকে হেদাযেত লাভের আশা করা উচিত। যেমন, সুরায়ে ফাতেহায় হেদায়েত লাভের জন্যে দোয়া করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

হে আল্লাহ্! আমাদের সরল-সঠিক পথ দেখাও।

এর পাশাপাশি একথাও স্মরণযোগ্য যে, হেদায়েতকে কখনো নিজের চেষ্টা ও সাধনার ফলশ্রুতি মনে করা উচিত নয়; বরং সর্বদা এ বিশ্বাস বদ্ধমূল থাকা উচিত যে এটি একমাত্র আল্লাহ্ পাকের দান ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লামের হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক বিশ্ব জগৎকে অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তার মধ্যে স্বীয় নূর রেখে দিয়েছেন। যার নিকট সেই নূর পৌঁছেছে, সে হেদায়েত পেয়েছে। আর যে ঐ নূর থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। এ হাদীসের তাৎপর্য্য হলো এই যে, আল্লাহ পাক মানুষকে মুর্খতার অন্ধকারে সৃষ্টি করেছেন, জন্মলগ্নে সে কিছুই জানতনা, এরপর আল্লাহ পাকই তাকে সত্য-অসত্যের পার্থক্য উপলব্ধি করার তওফিক দিয়েছেন, তিনি তার প্রতি স্বীয় নূর রেখে দিয়েছেন, তাকে হেদাযেত লাভের সুযোগ দিয়েছেন। وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক মানুষকে বুঝাবার জন্যে এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, যাতে করে মানুষ সত্য অসত্য, আলো এবং আঁধারের সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং সত্যকে গ্রহণ ও অসত্যকে বর্জন করতে পারে। وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"আর আল্লাহ পাক সকল বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত", অর্থাৎ কে হেদায়েত লাভের যোগ্য আর কে অযোগ্য, সে সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত। কে হেদায়েত লাভে ধন্য হবে আর কে গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকবে আল্লাহ পাক তা ভালভাবেই জানেন। কোন্ অন্তর হেদায়েতের উপযুক্ত, আর কোন্ অন্তর হেদায়েত লাভের অনুপযুক্ত তা আল্লাহ পাকের নিকট সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট।

মসনদে আহমদে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছে, মানব অন্তর চার প্রকার।

(এক) অত্যন্ত স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন আলোকিত

(দুই) গিলাফে ঢাকা (সত্য প্রকাশের পথ রুদ্ধ)

(তিন) মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা

(চার) উল্টো দিকে ফিরে থাকা।

প্রথম প্রকার হল মোমেনের অন্তর যা নূরানী থাকে। নিজেই আলোকিত থাকে এবং আলো গ্রহণের জন্যে ব্যাকুল থাকে।

দ্বিতীয় প্রকার কাফেরের অন্তর। তৃতীয় প্রকার মোনাফেকের অন্তর। সে একবার সত্যকে মানে, এরপর তা অস্বীকার করে। এরপর আবার সে সত্যকে গ্রহণ করে কিন্তু পরে পুনরায় অস্বীকার করে। আর চতুর্থ প্রকার হল সেই অন্তর যাতে ঈমানও থাকে এবং মোনাফেকীও থাকে।১

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৮, পৃষ্ঠা-৬৫

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে আরো কিছু কথা

আলোচ্য আয়াতখানি পবিত্র কোরআনের কঠিনতর আয়াত সমূহের অন্যতম। তফসীরকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কঠোর পরিশ্রম করেছেন। ঈমাম গাজ্জালী (রঃ) শুধু এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার নামকরণ করেছেন মেশকাতুল আনোয়ার।

ঈমাম রাজী (রঃ) সহ সকল যুগের অন্যান্য তফসীরকারগণ এ আয়াতের বিস্তারিত তফসীর করেছেন। এ পর্যায়ে তাঁরা একাধিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

(এক) ঈমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

'নূর' শব্দটি হেদায়েত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

অতএব, আয়াতের অর্থ হবে আল্লাহ পাক আসমানবাসী ও জমীনবাসী সকলের হেদায়েত দানকারী। আর এ মত পোষণ করেছেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্য অনেক তফসীরকার।

(দুই) এ আয়াতের অর্থ হল, আল্লাহ পাকই আসমান জমীনের মহা ব্যবস্থাপক। তিনি সমগ্র বিশ্ব-সৃষ্টির যাবতীয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে থাকেন।

(তিন) এ আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ পাকই আসমান জমীনকে আলোকিত করেন। একথাটিরও একাধিক ব্যাখ্যা রয়েছে।

(ক) অর্থাৎ আল্লাহ পাক ফেরেস্তাদের দ্বারা আসমানবাসীকে এবং নবী রসূলগণের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর অন্তরকে আলোকিত করেন।

(খ) চন্দ্র সুর্য, নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা আল্লাহ পাক আসমান জমীনকে আলোকিত করে রাখেন।

(গ) আলোচ্য আয়াতের অর্থ হল আল্লাহ পাক আসমানকে চন্দ্র সুর্য ও তারকারাজি দ্বারা আলোকিত করেন। আর আম্বিয়ায়ে কেরাম ও তাঁদের উত্তরাধিকারী আলেমদের দ্বারা পৃথিবীকে আলোকিত করেন। এ মত পোষণ করেছেন হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) এবং হাসান বসরী ও আবুল আলিয়া (রঃ)।

নূরে মোহাম্মদীর একটি দৃষ্টান্ত

نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ

(আলোর উপর আলো)

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় তত্ত্বজ্ঞানীগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এটি হলো মূলতঃ নূরে মোহাম্মদীর একটি দৃষ্টান্ত। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) কাবে আহবার (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,

مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ

আয়াতাংশের ব্যাখ্যা করুন, কাবে আহবার (রাঃ) বললেন, আল্লাহ পাক এ আয়াতে তাঁর নবীর অবস্থা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণনা করেছেন।

'মেশকাত' শব্দটি দ্বারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বক্ষ মোবারককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর কাঁচ দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্তরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর مصباح শব্দ দ্বারা নবুওয়ত উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ

এর অর্থ হল যদি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নবুওয়তের দাবী না-ও করতেন, তবুও অবস্থা এমন ছিল যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নূর আপনা আপনিই বিচ্ছুরিত হত এবং বিশ্ববাসীর সম্মুখে তাঁর নবী হওয়ার কথা প্রকাশিত হতো।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) কাবে আহবার (রাঃ)-এর এ ব্যাখ্যা সম্পর্কে লিখেছেন যে এটি অত্যন্ত চমৎকার ব্যাখ্যা। প্রকৃতপক্ষে নূরে মোহাম্মদীর এ অবস্থাই ছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বের কিছু অবস্থা এ ব্যাখ্যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ যা এখানে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা।

বিভিন্ন প্রামাণ্য সীরাত গ্রন্থে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বাবস্থা এবং তাঁর মোজেযা সমূহের উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাননীয়া মাতা বর্ণনা করেন, গর্ভাবস্থায় আমি স্বপ্নে দেখি যে আমার ভেতর থেকে একটি নূর বিচ্ছুরিত হল যার কারণে আমি বসরা শহর (ইরাকে অবস্থিত) এবং সিরিয়ার উচ্চ মহলগুলো দেখতে পাই। এরপর যখন তিনি ভূমিষ্ট হলেন, তখন মাথা মোবারক আসমানের দিকে উত্তোলন করেছিলেন।

হাফেজ এবনে হাজর (রঃ) লিখেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাতা একটি নূর অবলোকন করলেন, যাঁর কারণে সিরিয়ার মহল সমূহ তাঁর চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এবনে হাব্বান এবং হাকেম এ ঘটনার সত্যতা বর্ণনা করেছেন।

আবু নাঈম দালায়েলে লিখেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাননীয়া মাতা বর্ণনা করেন, যখন তিনি জন্মগ্রহণ করলেন, তখন একজন ফেরেস্তা তাঁকে পানিতে তিনবার ডুবিয়ে তুললেন, এরপর রেশমী কাপড়ে আবৃত একটি পাত্র থেকে সীলমোহর বের করলেন যা তাঁর পৃষ্ঠদেশের উপরিভাগে ব্যবহার করলেন। ফলে সাদা ধবধবে ডিমের ন্যায় একটি আকৃতি সৃষ্টি হল যা জোহরা নক্ষত্রের ন্যায় চমকাতে লাগল।

বায়হাকী এবনে আবিদ দুনিয়া বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্মের রাতে পারস্য রাজা কেসরার মহলে কম্পন সৃষ্টি হয়। আর তার চোদ্দটি ইট ভেঙ্গে পড়ে যায়। এজন্যে পারস্য রাজা ভীত সন্ত্রস্ত হযে পড়ে। আর পারস্যে হাজার বছর ধরে যে অগ্নি প্রজ্বলিত ছিল তা নিভে যায়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, একজন ইহুদী ব্যবসায়ী মক্কায় অবস্থান করত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্মের রাতে ঐ ইহুদী কোরায়েশকে বলেছিল, হে কোরায়েশ গোত্র! আজ রাতে এ উম্মতের নবী জন্মগ্রহণ করেছেন যাঁর পৃষ্ঠদেশে একটি চিহ্ন রয়েছে। লোকেরা ঐ ইহুদীকে নিয়ে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাতার নিকট গমন করলো এবং নবজাতক শিশুর পৃষ্ঠ মোবারক খুলে দেখলো। মোহরে নবুওয়ত দেখা মাত্র ইহুদী বেহুশ হয়ে পড়ে গেল। (জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর) লোকেরা যখন তাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার কি হয়েছিল? তখন ইহুদী বলল, আল্লাহর শপথ! বণী ইসরাঈল থেকে নবুওয়ত চলে গেল।

'মাওয়াহেবে লুদনিয়া' গ্রন্থে উমাসা নামক পাদ্রীর ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। সে মক্কাবাসীকে বলত, হে মক্কাবাসী! অচিরেই তোমাদের মধ্যে একজন পয়গম্বর জন্মগ্রহণ করবেন, সমগ্র আরববাসী তার অনুগত হবে, আর পৃথিবীর অনারব এলাকায়ও তাঁর নিয়ন্ত্রণ থাকবে। তার জন্মগ্রহণের এটিই সময়। হযরত আব্বাস এবনে আবদুল মোত্তালিব বর্ণনা করেনঃ আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি যে আপনার দ্বীন গ্রহণ করেছি, এর একটি বিশেষ কারণ রয়েছে, আপনার নবী হওয়ার প্রমাণ আমি তখন দেখতে পেয়েছি, যখন আপনি দোলনায় শায়িত অবস্থায় চাঁদের সাথে কথা বলেছিলেন এবং অংগুলি দ্বারা চাঁদের দিকে ইংগিত করেছিলেন, যখন আপনি চাঁদের দিকে ইশারা করতেন তখন চাঁদের এক পার্শ্ব ঝুঁকে যেত।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করছেন, আমি তখন চাঁদের সাথে কথা বলেছি, আর সেও আমার সাথে কথা বলেছিল এবং আমাকে ক্রন্দণ থেকে বিরত থাকার জন্যে সে সান্ত্বনা দিয়েছিল। চাঁদ যখন আল্লাহ পাকের আরশের নিম্নদেশে সেজদারত হতো, তখন আমি তার আওয়াজ শ্রবণ করতাম।

প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, ফেরেশতাগণ তাঁর দোলনাকে দোলা দিত। আর তিনি জন্মলাভ করেই কথা বলেছিলেন।

আবু ইয়ালা এবং এবনে হাব্বান হযরত আবদুল্লাহ এবনে জাফর (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দুগ্ধমাতা হালিমা সাদিয়া বলেছেন, আমি যখন তাঁকে কোলে নিলাম, তখন সংগে সংগে আমার বক্ষ প্রয়োজনীয় দুগ্ধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো, অথচ আমার কোলের শিশু জামরাহ জঠর জ্বালায় ঘুমাতোনা। তখন উভয় শিশু উদর পূর্ণ করে দুধ পান করলো, উভয়েই নিদ্রিত হলো, ইতিপূর্বে যেমন আমার দুধ ছিলনা তেমনি আমার উষ্ট্রীরও দুধ ছিলনা, কিন্তু আমার স্বামী উষ্ট্রীর নিকট গিয়ে দেখেন সেও দুধে পরিপূর্ণ হয়ে আছে, তাই তিনি প্রচুর দুধ দোহন করে নিয়ে আসলেন, তখন তিনি এবং আমি দুধ পান করে তৃপ্তি লাভ করলাম, আর সেই রাত অত্যন্ত আরামে অতিবাহিত হলো।

প্রত্যাবর্তন কালে শিশু মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নিয়ে যখন আমি উষ্ট্রীর উপর আরোহন করলাম, তখন আল্লাহ তাআলার শপথ! উষ্ট্রী এত দ্রুতবেগে চলতে লাগলো যে সাথীদের কোন সওয়ারী তার মোকাবেলা করতে পারলোনা। তারা আমাকে বলতো লাগলো যে এটি কি পূর্বের সেই জন্তুটি নয়? আসবার সময় দুর্বলতার কারণে চলতে পারতোনা, বার বার তার জন্য সকলকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ হযরত হালিমা বলেছেন, আমি যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দুধ বন্ধ করে দিয়েছিলাম তখন তিনি বলেছিলেনঃ

الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا

এটি তাঁর প্রথম কথা ছিল। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, তাঁর দুগ্ধমাতা হালিমা কখনো তাঁকে বাইরে দূরে যেতে দিতেন না। একদিনের ঘটনা। তিনি তাঁর দুগ্ধ ভগ্নি সীমার সংগে বাইরে চলে গেছেন জঙ্গলে, যেখানে তাদের উষ্ট্রী বিচরণ করত, সেখানে চলে গেছেন। হালিমা অস্থির হয়ে তাঁর সন্ধানে বের হলেন এবং জঙ্গলে গিয়ে তাঁকে দুগ্ধভগ্নী সীমার সংগে পান এবং সীমাকে সম্বোধন করে বলেন, এই গরমের মধ্যে কেন এখানে ঘোরাফেরা করছ? সীমা

বলল, আমার ভাইয়ের সংগে গরম অনুভূত হয়না, কেননা সর্বক্ষণ তাঁর উপর মেঘমালা ছায়া ফেলে রাখে, যখন তিনি কোথাও দাঁড়ান, তখন ঐ মেঘমালাও তাঁর উপর স্থির থাকে, আর যখন তিনি চলমান অবস্থায় থাকেন, তখন ঐ মেঘমালাও চলতে থাকে।

'শামায়েলে মাজদীয়াতে' উল্লেখিত হয়েছে, হালীমা সাদিয়া বলেছেন, যখন থেকে আমি তাঁকে গ্রহণ করেছি, এরপর আর কখনও প্রদীপের প্রয়োজন হয়নি। তাঁর চেহারার আলো প্রদীপের চেয়ে অধিকতর জ্যোতির্ময়। যেখানে আমার প্রদীপের প্রয়োজন হ'ত, আমি সেখানে তাঁকে নিয়ে যেতাম। তাঁর বরকতে সমস্ত এলাকা আলোকিত হত। আর একথাও বর্ণিত আছে, হালিমা যখন তাঁকে নিয়ে কোন মূর্তির নিকট গমন করতেন, তখন হুবল সহ অন্যান্য মূর্তিগুলো তাঁর সম্মানার্থে মাথা নত করে ফেলত। এমনকি, তাঁকে নিয়ে হজরে আসওয়াদের নিকট গমন করেছেন, তখন হজরে আসওয়াদ স্বস্থান থেকে বের হয়ে তাঁর মুখকে স্পর্শ করেছে। আর একথাও বর্ণিত আছে, যখন হালিমা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দুধ পান করাতে শুরু করলেন, তখন তাঁর দুধ এত বেশী আসতে লাগল যেন দশটি শিশু এমনকি তার চেয়েও বেশীর জন্যে যথেষ্ট। যখন হালিমা তাঁকে নিয়ে কোন শুষ্ক মরুভূমি অতিক্রম করতেন, তখন সংগে সংগে ঐ এলাকাটি আপনা আপনি শষ্য-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ হয়ে যেত। হালিমা নিজে শ্রবণ করতেন এবং দেখতেন যে, তার কোলের শিশু মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পাথর এবং বৃক্ষ সালাম করত এবং বৃক্ষ শাখাগুলো তাঁর দিকে ঝুঁকে যেত। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (অতি শৈশব কালে) তাঁর দুগ্ধ ভ্রাতা সহ বকরী চরাতে যেতেন। দুগ্ধ ভ্রাতারই বর্ণনা হল এই, আমার ভাই যখন কোন মরুভূমিতে দাঁড়াতেন, তখন তা সবুজে পরিপূর্ণ হয়ে যেত। যখন তিনি বকরীকে পানি পান করাবার জন্যে কোন কূপের নিকট গমন করতেন, তখন কূপের পানি নীচ থেকে উপরে চলে আসত। আর যখন তিনি রোদ্রে দাঁড়াতেন, তখন একটি মেঘখন্ড এসে তাঁকে ছায়া দিত। আর জঙ্গলের জন্তুগুলো এসে তাঁকে চুম্বন করত।

"খোলাসাতুস সিয়ার" নামক গ্রন্থে রয়েছে যে তাঁর দুগ্ধ মাতা হালিমা বর্ণনা করেছেন, একবার (শিশু) মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের উষ্ট্রগুলোর বিচরণস্থলে ছিলেন। হঠাৎ তাঁর দুগ্ধ ভ্রাতা দৌড়ে বাড়ী আসল এবং বলল, যে দু'জন সাদা পোষাক পরিহিত ব্যক্তি আমার কোরায়েশী ভাইকে ধরে জমিনে ফেলে দিল এবং তাঁর পেট চিরে ফেলল। হযরত হালিমা বর্ণনা করেন যে আমি একথা শ্রবণ করে সংগে সংগে তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে দন্ডায়মান অবস্থায় পেলাম এবং তাঁকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছিল? তিনি বললেন, দু'জন সাদা পোষাক পরিহিত ব্যক্তি এসে আমাকে মাটিতে শুইয়ে দিল এবং আমার পেট চিরে কোন কিছুর অনুসন্ধান করল। আমি জানিনা তারা কি বস্তু

বের করে নিয়েছে। এ ঘটনাটির বিবরণ হযরত সাদ্দাদ এবনে আওস (রাঃ)–এর সূত্রে এভাবে এসেছে যা আবু ইয়ালা, আবু নাইম এবং এবনে আসাকের সংকলন করেছেন।

তিন ব্যক্তির একটি দল এসেছে, তাদের নিকট স্বর্ণের তশতরী ছিল যা বরফে পরিপূর্ণ ছিল। তাদের মধ্যে একজন আমাকে মাটিতে শুইয়ে দিল। এরপর আমার পেট চিরে কোন কিছু বের করল। এরপর ঐ জিনিষটিকে বরফ দিয়ে ধৌত করল এবং খুব ভাল করে ধৌত করল। এরপর ঐ জিনিষটিকে স্বস্থানে রেখে দিল। এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেল এবং আমার বক্ষ চিরে হৃৎপিন্ড বের করল এবং তা পরিস্কার করল, এসব আমি স্বচক্ষে দেখছিলাম, এরপর একটি কাল বস্তু ভেতর থেকে বের করে ফেলে দিল এবং ডানে বাঁয়ে হাত ঘুরিয়ে কোন কিছুর অনুসন্ধান করছিল। এরপর দেখলাম তার হাতে একটি আংটি রয়েছে যা ছিল একটি নুর। তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দৃষ্টি ফিরে আসে। ঐ আংটি দ্বারা সে আমার হৃদয়ে মোহর লাগিয়ে দিল। ফলে আমার অন্তর নূরে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। আর এটি ছিল নবুওয়ত এবং ধী শক্তির নুর। এরপর হৃৎপিন্ডকে স্বস্থানে রেখে দিল। আমি অনেক দিন পর্যন্ত আমার হৃদয়ে সেই মোহরের তাপ উপলব্ধি করেছি। এরপর তৃতীয় ব্যক্তি এসে তার সাথীকে বলল, তুমি সরে যাও। এরপর তৃতীয় ব্যক্তি আমার বক্ষের উপর থেকে নাভি পর্যন্ত হাত ফিরিয়ে দিল। ফলে চিরে যাওয়া বক্ষ আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বক্ষ মোবারকে সেলাইয়ের চিহ্ন দেখতাম।

এবনে আসাকেরের বর্ণনায় রয়েছে, একবার মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, আবু তালেব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নিয়ে বৃষ্টির জন্যে দোয়া করার উদ্দেশ্যে কা'বা শরীফ প্রাঙ্গণে হাজির হন। কাবা শরীফের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দন্ডায়মান হন আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আঙ্গুল মোবারক ধরে রাখেন, তখন আকাশে চতুর্দিক থেকে মেঘমালা একত্রিত হল এবং মুষলধারে এত বৃষ্টি হল যে চতুর্দিকে পানি প্রবাহিত হতে লাগল, এজন্যে পরবর্তীকালে এ ঘটনাকে স্মরণ করে আবু তালিব তার একটি কবিতায় বলেছিলেন, তিনি গৌরবর্ণ বিশিষ্ট, তাঁর উসিলায় বৃষ্টির জন্যে দোয়া করা হয় এবং তিনি এতীমদের আশ্রয় স্থল।

'খোলাসাতুস সিয়ার' গ্রন্থে আরো অনেক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। যেমন বার বছর বয়সে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পিতৃব্য আবু তালিবের সঙ্গে সিরিয়ার দিকে গমন করেন। বসরা নামক স্থানে পৌছানোর পর বহিরা নামের খৃষ্টান পাদ্রী তাঁকে দেখেই চিনে ফেলে এবং তাঁর দস্তে মোবারক স্পর্শ করে বলল, ইনি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের রসূল। আল্লাহ পাক তাঁকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে

রহমত রূপে প্রেরণ করবেন। বহিরাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তুমি একথা কি করে জানতে পারলে? বহিরা বলল, যখন তোমরা আসছিলে তখন আমি দেখলাম প্রত্যেকটি বৃক্ষ এবং পাথর তাঁর দিকে ঝুকে পড়ছিল, আর এ অবস্থা শুধু নবীর জন্যেই হয়। আমরা তাঁর অবস্থা আসমানী কিতাব সমূহে পাঠ করেছি। এরপর বহিরা পাদ্রী আবু তালেবকে বললেন, যদি আপনি তাঁকে সিরিয়া নিয়ে যান তবে ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করবে। তখন ঐ পাদ্রীর পরামর্শক্রমে আবু তালিব সেখান থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মক্কায় ফেরত পাঠান (অথবা তাঁকে নিয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন)।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বার ব্যবসার উদ্দেশ্যে হযরত খাদিজা (রাঃ)–এর গোলামকে সঙ্গে নিয়ে সিরিয়া সফর করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল পচিশ বছর। হযরত খাদীজা (রাঃ)–এর সঙ্গে তখনো বিয়ে হয়নি। সিরিয়া পৌছে তাঁরা এক পাদ্রীর গীর্জার নিকট অবরতণ করেন। পাদ্রী মাইসারা নামক ঐ গোলামকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার সঙ্গে ইনি কে? মাইসারা বলল, মক্কা শরীফের অধিবাসী একজন কোরায়েশ বংশীয় ব্যক্তি। পাদ্রী বলল, এ বৃক্ষের নিকট নবী ব্যতীত কখনো কেউ অবতরণ করেনি।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, পাদ্রী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আসে এবং বলে, আমি ঈমান এনেছি এবং আমি সাক্ষ্য দেই যে আপনিই সেই নবী যার কথা আল্লাহ পাক তওরাতে উল্লেখ করেছেন। এরপর সে মোহরে নবুওয়ত দেখে চুম্বন করে এবং বলে, আমি স্বাক্ষ্য দেই যে আপনিই আল্লাহ পাকের রসূল, উম্মি নবী, হাশেমী, আরবী, মক্কী। (কেয়ামতের দিন) হাউজে কাউসার থাকবে আপনারই নিয়ন্ত্রণে, আপনিই হবেন শাফাআতকারী, আর আপনার হাতেই থাকবে সেদিন আল্লাহ পাকের হামদের পতাকা।

বর্ণিত আছে যে হযরত খাদীজার (রাঃ) গোলাম মাইসারা (তাঁর নিকট) বর্ণনা করেন যে দ্বিপ্রহর কালে যখন গরম অত্যন্ত বেশী হল, তখন দু'জন ফেরেস্তা অবতরণ করলেন এবং তাঁর প্রতি ছায়া ফেলতে লাগলেন, যাতে করে সূর্যের তাপ এবং গরমের কারণে তাঁর কষ্ট না হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন উষ্ট্রের উপর আরাহণ করে ভ্রমণরত ছিলেন। হযরত খাদীজা (রাঃ) যখন মাইসারার এ বর্ণনা শ্রবণ করলেন, তখন তাঁর অন্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বিয়ের ইচ্ছা হল।

এ সমস্ত বর্ণনা দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নূরে নবুওয়তের একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন।

আয়াতের অন্য একটি ব্যাখ্যা

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, 'মেশকাত' শব্দ দ্বারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বক্ষ মোবারক উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর 'জুযাযা' শব্দ দ্বারা তাঁর অন্তরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এবং মেছবাহ হল সেই নুর যা তাঁর অন্তরে আলোকিত ছিল। আর আলোচ্য আয়াতের 'সাজারায়ে মোবারাকা' শব্দ দ্বারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে আর 'শারকি গারবি' অর্থাৎ পূর্ব পশ্চিম না হওয়ার অর্থ হল হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ইহুদীও ছিলেন না, খ্রীষ্টানও ছিলেন না, আর نُورٌ عَلٰى نُورٍ (আলোর উপর আলো।) কথাটির তাৎপর্য হল একটি নূর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অন্তরের, আর দ্বিতীয় নূরটি হল হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্তরের। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মোহাম্মদ এবনে কাব কারজী (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের 'মেশকাত' শব্দটি দ্বারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর জুযাযা হলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ) আর মেসবাহ হলেন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, আর আল্লাহ পাক তাঁকেই 'সিরাজাম মুনিরা' বা দীপ্তিময় সূর্য বলে আখ্যা দিয়েছেন। আর আলোচ্য আয়াতের যে প্রদীপের কথা বলা হয়েছে, যা এক অত্যন্ত বরকতময় বৃক্ষের তেল দ্বারা প্রজ্বলিত হয়েছে, এর অর্থ হলো হযরত ইব্রাহীম (আঃ)। কেননা, তিনি অত্যন্ত বরকতময় ব্যক্তি ছিলেন, অনেক নবী রসূলগণ তাঁর বংশধর ছিলেন। আর ঐ বৃক্ষটি শারকি গারবি নয় বলে যে কথা বলা হয়েছে, এর তাৎপর্য হল হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ইহুদীও ছিলেন না, খৃষ্টানও ছিলেন না। কেননা, ইহুদীরা পশ্চিম দিকে এবং খৃষ্টানরা পূর্ব দিকে ফিরে নামাজ আদায় করত।

يَكَادُ زَيْتُهَا

বাক্যটির তাৎপর্য হল এই যে, ওহী নাজিল হওয়ার পূর্বেই হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী প্রকাশত হয়েছিল, তিনি আল-আমীন রূপে, আমানতদার রূপে, দুঃস্থ, বিপদগ্রস্ত মানুষের সাহায্যকারী হিসেবে, এতীম মিসকীনদের আশ্রয়স্থল রূপে, শান্তি প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে, সুবিচারকারী হিসেবে, উদারতা ও মহানুভবতার প্রতীক হিসেবে নবুওয়ত লাভের পূর্বেই বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। অগ্নি স্পর্শ করা অর্থাৎ ওহী নাজিল হওয়ার পূর্বেই তিনি আত্মপ্রকাশের নিকটবর্তী হয়েছিলেন, আর نُورٌ عَلٰى نُورٍ বাক্যটির তাৎপর্য হল নূরে ইব্রাহীম এবং নূরে মোহাম্মদ তাঁর পবিত্র সত্তায় একত্রিত হল। তাই আলোর উপর আলো হলো।

এ আয়াতের আরও একটি ব্যাখ্যা

আবুল আলিয়া আলোচ্য আয়াতের আরও একটি ব্যাখ্যা করেছেন এবং বলেছেন, এ ব্যাখ্যা পেশ করেছেন হযরত উবাই এবনে কাব (রাঃ)। এ আয়াতে প্রকৃত মুমেনের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। مشكواة হলো মোমেনের সত্ত্বা, আর زجاجة হলো মোমেনের বক্ষ। مصباح হলো মোমেনের অন্তর, সে অন্তর ঈমান ও পবিত্র কোরআনের আলোকে আলোকিত।

যেভাবে বাগানে একটি বৃক্ষ থাকে, তার চারিপার্শ্বেও থাকে আরো অনেক বৃক্ষ। সূর্য উদয় ও অস্তকালে সূর্যের তাপ থেকে বৃক্ষটি সংরক্ষিত থাকে, ঠিক তেমনিভাবে মর্দে মোমেনও সকল ফেতনা থেকে সংরক্ষিত থাকে। তার চারটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যদি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সে কিছু লাভ করে, তবে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর যদি কিছু না পায় তবে সবর করে। যখন ফয়সালা করে, তখন সুবিচার করে, যখন কথা বলে, তখন সত্য কথা বলে। মোমেনের অন্তর এমনি একটি প্রদীপ যা অগ্নি স্পর্শ করার পূর্বে যেন আলোকিত হয়ে থাকে, অর্থাৎ সত্য প্রকাশিত হবার পূর্বেই সে সত্যের পরিচিতি লাভ করে কেননা, তার অন্তর স্বভাবগত ভাবেই সত্য-পন্থী। তাই সে আলোর উপর আলো হয়ে থাকে। মোমেনের কথা একটি নূর, তাঁর এলম একটি নূর, তার আসা একটি নূর, তার যাওয়া একটি নূর এবং কেয়ামতের দিন সে নূরের দিকেই যাবে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের আরো একটি ব্যাখ্যা করেছেন, তিনি বলেছেন, এটি হল মূলতঃ আল্লাহ পাকের সেই নূরের দৃষ্টান্ত যা মোমেনের অন্তরে থাকে। মোমেনের অন্তর স্বভাবগত ভাবেই হেদায়েতের প্রতি আকৃষ্ট থাকে, যখন সে শরীয়তের এলম হাসিল করে, শরীয়ত সম্পর্কীয় জ্ঞান অর্জন করে, তখন সে অধিকতর হেদায়েত লাভ করে। তাই বলা হয়েছে نُورٌ عَلَى نُورٍ আলোর উপর আলো।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন, যে সত্য-সাধক, যে সত্যিকার অর্থে সুফী, যার অন্তর আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে এবং আল্লাহর মহব্বতে থাকে পরিপূর্ণ, সে হক্ব কথা বলে, হক্ব পথে থাকে, হক্ব বিষয়ে বিশ্বাস করে, যাবতীয় হক্ব সে গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে, সে বাতিলকে বর্জন করে, স্বভাবগত ভাবেই তার অন্তর বাতিলকে ঘৃণা করে, এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি তোমার বিবেককে জিজ্ঞাসা কর।

(বোখারী)

যখন মোমেনের অন্তরে কোরআনে করীম এবং হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এলম আসে, তখন তার একীন বৃদ্ধি পায়, এর পাশাপাশি

বৃদ্ধি পায় তার হেদায়েতের নূর। তাই এ অবস্থাকে نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ বা আলোর উপর আলো বলা হয়েছে।

এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় কালবী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল মোমেনের ঈমান এবং আমল, অর্থাৎ যখন ঈমান বৃদ্ধি পায় তখন নেক আমলও বৃদ্ধি পায়।

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, এ বাক্যটির অর্থ একটি হল ঈমানের নূর, আরেকটি হল কোরআনের নূর। যখন দু'টি নূর একত্রিত হয় তখনই, نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ হয়।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী (রঃ) এবং এবনে জায়েদ (রঃ) বলেছেন, এটি দৃষ্টান্ত হল পবিত্র কোরআনের, 'মেসবাহ' হল পবিত্র কোরআন, যেভাবে প্রদীপ থেকে আলো গ্রহণ করা হয়, ঠিক তেমনিভাবে পবিত্র কোরআন থেকে হেদায়েত লাভ করা হয়। 'জুযাজাহ' হল মোমেনের অন্তর, মেশকাত হল মোমেনের মুখ এবং রসনা, বরকতময় বৃক্ষ হল ওহীর বৃক্ষ, জায়েত বা তৈল দ্বারা পবিত্র কোরআনের দলীল প্রমাণ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেভাবে প্রদীপে তৈল দিলে চতুর্দিক আলোকিত হয়ে যায়, ঠিক তেমনিভাবে পবিত্র কোরআনের দলীল প্রমাণের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সত্য উদ্ভাসিত হয়। পবিত্র কোরআন নাজিল হবার পূর্বেই আল্লাহ পাক মানব জাতির হেদায়েতের অনেক নিদর্শন কায়েম করেছেন। আর যখন পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছে, তখন نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ হয়েছে। অর্থাৎ মোমেনের অন্তরে স্বভাবগতভাবেই নূর ছিল, তার উপর পবিত্র কোরআনের নূর বাড়তি আলোর কারণ হয়েছে।

মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রঃ)—এর ব্যাখ্যা

হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রঃ) তাঁর কাশফ ও এলহামের ভিত্তিতে এ আয়াতের দু'টি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন,

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

এর অর্থ হল আল্লাহ পাকই আসমান ও জমীনকে অস্তিত্ব দান করেছেন। যেখানে কিছুই ছিলনা, সেখানে তিনিই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।

এ পর্যায়ে দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল, اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অর্থ আল্লাহ পাক আসমান ও জমীনবাসীকে তাঁর মারেফাতের পথ প্রদর্শন করেন। অতএব, আসমান জমীনের অধিবাসীগণ আল্লাহ পাকের নূর দ্বারাই তাঁর

পবিত্র সত্তা ও গুণাবলীর পরিচয় পেয়ে থাকে এবং তাঁর নৈকট্য লাভে ধন্য হয়। একথাই কোরআনে করীমের একটি আয়াতে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

আল্লাহ পাকই মোমেনদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে গোমরাহীর অন্ধকার থেকে হেদায়েতের দিকে নিয়ে আসেন। এ আয়াতেও আল্লাহ্ পাক উক্ত নূরের কথাই বলেছেন।

হাদীসে কুদসীতে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার বান্দা নফল এবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে, অবশেষে আমিও তাকে মহব্বত করতে শুরু করি। আর যখন আমি তাকে মহব্বত করি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই যা দ্বারা সে শ্রবণ করে, আমি তার চোখ হয়ে যাই যা দ্বারা সে দেখে।

(আল হাদীস)

আর এ নৈকট্যের নামই হল বিশেষ বেলায়েত।

مَثَلُ نُوْرِهٖ

অর্থাৎ মোমেনের অন্তরে আল্লাহ পাকের যে নূর রয়েছে তার দৃষ্টান্ত হল এমন, মোমেনের অন্তরে আল্লাহ পাকের গুণাবলীর জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়, আর আল্লাহ্ পাকের গুণাবলী হল একটি প্রদীপের ন্যায় আর এ প্রদীপটি বরকতময় জয়তুন বৃক্ষের তেল দ্বারা প্রজ্বলিত হয়। আর ঐ বৃক্ষটিও পূর্বেও নয়, পশ্চিমেও নয় অর্থাৎ আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্তা থেকে তাঁর গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ হয়। আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নূরের যে প্রতিবিম্ব প্রকাশিত হয়, তার মাধ্যমেই আওলিয়ায়ে কেরাম আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভে ধন্য হন। আউলিয়ায়ে কেরাম হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণের মাধ্যমেই নৈকট্য লাভে ধন্য হন। আম্বিয়ায়ে কেরামের পরেই সিদ্দীকগণের স্থান, আর তাঁদের সম্পর্কে কোরআনে করীমের সূরায়ে ওয়াকেয়ায় এরশাদ হয়েছেঃ

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ

যেহেতু আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে রহমতুললিল আলামীন করে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর অন্তরে রহমতের নূর এবং ঈমান পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, তাই আল্লাহ পাকের নূর লাভের একমাত্র পন্থা হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে সামান্যতম নূর লাভ করতে পারলেও তা একটি অন্তরকে আলোকিত করার জন্যে যথেষ্ট হয়।

মূলতঃ মানুষ তিন প্রকার। (এক) সে সব লোক যারা ঈমানের বাহ্যিক দিকটি অর্জন করেছে, ফলে দুনিয়াতে কুফর ও নাফরমানী থেকে এবং আখেরাতে দোজখ থেকে নাজাত পেয়েছে। (দুই) যারা ঈমানের সত্যিকার তত্ত্ব লাভ করেছে, যারা ঈমানের তত্ত্ব ও মাহাত্ম লাভে ধন্য হয়েছে তাদের উচ্চ মর্তবা রয়েছে। (তিন) সে সব লোক যারা ঈমানের নূর আদৌ পায়নি, সঠিক পথ থেকে হয়েছে বঞ্চিত, তাই তারা পথভ্রষ্ট।

হযরত আবু আম্বাসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ বিশ্ববাসীর মধ্যে আল্লাহ পাকের নূর অবতরণের কিছু পাত্র রয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নেক বান্দাদের অন্তর, যে অন্তর সর্বাধিক বিনম্র, বিনয়ী, আল্লাহ পাকের নিকট তা অত্যন্ত প্রিয়। (তেবরানী)

وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ط

আর আল্লাহ পাক মানুষের উপকারার্থে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, যাতে করে সত্য-অসত্যের পার্থক্য সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পায়। যা মানুষ দেখেনা অথবা যা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধিও করতে পারেনা সে সব বিষয়কে আল্লাহ পাক দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেন, ফলে যারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা, সত্য তাদের অন্তর দৃষ্টিতে মূর্ত হয়ে দেখা দেয়।

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

আল্লাহ পাক সব কিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, তিনি মহাজ্ঞানী, তাঁর জ্ঞান পরিপূর্ণ, সব কিছুকে পরিবেষ্টনকারী, কে আল্লাহ পাকের নূর লাভের যোগ্য, আর কে যোগ্য নয় তা আল্লাহ পাক ভাল ভাবেই জানেন। বিশ্ব সৃষ্টির অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই আল্লাহ পাক সব কিছু সম্পর্কে অবগত। বিশ্বে কোন কিছু তাঁর নিকট গোপন নেই, মানুষ যা চিন্তা করে, মানুষের মনের গহনে যে সব ভাবনার অবতারণা হয়, সে সম্পর্কেও আল্লাহ পাক ওয়াকেফহাল।১

فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ

"সেই সকল গৃহে যাকে সমুন্নত করতে এবং যাকে আল্লাহ পাকের নাম স্মরণ করতে তিনি নির্দেশ প্রদান করেছেন, সকাল সন্ধ্যায় তারা তাঁর পবিত্রতার মহিমা ঘোষণা করে।"

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -৩৬৫-৮০

তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১২৮-৩২

তফসীরে রুহুল মা'আনী, খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-১৬৯-৭০

তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫২-৫৪

পূর্ববর্তী আয়াতে হেদায়েতের নূরের দৃষ্টান্ত বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, কারা হেদায়েত প্রাপ্ত লোক? এবং হেদায়েতের আলো কোথায় পাওয়া যায়? তাই এরশাদ হয়েছেঃ فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ

অর্থাৎ মসজিদ সমূহ যা নির্মাণের জন্যে আল্লাহ পাক আদেশ দিয়েছেন, সেখানে আল্লাহ পাকের জিকির হয় সকাল সন্ধ্যা তথা সর্বক্ষণ, সেখানেই হেদায়েতের নূর লাভ করা যায়। আর তা লাভ করে সেসব লোক, যারা মসজিদ সমূহে আল্লাহ পাকের জিকিরে মশগুল থাকে।

এ আয়াতের তফসীরে সায়ীদ এবনে জুবায়ের (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মসজিদ হলো পৃথিবীতে আল্লাহর গৃহ, আসমানবাসীরা মসজিদকে অত্যন্ত জ্যোতির্ময় অবস্থায় দেখে যেমন জমিনবাসী আসমানের নক্ষত্রকে জ্যোতির্ময় দেখে।

হাসান বসরী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাক আদেশ দিয়েছেন যেন মসজিদ সমূহের তাযিম করা হয়। মসজিদে প্রবেশের সংগে সংগে দু'রাকাত নামাজ মসজিদের সম্মান স্বরূপ আদায় করা হয়। পবিত্র কোরআন পাঠ করা হয়, তসবীহ তাহলীল করা হয়, কোন প্রকার বাজে কথা বলা না হয়।

وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ

সকাল সন্ধ্যায় এ গৃহ সমূহে আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করা হয়।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, এই তসবীহ তাহলীল দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। ফজরের নামাজ সকালের তসবীহ, আর অবশিষ্ট চার ওয়াক্ত নামাজ বিকালের তসবীহ। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অজু করে নামাজে গমন করে তার সওয়াব এহরাম বেধে হজ্বের জন্যে যে গমন করে তার ন্যায়। আর যে চাশতের নামাজের জন্যে যায়, তার সওয়াব ওমরার উদ্দেশ্যে গমণকারীর ন্যায়।

কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে দুনিয়ার মসজিদ সমূহের কথাই বলা হয়েছে, আর এ আয়াতে মসজিদ নির্মাণ, মসজিদ আবাদ রাখার এবং তার আদব ও তাজীম করার আদেশ রয়েছে। হযরত রসূলুলাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ পাক একটি গৃহ তার জন্যে জান্নাতে তৈরী করেন।১

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৮, পৃষ্ঠা-৬৬

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ
اِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ﴿٣٧﴾
لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ
مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ
بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً حَتّٰى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّ
وَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾ اَوْ
كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ
سَحَابٌ ظُلُمٰتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ
يَرٰىهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ﴿٤٠﴾

তরজমা

(৩৭) এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা বাণিজ্য এবং ক্রয় বিক্রয় আল্লাহ পাকের জিকির থেকে এবং সঠিক ভাবে নামাজ আদায় করা ও যাকাত প্রদান থেকে গাফেল করতে পারেনা, তারা ভয় করে সেদিনকে যেদিন হৃদয় এবং চোখ এদিক সেদিক হতে থাকবে।

(৩৮) আল্লাহ পাক যেন তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের জন্যে উত্তম পুরস্কার প্রদান করেন, অধিকন্তু তাঁর দয়ায় তিনি তাদেরকে আরো সওয়াব বাড়িয়ে দেন, আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা বেশুমার রিজিক দিয়ে থাকেন।

(৩৯) আর যারা কাফের তাদের আমল মরুভূমির মরীচিকার ন্যায়, তৃষ্ণার্ত মানুষ যাকে পানি মনে করে থাকে, অবশেষে যখন তার নিকট উপস্থিত হয়, তখন তাতে কিছুই পায় না, বরং তার কাছে সে আল্লাহকে পায়, এরপর তিনি তার কর্মফল পুরোপুরি দিয়ে দেন এবং আল্লাহ পাক অতি সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

(৪০) অথবা তাদের আমল গভীর সমুদ্রতলের অন্ধকারের ন্যায়, যার উপরে তরঙ্গ, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উর্দ্ধে মেঘপুঞ্জ, একের পর এক অন্ধকার এমনকি, সে হাত বের করলে তা দেখতে পাবেনা, মূলতঃ আল্লাহ পাক যাকে আলো দান করেননি, তার জন্যে কোথাও আলো নেই।

তফসীরুল কোরআন

যারা আল্লাহ পাকের নূর লাভে ধন্য হয় তাদের কথা পুববর্তী আয়াতাংশে এরশাদ হয়েছে। আর এ আয়াতাংশে তাদের আরও একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে। তা হলো এই যে, তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে তাদেরকে গাফেল করেনা, নামাজ কায়েম ও যাকাত আদায় করা থেকে বিরত রাখেনা, কেননা তাদের উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। হালাল রুজি উপার্জনের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তাদের প্রতি, তাই তারা ব্যবসা বাণিজ্য করে, কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য তাদেরকে আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে গাফেল করেনা, নামাজ ও যাকাত আদায় থেকেও বিরত রাখেনা, আর তারা সেদিনকে ভয় করে যেদিন হৃদয় এবং চোখ এদিক সেদিক হতে থাকবে।

অর্থাৎ কেয়ামতের দিনকে তারা ভয় করে, যেদিন সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ

مُّحْضَرًا ۚ وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ

সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন প্রত্যেকটি মানুষ তার ভাল-মন্দ কৃতকর্ম উপস্থিত দেখতে পাবে। যারা কেয়ামতের সেই কঠিন দিনকে ভয় করবে, আল্লাহ পাকের দরবারে হাজিরী দেয়ার কথা মনে করে যাদের বুক দুরু দুরু কাঁপবে, তারাই সত্যিকার মর্দে মোমেন এবং তারাই সর্বক্ষণ আল্লাহ পাককে স্মরণ করে থাকে।

মহিলাদের উত্তম মসজিদ তাদের গৃহ

লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে আলোচ্য আয়াতে رِجَالٌ (পুরুষ) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, এর কারণ এই, মহিলাদের জন্যে জুমার নামাজে যাওয়া বা জামাতে হাজির হওয়া জরুরী নয়; বরং তাদের জন্যে তাদের গৃহে নামাজ আদায় করাই উত্তম।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মেয়েদের নামাজ তাদের গৃহে উত্তম।

মসনদে একখানি হাদীস রয়েছে এরশাদ হয়েছে, মহিলাদের জন্যে উত্তম মসজিদ হল তাদের গৃহ কোণ।

মসনদে আহমদে আরো একটি বর্ণনা রয়েছে, হযরত আবু হুমায়েদ সায়দী (রাঃ)– এর স্ত্রী হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হলেন এবং বললেন, হুজুর আমি আপনার সঙ্গে নামাজ পড়তে পছন্দ করি। তিনি এরশাদ করলেন, তা আমি জানি, কিন্তু মাছআলা হল এই যে তোমার ঘরের আঙ্গিনা থেকে ঘরের অভ্যন্তরের কক্ষ তোমার নামাজের জন্যে উত্তম স্থান। আর মহল্লার মসজিদ থেকে তোমার গৃহের নামাজই উত্তম, আর আমার মসজিদ থেকে তোমার মহল্লার মসজিদের নামাজ উত্তম।

এ কথা শ্রবণ করে তিনি স্বগৃহের সম্পূর্ণ ভেতরে একটি কক্ষকে মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেখানেই নামাজ আদায় করেন।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ মসজিদে মহিলাদের নামাজ পড়া অবৈধ নয়, তবে শর্ত হল তারা যেন পুরুষদের সম্মুখে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে এবং খুশবু ব্যবহার করে বের না হয়।

আবু দাউদ শরীফে হাদীস সংকলিত হয়েছে, "মহিলাদের জন্যে তাদের গৃহ উত্তম স্থান"। আর হাদীস শরীফে একথাও আছে যে"তারা যেন সুগন্ধী ব্যবহার করে বের না হয়।"

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মেয়েদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মসজিদে আসতে চায় সে যেন সুগন্ধী স্পর্শও না করে।"

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে রয়েছে, মুসলমান মহিলাগণ ফজরের নামাজে আসতেন এবং যাবার সময় চাদর দিয়ে নিজেকে ঢেকে চলে যেতেন আর রাতের অন্ধকার কিছুটা থাকত বলে তাদেরকে চেনা যেতনা।

উম্মুল মোমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আজকাল মেয়েরা যে সব নতুন নতুন কথা বের করছে, যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এসব বিষয় দেখতে পেতেন তবে মহিলাদেরকে মসজিদে আসতে বারণ করতেন, যেমন বণী ইসরাঈলের স্ত্রী লোকদেরকে বারণ করা হয়েছে।

(বোখারী, মুসলিম)

এমন সব লোক যাদেরকে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে বিরত রাখেনা, যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

(সুরা মুনাফেকুন, আয়াতঃ৯)

হে মোমেনগণ! তোমাদের সম্পদ এবং সন্তান সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে উদাসীন না করে। যারা উদাসীন হবে, তারাইতো ক্ষতিগ্রস্ত। এজন্যে সূরায়ে জুমআয় আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ....

হে মোমেনগণ! যখন তোমাদেরকে জুমআর দিন নামাজের জন্যে আহবান করা হয়, তখন আল্লাহর স্মরণের জন্যে দ্রুতবেগে যাও এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়, আর এটি তোমাদের জন্যে উত্তম পন্থা যদি তা তোমরা বুঝতে পার; অর্থাৎ আযানের সংগে সংগে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ করা এবং নামাজের জন্যে যাওয়া মর্দে মোমেনের একান্ত কর্তব্য।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) একদিন লক্ষ্য করলেন, লোকেরা আযান শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে মসজিদের দিকে গমণ করছেন, তখন তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করলেন এবং বললেন, এরাই সে সব লোক যাদের কথা আল্লাহ পাক এ আয়াতে এরশাদ করেছেন।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, যদি আমি ব্যবসা করি আর দৈনিক তাতে তিনশত স্বর্ণমুদ্রাও লাভ করি, কিন্তু নামাজের সময় আমি ব্যবসা ছেড়ে অবশ্যই আল্লাহর জিকিরের দিকে চলে যাব।

এবাদত ও তেজারত পরস্পর বিরোধী নয়

এ আয়াত দ্বারা আরো একটি কথা প্রমাণিত হল, তা হচ্ছে, এবাদত এবং তেজারত পরস্পর বিরোধী কাজ নয়, এবাদতের পাশাপাশি তেজারতও চলতে পারে; তবে মন, মনের মালিক আল্লাহ পাকের নিকট থাকবে। আল্লাহ পাকর স্মরণ থেকে গাফলত এ পর্যায়ে নিষিদ্ধ। গাফলত হয় দুনিয়ার মহব্বতের কারণে আর দুনিয়ার

মহব্বত হল সব পাপের মূল কারণ। এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

حب الدنيا راءس كل خطئة

সকল পাপের মূল উৎস হল দুনিয়ার মহব্বত।

ইসলামী শরীয়ত মানুষ মাত্রকে হালাল পন্থায় রুজি উপার্জনের নির্দেশ দিয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

كسب الحلال فريضة بعد الفريضة

ফরজ আদায়ের পর হালাল রুজীর অন্বেষণ করাও ফরজ।

এজন্যে ইসলামী শরীয়তে ব্যবসায়ের নিয়ম-কানুন নির্ধারিত রয়েছে, যাকাতের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে, শ্রমিকদের হক আদায়ের তাগিদ করা হয়েছে। এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে, ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য বা দুনিয়াদারী অবৈধ নয়, বরং অবৈধ হলো আল্লাহ পাককে ভুলে গিয়ে দুনিয়াদারীতে মশগুল হওয়া, অবৈধ পন্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য করা। এজন্যে দার্শনিক কবি বলেছেন-

مصلحت دردين ما جنگ وشكوه =

مصلحت دردين عيسى غار وكوه

আমাদের ধর্মে যুদ্ধ বিগ্রহ তথা জীবন-সংগ্রাম পছন্দনীয়, পক্ষান্তরে, ঈসাইদের ধর্মে জীবন-বিমুখ হয়ে থাকা পছন্দনীয়।

نمى گويم كه از دنيا جدا باش

=بهر كارے كه باشى باخدا باش

আমি একথা বলিনা, যে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাক, বরং যে কাজেই থাক, আল্লাহ পাকের সংগে থাক, তাঁকে কখনও ভুলে যেওনা, তাঁর বিধান সম্পর্কে গাফেল হয়োনা। আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নবুওয়ত ও রিসালাতের মহান দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে পৃথিবীর সর্বকালের রাষ্ট্রনায়কদের জন্যে আদর্শ স্থাপন করেছেন। তিনি সেনাপতি হিসেবে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন, প্রধান বিচারক হিসেবে হাজার হাজার মামলা মোকদ্দমার রায় দিয়েছেন। মানুষের জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্তরের জন্যে তিনি বিধান প্রবর্তন করেছেন। পারিবারিক জীবন হোক, কী সামাজিক, জাতীয় জীবন হোক কী আন্তর্জাতিক- এক কথায়

সকল ক্ষেত্রেই তিনি পথ-নিদের্শনা দিয়েছেন। আর এ অর্থেই ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন-বিধান। মানব জীবনের সকল সমস্যার নিখুঁত সমাধান পেশ করে ইসলাম।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা পবিত্র কোরআন এ সত্য বিশ্ব মানবের সম্মুখে নতুন করে তুলে ধরেছে; তাই এরশাদ হয়েছেঃ

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে এবং নামাজ আদায় করা থেকে ও জাকাত প্রদান থেকে রিবত রাখে না। আলোচ্য আয়াতে ذكر الله (আল্লাহর জিকির) দ্বারা মসজিদে হাজির হয়ে নামাজ আদায় করাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অথবা এর অর্থ হলো সাধারণ ভাবে সর্বক্ষণ আল্লাহ পাককে স্মরণ করা, মানুষ যেখানে থাক না কেন আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে কখনো সে গাফেল হবে না, এজন্যেই বলা হয়েছেঃ

تم ریل مین چڑھو یا اڑ ٹپ مین جھولو

= مین تو یه کهتاهون که الله کو نه بهولو

তুমি রেলগাড়িতে ভ্রমণ কর, অথবা বিমানে আরোহন কর, আমিতো শুধু বলি কখনো আল্লাহকে ভুলে যেওনা। ব্যবসা-বাণিজ্য, বিয়ে শাদী, রাজনীতি অর্থনীতি, রাষ্ট্রপরিচালনা-এক কথায় সকল অবস্থায় স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাককে স্মরণ করা, তাঁর বিধি-নিষেধ পালন করা মরদে মোমিনের বৈশিষ্ট্য। যারা এ বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখতে পারে তাদের অন্তরই আল্লাহ পাকের নূরে আলোকিত হয়।

وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ

অর্থাৎ যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য তাদেরকে নামাজ আদায় করা থেকে গাফেল করে না।

আল্লামা বগভী (রহঃ) লিখেছেন, নামাজ কায়েম করার তাৎপর্য হলো নির্ধারিত সময়ে সঠিক ভাবে নামাজ আদায় করা। যারা নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ আদায় করে না তাদেরকে নামাজ কায়েমতকারী বলা যায় না।

وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ

অর্থাৎ তারা সে সব লোক যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বা দুনিয়াদারী তাদেরকে যাকাত আদায় করা থেকে বিরত রাখে না। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো যখন যাকাত আদায়ের সময় হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে আদায় করে দেয়, তাতে বিলম্ব করে না, আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেনঃ এর দ্বারা সকল নেক আমলকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

তারা ভয় করে সেদিনকে যেদিন হৃদয় ও চোখ এদিক সেদিক হতে থাকবে। অর্থাৎ কেয়ামতের দিনকে যারা ভয় করে যারা সেদিন অত্যন্ত ব্যাকুল হবে, সেদিন তাদের অবস্থার পরিবর্তন হবে। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হলো দুনিয়াতে তারা আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী করেছে, কিন্তু কেয়ামতের দিন তাদের মনের অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং তাদের চোখের পর্দা সরে যাবে আর এমন এমন দৃশ্য তারা দেখবে যা কখনো দেখেনি, এমনকি কখনো চিন্তাও করেনি।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ এর অর্থ হলো কেয়ামতের দিন ভয়ের কারণে মোমেনদের অবস্থারও পরিবর্তন হবে। কখনো ধ্বংসের আশংকা হবে আর কখনো নাজাতের আশা হবে, তারা ব্যাকুল থাকবে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে, কখনো এদিক সেদিক দেখতে থাকবে অত্যন্ত ব্যাকুল অবস্থায়, ডান হাতে আমলনামা আসে কি বাম হাতে আসে? এজন্যে তারা অত্যন্ত ব্যাকুল থাকবে, যারা কেয়ামতের সেই ভয়াবহ দিনকে ভয় করবে এবং সেই কঠিন দিনের জন্যে ঈমানের সাথে নেক আমলের সম্বলও সংগ্রহ করবে, তাদের অন্তরই আল্লাহ পাকের নূরে জ্যোতির্ময় হয়।

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا

আল্লাহ পাক যেন তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের জন্যে, উত্তম পুরস্কার প্রদান করেন, শুধু তাই নয়, রবং

وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ

আল্লাহ পাক নিজের দয়ায় তাদের পুরস্কার আরও বাড়িয়ে দিবেন। তাঁর দান তাঁর করুণা অনন্ত অসীম।

وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

আর আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা বে-হিসাব দান করে থাকেন। কেননা, তিনি ইচ্ছা করলে কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারেনা, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি মহান দাতা, তাঁর দয়া-মায়ার কোন সীমা নাই। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন যখন সকলকে একত্রিত করা হবে, তখন আল্লাহ্ পাক একজন ঘোষককে আদেশ দেবেন, সে উচ্চস্বরে ঘোষণা করবে, যা হাশরের ময়দানের উপস্থিত সকলেই শ্রবণ করবে-যে আজ সকলেই জানতে পারবে, কে আল্লাহ্ পাকের দরবারে সর্বাধিক সম্মানিত। এরপর ঘোষণা করবে, সে সব লোক দাঁড়িয়ে যাও, যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য তাদেরকে

আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে বিরত রাখতো না, তখন তারা দাড়াবে। তাদের সংখ্যা হবে অত্যন্ত কম। সর্ব প্রথম তাদেরকে হিসাব থেকে অবসর করা হবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেছেন, তাদের নেক আমলের বিনিময়ে তারা জান্নাত পাবে, আর তার চেয়ে বাড়তি দান লাভ করবে এই যে যারা তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করছে তারা ঐ ভাগ্যবান লোকদের সুপারিশের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।১

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ

"আর যারা কাফের তাদের আমল মরুভূমির মরীচিকার ন্যায়, তৃষ্ণার্ত মানুষ যাকে পানি মনে করে থাকে, অবেশেষে যখন তার নিকট উপস্থিত হয় তখন তাতে কিছুই পায় না"। পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মুমেনদের হেদায়েত এবং শুভ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে কাফেরদের অবস্থা ও ভয়াবহ পরিণতি ঘোষিত হয়েছে। অথবা পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাক মোমেনদের হেদায়েতের নূরের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, আর এ আয়াত থেকে কাফেরদের অন্যায়-অনাচারের কুফরী ও নাফরমানীর দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। বস্তুতঃ কাফেরদের মধ্যে দু' প্রকার লোক রয়েছে। এক প্রকার লোক দান খয়রাত করে, পরোপকারে এগিয়ে আসে, জনসেবায় অংশগ্রহণ করে একথা মনে করে যে পরকালে তারা এর উপকার পাবে। তাদের দৃষ্টান্ত হল, মরুভূমির সেই পথিকের ন্যায় যে দূর থেকে মরীচিকা দেখে তাকে পানি মনে করে এবং অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় মরীচিকাকে পানি মনে করে তার পেছনে ছুটে, ক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থায় সেখানে পৌছে দেখে এক ফোটা পানিও সেখানে নেই। নিরাশ ও হতাশ হয়ে তারা ভেঙ্গে পড়ে। ঠিক এ অবস্থাই হবে কাল কেয়ামতের দিন কাফেরদের, যারা পৃথিবীতে কিছু ভাল কাজ করে এই ভুল ধারণা করেছে যে আখেরাতে তার শুভ পরিণতি তারা লাভ করবে। অথচ এ সব তাদের আকাশ কুসুম কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই ছিলনা। আল্লাহ পাকের প্রতি খাঁটি ঈমান না থাকলে আখেরাতে শাস্তি ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যাবেনা। গুণাহ কুফর ও নাফরমানী তাদের সকল সৎকাজকে অকেজো করে দেয়। ঠিক যেভাবে মরুচারী মরীচিকার পেছনে গিয়ে কিছুই পায়না, এমনিভাবে কাফেররাও আখেরাতে কিছুই পাবেনা। এজন্যেই দার্শনিক কবি বলেছেন-

اس سراب رنگ وبوکو گلستان سمجھاھے تو=

آہ قفس کو آشیان سمجھا ھے تو

ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর মরীচিকাকে তুমি ফুলের বাগান মনে করেছো, আক্ষেপ তোমার জন্যে, তুমি বন্দীশালাকে আশ্রয়স্থল মনে করেছো।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৮, পৃষ্ঠা-৬৯

কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক বিষয়টিকে এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ....

"নিশ্চয়ই যারা আমার মোলাকাতের আকাংখা করেনা, আর দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবন নিয়েই তারা সন্তুষ্ট হয়েছে এবং তা নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে, আর যারা আমার আয়াত সমূহ সম্পর্কে গাফেল হয়েছে, তারাই সে সব লোক যাদের ঠিকানা হল দোযখ, তাদের কৃতকর্মের পরিণতি স্বরূপ।"

বস্তুতঃ কাফেররা যত সৎ কাজই করুক, ঈমান না থাকার কারণে তাদের কোন সৎ কাজই গ্রহণযোগ্য হবেনা, তারা কেয়ামতের দিন দেখবে যে তাদের কোন নেক আমল নেই। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছে, কেয়ামতের দিন ইহুদীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা দুনিয়াতে কার এবাদত করতে? তারা বলবে আল্লাহর পুত্র ওজায়রের। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যাবাদী, আল্লাহ পাকের কোন সন্তান নেই। এরপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা এখন কি চাও? তারা বলবে, হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে পানি পান করানো হোক। তখন বলা হবে সম্মুখে কি দেখা যায়? সেখানে তোমরা যাও না কেন? তখন তারা দূর থেকে দোযখ দেখবে, ঠিক যেমন দুনিয়াতে মরীচিকা দেখা যায়। পানি আছে মনে করে সেখানে তারা যাবে। এরপর তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।১

মূলতঃ যারা পৃথিবীতে আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করে, এতদসত্ত্বেও তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, তাঁর একত্ববাদে অবিশ্বাস করে এবং তাঁর বিধি-নিষেধকে অমান্য করে তাদের এ পরিণতি হওয়াই স্বাভাবিক। আলোচ্য আয়াতে একথাই ঘোষণা করা হয়েছে।

وَوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ

অর্থাৎ সে যখন আল্লাহ পাকের নিকট হাজির হবে, তখন আল্লাহ পাক তার জীবনের কৃতকর্মের বদলা পুরোপুরি দান করবেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পনিপত্তি (রঃ) কথাটির ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন, কেয়ামতের দিন কাফেররা অত্যন্ত বেশী পিপাসাগ্রস্ত হবে, অগ্নি পানির আকৃতি ধারণ করে তাদের সম্মুখে আসবে। তারা দোযখের অগ্নিকে পানি মনে করবে এবং

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৮, পৃষ্ঠা-৭০

সেদিকে দৌড়ে চলে যাবে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দোযখের শাস্তি ভোগ করবে। অথবা এর অর্থ হল, যেভাবে মরীচিকার পেছনে ছুটে অবশেষে মানুষ ব্যর্থ হয় এবং দুঃখ, ক্ষোভ ও ব্যাথায়, ব্যর্থ্যতায় জর্জরিত হয়, কাফেররা কেয়ামতের দিন তেমনিভাবেই ব্যর্থ ও বিপদগ্রস্ত হবে। আর ঐ বিপদের কারণ হল তাদের কৃতকর্ম। অথবা এর অর্থ হল কাফেররা যখন কেয়ামতের দিনে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাজির হবে তখন আল্লাহ পাকের আযাব ব্যতীত আর কিছুই পাবেনা।

وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

আল্লাহ পাক অতি সত্ত্বর হিসাব গ্রহণকারী। এ বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে।

১। আল্লাহ পাক অতি সত্ত্বর হিসাব গ্রহণ করবেন। একজনের হিসাবের ব্যাপারে মশগুল থাকার কারণে অন্যের হিসাব গ্রহণে বিলম্ব হবেনা। এ পৃথিবীর এক দিনের অর্ধেক সময়ের মধ্যে সমগ্র মানব জাতির হিসাব নিকাশ শেষ হবে। অথবা এর অর্থ হল এই, যেহেতু আল্লাহ পাক সকলের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, সব কিছুই তাঁর নখ দর্পণে, কোন মানুষের জীবনের কোন কাজই তাঁর নিকট গোপন নেই, তাই মানব জাতির জীবনের কর্মকান্ডের হিসাব-নিকাশ আদৌ কঠিন হবে না, সহজ হবে এবং দ্রুত হবে। অতএব, প্রত্যেকটি মানুষের কেয়ামতের কঠিন দিনের হিসাব নিকাশের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত। অর্থাৎ সাবধান হয়ে জীবন-যাপন করা উচিত এবং আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালন করা ও তাঁর নাফরমানী থেকে বিরত থাকা কল্যাণকামী মানুষের একান্ত কর্তব্য।

اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ

অথবা তাদের আমল গভীর সমুদ্রতলের অন্ধকারের ন্যায় যার উপরে থাকে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উর্দ্ধে মেঘপুঞ্জ, একের পর এক অন্ধকার, এমনকি সে হাত বের করলে তা দেখতে পাবেনা। মূলতঃ আল্লাহ পাক যাকে আলো দান করেননি, তার জন্যে কোথাও আলো নেই।

এ আয়াতে কাফেরদের দ্বিতীয় দলের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে, যারা সারা জীবন পাপাচারে লিপ্ত থাকে, কুফর, শেরক, অন্যায়-অনাচার, জুলুম অত্যাচারে আজীবন লিপ্ত থাকে, কখনও কোন সৎকাজ করেনা, কেয়ামতের দিন তাদের দুর্দশা হবে সেই ব্যক্তির ন্যায় যে গভীর সমুদ্রের গহীন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়, তার উপর আসে ঢেউয়ের পর ঢেউ, এর উপর রয়েছে অমানিষার অন্ধকার, তদুপরি আকাশে মেঘের ঘনঘটা সেই অন্ধকারকে আরো নিবিড় করে তুলেছে। অন্ধকার এত বেশী যে সে নিজের হাতটি পর্যন্ত দেখতে পায়না এমন গভীর অন্ধকারে পাতিত ব্যক্তির যে

অবস্থা হয়, কাল কেয়ামতের কঠিন দিনে কাফেরদের ঠিক এ অবস্থাই হবে। তাই এরশাদ হয়েছে।ঃ

اَوْ كَظُلُمٰتٍ

অর্থাৎ কাফেরদের কৃতকর্মকে মরীচিকার ন্যায় মনে কর অথবা ঘন অন্ধকারের ন্যায় তাদের কার্যকলাপ কেয়ামতের দিন তাদের আক্ষেপেরই কারণ হবে।

অথবা কথাটিকে এভাবে বলা যায় যে কাফেরদের কার্যকলাপ দু'প্রকার, তারা কখনো দান খয়রাত করে জন সেবায় অংশ গ্রহণ করে, এগুলোকে পূর্ববর্তী আয়াতে মরীচিকার ন্যায় বলা হয়েছে। (এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে) আর তাদের কুফর, শেরক অন্যায়-অনাচারকে অন্ধকার বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। আর অন্ধকারও এত বেশী যে অন্ধকারে আচ্ছন্ন এই ব্যক্তি তার হাতও দেখতে পায়না।

বস্তুতঃ যারা কুফর, শেরক, অন্যায়ের গভীর সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকে, তারা চরম অন্ধকারেই থাকে। তাদের কথা, কাজ, চিন্তা-চেতনা, আকিদা বিশ্বাস এককথায় সব কিছুতেই থাকে অন্ধকার। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ

অর্থাৎ গভীর সমুদ্রের গহীন অন্ধকারে তারা পতিত,

يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ

তাদের উপর আসে ঢেউয়ের পর ঢেউ, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ,

مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ

তদুপরি আকাশে মেঘের ঘনঘটা ঐ অন্ধকারকে আরো নিবিড় করে তোলে ফলে আকাশের তারকারাজির আলো থেকে তারা থাকে বঞ্চিত।

ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ

অর্থাৎ অন্ধকারের উপর অন্ধকার এভাবে তাদেরকে অচ্ছন্ন করে রাখে।

اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا

এমন অন্ধকারে পতিত ব্যক্তি তার নিজের হাতও দেখতে পায়না অর্থাৎ তাদের মন্দ এবং ঘৃন্য কর্মকান্ডের অন্ধকার তাদের অন্তরকে এভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে যে সত্যকে তারা দেখতে পায় না, ফলে সত্যকে গ্রহণ করতে পারেনা। হেদায়েতের আলো থেকে তারা হয় বঞ্চিত যেভাবে একের পর এক সমুদ্রে ঢেউ আসতে থাকে, ঠিক তেমনিভাবে তাদের মন-সমুদ্রে পাপচারের ঢেউ আসতে থাকে এবং তারা গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছান্ন হতেই থাকে। এ কারণেই তারা আল্লাহ পাকের তরফ

থেকে প্রেরিত নবী রসূলগণের আহবানে সাড়া দেয়নি এমনকি, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যিনি শুধু নবী রসূল নন, বরং সকল নবী রসূলগণের দলপতি বা সাইয়েদুল মুরসালীন তাঁকেও তারা অস্বীকার করেছে, তাঁর মহান অনিন্দ্য-সুন্দর আদর্শ আজো বিদ্যমান, কিন্তু কুফর ও শেরকের অন্ধকারে আচ্ছন্ন কাফেররা তাঁর আদর্শ গ্রহণে অপ্রস্তুত; বরং তাঁর বিরোধিতায় ব্যস্ত। তাই পরবর্তী আয়াতে এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক একটি মূলনীতি ঘোষণা করেছেন।

وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ۝٤٠

মূলতঃ আল্লাহ পাক যাকে হেদায়েতের নূর প্রদান না করেন, সে কখনও ঐ নূর পায়না। হেদায়েত আল্লাহ পাকের দান, আল্লাহ পাক যাকে দান করেন, সে সঠিক পথের সন্ধান পায় আর যে আল্লাহ পাকের নূর থেকে বঞ্চিত হয়, সে পথভ্রষ্ট এবং কোপগ্রস্ত হয়।

আয়াত সম্পর্কে দু'টি কথা

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় এই, আলোচ্য আয়াত সমূহে সর্ব প্রথম হেদায়েতের নূরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এরপর একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে হেদায়েতের নূর লাভ হয় ইসলামী শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে। এরপর এরশাদ হয়েছে হেদায়েতের এ নূর লাভ করতে হলে আল্লাহর ঘর মসজিদে নিয়মিত হাজির হতে হবে এবং আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে মশগুল থাকতে হবে। আর হেদায়েতের এ নূরকে অক্ষুন্ন রাখার জন্যে সর্বদা আল্লাহ পাকের জিকির এবং তসবীহ তাহলীলে মশগুল থাকতে হবে। এজন্যে পন্থা হলো, যারা সকাল সন্ধ্যায় তথা দিবারাত্রি আল্লাহ পাকের জিকিরে মশগুল থাকে, এবং তাদের দুনিয়াদারী বা ব্যবসা-বাণিজ্য তাদেরকে আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল করেনা, এমন লোকদের সান্নিধ্য লাভ করা। এমন লোকদের সংসর্গের কারণে সর্বদা জিকিরে এলাহীতে মশগুল থাকার তওফিক হবে। এরপর যারা সত্য-সাধক, তাদের উত্তম পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে,

وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ

আল্লাহ পাকের প্রেমিক আউলিয়ায়ে কেরামের উচ্চ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর পরবর্তী আয়াত-

وَالَّذِينَ كَفَرُوا ....

থেকে কাফেরদের অবস্থা এবং ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে কাফেরদের কার্যকলাপের দু'টি দৃষ্টান্তও পেশ করা হয়েছে। কাফেদের মধ্যে যারা কিছু সৎ কাজ করে যেমন দুঃখী মানুষের দুঃখ নিবারণে দান খয়রাত করে, তাদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে যে তাদের এসব কাজ হলো মরীচিকার ন্যায়, যাকে দূর থেকে দেখে পানি মনে করে, কিন্তু কাছে গিয়ে দেখে পানির নামগন্ধও নেই। ঠিক এমনিভাবে কাফেররা যত দুঃস্থ বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করুক না কেন, কিন্তু যেহেতু তাদের অন্তরে ঈমান নেই, তাই আখেরাতে এর কোন ফল তারা পাবেনা, কেননা এর জন্যে ঈমান পূর্বশর্ত। আর কাফেরদের কুফর ও শেরক, অন্যায় অনাচার, জুলুম অত্যাচারকে অন্ধকার আখ্যা দেয়া হয়েছে, এ অন্ধকারেই তারা থাকবে দুনিয়াতে এবং আখেরাতে। দুনিয়াতে এ অন্ধকারে থাকার কারণে তারা হেদায়েতের আলো পায়না, আর আখেরাতে তাদের জন্যে দোজখের চিরশাস্তি অবধারিত।১

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -৩৮৬-৮৭

তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৩৫-৩৬

أَلَمْ تَرَ أَنَّ
اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ۖ كُلٌّ
قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ
يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهِ ۚ وَيُنَزِّلُ
مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَّشَآءُ وَ
يَصْرِفُهُ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ۖ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿٤٣﴾

তরজমা

(৪১) তুমি কি লক্ষ্য করোনা যে, আসমানে জমীনে যা কিছু আছে সবই এমনকি পাখিরা পর্যন্ত আল্লাহ পাকের পবিত্রতার মহিমা ঘোষণা করতে থাকে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বন্দেগী এবং তসবীহ জেনে নিয়েছে, আল্লাহ পাক তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

(৪২) আসমান ও জমীনের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ পাকের এবং আল্লাহ পাকের নিকটেই সকলের প্রত্যাবর্তন।

(৪৩) তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, আল্লাহ পাক সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে, এরপর তাদেরকে একত্রিত করেন এবং পরে পুঞ্জিভূত করেন। এরপর তুমি দেখতে পাও তার মধ্য থেকে বহির্গত হয় বারিধারা। আর তিনি আসমান থেকে শিলার পাহাড় অবতীর্ণ করে যার উপর ইচ্ছা তা আপতিত করেন, আর যার থেকে ইচ্ছা সরিয়ে রাখেন। তার বিদ্যুৎতের ঝলক এমন যে এখনই দর্শন শক্তি দুরীভূত করে দিতে পারে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ ওয়ালা লোকদের তাসবীহ এবং নামাজের কথা বলা হয়েছে। আর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে শুধু মানুষই নয়, বরং সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনায় এবং তাঁর মহিমা ঘোষণায় মুগ্ধ রয়েছে। কিন্তু যারা কাফের, যারা পাপীষ্ঠ তারা মূর্খতা এবং পথভ্রষ্টতার ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন রয়েছে, পরিণামে আল্লাহ পাকের জিকির থেকে তারা গাফেল হয়ে আছে। অথবা কথাটিকে এভাবেও বলা যায় পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মোমেনদের অন্তরের নূর এবং কাফেরদের অন্তরের অন্ধকারের বিবরণ ছিল। আর এ আয়াত সমূহে তৌহিদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে যাতে রয়েছে বুদ্ধিমান মাত্রের জন্যেই হেদায়েতের আলো।১

এ পর্যায়ে আল্লাহ পাক তিন প্রকার দলিল বর্ণনা করেছেন, যার আলোকে মানুষ আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হতে পারে। অতএব, হে লোক সকল! গোমরাহীর অন্ধকার থেকে বের হয়ে হেদায়েতের আলোকে নিজেকে আলোকিত কর, আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতের প্রতি লক্ষ্য কর আকাশে-বাতাসে, জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে, এক কথায় পৃথিবীতে যা কিছু আছে, এমনকি আকাশে উড়ন্ত পাখী পর্যন্ত আল্লাহ পাকের পবিত্র নামের তাসবীহ পাঠে ব্যস্ত রয়েছে। কিভাবে আল্লাহ পাকের বন্দেগী করতে হবে তারা খুব ভালভাবে জানে। সৃষ্টি মাত্রেরই যোগ্যতা মোতাবেক আল্লাহ পাক তাকে তার বন্দেগীর নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিয়েছেন যা তারা প্রতিনিয়ত পালন করে চলেছে। শুধু কিছু হতভাগা দূরাত্মা মানুষই আল্লাহ পাকের বন্দেগী থেকে মাহরূম রয়েছে, তারা স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাককে বিস্মৃত করেছে। দুনিয়ার আনন্দ-উল্লাসে মত্ত হয়ে রয়েছে। পশু-পাখী পর্যন্ত সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনায় মুগ্ধ মত্ত থাকে, অথচ যারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত তারা আল্লাহকে ভুলে থাকে, তাঁর প্রতি কর্তব্য পালনে গাফেল থাকে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ

অর্থাৎ আপনি কি দেখেননি যে, আসমান জমিনের সকল অধিবাসী তথা সমগ্র সৃষ্টি জগৎ আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকে এবং তাঁর পবিত্রতার উপর সাক্ষ্য দিতে থাকে এমনকি আকাশে উড়ন্ত পাখিরা পর্যন্ত আল্লাহ পাকের পবিত্রতা,

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৫,

বর্ণনায়, তাঁর তাসবীহ পাঠে মশগুল রয়েছে। সৃষ্টি মাত্রই তাঁর স্রষ্টার বন্দেগীতে মশগুল রয়েছে।

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ

অর্থাৎ প্রত্যেকটি সৃষ্টি তার বন্দেগীর পথ ও পন্থা সম্পর্কে অবগত হয়েছে। কেননা আল্লাহ পাক প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে তাঁর যোগ্যতা অনুসারে বন্দেগীর পন্থা শিক্ষা দিয়েছেন, তাই সৃষ্টি মাত্রই আল্লাহ পাকের বন্দেগী করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে।

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝٤١

"আর আল্লাহ পাক খুব ভালভাবেই জানেন, যা কিছু তারা করছে", সৃষ্টি জগতের কর্মকান্ড সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত এবং প্রত্যেককে তার কর্মের বদলা তিনি পুরোপুরিই দান করবেন।

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

আল্লাহ পাকই আসমান জমীনের মালিক, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রিজিকদাতা, তাঁর আধিপত্য এবং একচ্ছত্র কর্তৃত্ব সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, আসমান জমীন আর তার মাঝে যা কিছু আছে সবই তাঁর কর্তৃত্বাধীন, সবই তাঁর মুখাপেক্ষী, সবই তাঁর দয়ার ভিখারী।

وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

আর সকলকে তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে, আল্লাহ পাক প্রত্যেককে তার আমলের বদলা দান করবেন। তিনি সুবিচার করবেন। যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, তাদের শুভ পরিণতি বা পুরস্কার সুনিশ্চিত। পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনবেনা এবং তাঁর বিধি-নিষেধ সঠিকভাবে পালন করবেনা, তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি অবধারিত।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا

তুমি কি লক্ষ্য করোনি যে আল্লাহ পাক সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে, এরপর তাদেরকে একত্রিত করেন এবং পরে পুঞ্জিভূত করেন। এরপর তুমি দেখতে পাও তার মধ্য থেকে বহির্গত হয় বারিধারা।

আল্লাহ পাকের অনন্ত–অসীম কুদরত হেকমতের আরও একটি নিদর্শন এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। কল্যাণকামী, বাস্তববাদী মানুষ মাত্রকে তা লক্ষ্য করার আহবান জানিয়ে এরশাদ হয়েছে যে, মহান আল্লাহ পাক ছোট ছোট মেঘ খন্ডকে একত্রিত করে তিনি কিভাবে এক বিরাট মেঘমালায় পরিণত করেন। আরও লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে, স্তরের পর স্তর পূঞ্জিভূত মেঘমালা কিভাবে শুণ্যলোকে ভাসমান থাকে। আর সেই ভাসমান মেঘমালা থেকে বারিধারা বর্ষিত হতে থাকে। আর আল্লাহ পাক আসমান থেকে শিলার পাহাড় অবতরণ করেন, যার উপর ইচ্ছা তা অবতরণ করেন, আর যার নিকট থেকে ইচ্ছা তিনি তা সরিয়ে রাখেন। অর্থাৎ পর্বতের ন্যায় মেঘমালা থেকেই আল্লাহ পাক শিলা বৃষ্টি করেন এবং যার উপর তাঁর ইচ্ছা হয় তার জান মাল ধ্বংস হয়। আর যাকে ইচ্ছা তিনি নিতান্ত তাঁর দয়ায় রক্ষা করেন অর্থাৎ তার উপর থেকে শিলা বৃষ্টি সরিয়ে নেন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ পাক এ আয়াত দ্বারা বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন আসমানে শিলার পাহাড় রয়েছে। আল্লাহ পাক যার উপর ইচ্ছা করেন, তার উপরই শিলাবৃষ্টি হয়। আর তিনি দয়া করে যাকে রক্ষা করতে চান সে রক্ষা পায়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ ط

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যার উপর ইচ্ছা শিলা বৃষ্টি করেন, আর যাকে ইচ্ছা রক্ষা করেন।

অর্থাৎ শিলা বৃষ্টি দ্বারা আল্লাহ পাক যখন ইচ্ছা কারও কৃষিক্ষেত্র ধ্বংস করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি রক্ষা করেন।

يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ

আর এ বিষয়টিও লক্ষ্যনীয় যে আল্লাহ পাকের কুদরতে, তাঁর ইচ্ছা ও মর্জিতে আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়, তার চমক এত তীব্র প্রখর হয়, মনে হয় এই বুঝি চোখের দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নিল। এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমত ও মর্জির বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহের প্রতি লক্ষ্য করার আহবান জানানো হয়েছে। আল্লাহ পাক কিভাবে ছোট ছোট মেঘ খন্ডকে একত্রিত করেন এবং ঐ মেঘমালা থেকে বৃষ্টিপাত করেন এবং পৃথিবীকে শস্য- শ্যামলীমায় পরিণত করেন। আরও লক্ষ্যনীয় যে

আকাশে শিলার পাহাড় তৈরী আছে। যখন ইচ্ছা যেখানে ইচ্ছা আল্লাহ পাক শিলাবৃষ্টি করেন। আর এ শিলাবৃষ্টির মাধ্যমে যাকে ইচ্ছা ধ্বংস করেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি রক্ষা করেন। এ সবই তাঁর বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের নিদর্শন। এসব বিস্ময়কর নিদর্শন দেখে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য। কেননা আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্তে মানুষ থেকে তাঁর সকল দান ছিনিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন মনে হয় যেন এ মুহূর্তে চোখের দৃষ্টি ছিনিয়ে নেয়া হবে। অতএব, সাবধানতা অবলম্বন করা কল্যাণকামী মানুষেরই কর্তব্য।

يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ﴿٤٤﴾
وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَ
مِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰۤى اَرْبَعٍ ؕ يَخْلُقُ
اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٥﴾ لَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ؕ
وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤٦﴾ وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا
بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ
ذٰلِكَ ؕ وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَاِذَا دُعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ
يَاْتُوْۤا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ﴿٤٩﴾ اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْۤا اَمْ يَخَافُوْنَ
اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ؕ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٥٠﴾ ع

তরজমা

(৪৪) আল্লাহ পাকই দিন ও রাতের পরিবর্তন ঘটান, এতে শিক্ষা রয়েছে সে সব লোকদের জন্যে যারা অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন।

(৪৫) আর আল্লাহ পাকই প্রাণী মাত্রকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে, তাদের কেউ পেটের উপর ভর করে চলে, কেউ দু'পায়ের উপর, কেউ চারটি পায়ে, আল্লাহ পাক যেমন ইচ্ছা সৃষ্টি করে থাকেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(৪৬) নিশ্চয়ই আমি সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ নাজিল করেছি, আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

(৪৭) আর লোকেরা বলে আমরা আল্লাহ এবং রসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাদের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছি। কিন্তু এরপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে লয় আর প্রকৃত অবস্থা এই, তারা মোমেন নয়।

(৪৮) আর তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়ার জন্যে যখন তাদেরকে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের দিকে আহবান করা হয়, তখনই তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে লয়।

(৪৯) আর যদি তাদের কিছু প্রাপ্য থাকে, তবে তারা অত্যন্ত বিনীতভাবে রসূলের নিকট হাজির হয়।

(৫০) তবে কি তাদের অন্তরে ব্যাধি আছে? অথবা তারা সন্দেহে পড়ে আছে? অথবা আল্লাহ পাক এবং আল্লাহর রসূল তাদের প্রতি জুলুম করবেন বলে ভয় করছে? কিছুই নয়, বরং তারা নিজেরাই জালেম।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের বর্ণনা ছিল। এ আয়াতেও আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরতের নিদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে, যা অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষের চক্ষু উন্মীলিত করার জন্যে যথেষ্ট। এরশাদ হয়েছেঃ

يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ

অর্থাৎ আল্লাহ পাকই দিবা-রাত্রির পরিবর্তন ঘটান, রাতের পর দিন, দিনের পর রাত আনয়ন করেন, অতএব দিবা-রাত্রির পরিবর্তন আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের একটি বিশেষ নিদর্শন, যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ
الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِى الْأَلْبَابِ

নিশ্চয়ই আসমান জমীনের সৃজনে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে অবশ্যই অনেক নিদর্শন রয়েছে। যারা অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন লোক, যারা বুদ্ধিমান তারা দিন ও রাতের পরিবর্তনকে আল্লাহ্ পাকের বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের একটি নিদর্শন হিসেবে দেখে। আল্লাহ্ পাক রাতকে দিনের মধ্যে দিনকে রাতের মধ্যে প্রবশ করান এবং তা যথা সময়ে, যথা নিয়মে করে থাকেন, কখনো এ নিয়মের কোন প্রকার পরিবর্তন হয় না।

এটি নিঃসন্দেহে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়, আল্লাহ্ পাক যে শুধু রাতকে দিনে দিনকে রাতে পরিবর্তন করেন তাই নয়; বরং কখনো দিন রাতকে ছোট বড় এবং উষ্ণ ও শীতল করে থাকেন। মানুষের অন্তর-দৃষ্টিকে সজাগ করার জন্যে আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতের এ সব মহিমা যথেষ্ট। মানুষ যদি এসব বিষয়ে এতটুকু চিন্তা করে তবে অবশ্যই আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে মাথা নত করতে বাধ্য হবে। এজন্যে পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ فِى ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِى الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾

নিশ্চয়ই এতে রয়েছে অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্যে বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়, এসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বুদ্ধিমান মাত্রেরই মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমুল হবে যে আল্লাহ্ পাকই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর ইচ্ছা ও মর্জি সর্বত্র কার্যকর, তিনি মহাজ্ঞানী, তাঁর জ্ঞান সব কিছুর বেষ্টনকারী।

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِى عَلٰى بَطْنِهٖ

আর আল্লাহ্ পাকই সৃষ্টি করেছেন প্রাণী মাত্রকে পানি থেকে, তাদের কেউ পেটের উপর ভর করে চলে আর কেউ দু'পায়ের উপর আর কেউ চার পায়ের উপর।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহের ন্যায় এ আয়াতেও আল্লাহ্ পাক তাঁর অনন্ত অসীম ক্ষমতার এবং তাঁর একত্ববাদের সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, এ পর্যায়ে এটি তৃতীয় দলিল। পৃথিবীতে যত জীবজন্তু আছে সবই আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টি, তিনি পানি দ্বারা প্রানী মাত্রকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর সৃষ্টি-নৈপূন্যের অপূর্ব নিদর্শন হলো

প্রতিটি প্রাণী। তাঁর এ সৃষ্টি রকমারি, বৈচিত্র্যময়, তাঁর কিছু কিছু সৃষ্টি রয়েছে যা তার নিজের পেটের উপর ভর করে চলে, আর কোন সৃষ্টি রয়েছে যা দু'পা বিশিষ্ট যেমন মানুষ এবং পাখি, তারা দুপায়ের উপর ভর করেই চলে, আর কিছু কিছু জীব-জন্তু রয়েছে যারা চার পা বিশিষ্ট যারা চার পায়ে চলে যেমন গরু, অশ্ব এমনি আরো অনেক চতুষ্পদ জন্তু, এসব কিছুর মধ্যে আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ হয় আর একথাও প্রমাণিত হয় যে,

يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ

তিনি যা ইচ্ছা তা সৃষ্টি করতে পারেন, তাঁর জন্যে কোন কিছুই কঠিন নয়, কেননা তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর কর্তৃত্ব সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٥﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক সর্বোপরি সর্বশক্তিমান, তাই তিনি যা ইচ্ছা করেন করতে পারেন এ কারণেই তাঁর কুদরতের সম্মুখে সব কিছুই সমান। কোন কোন প্রাণীকে তিনি তার পেটের উপর ভর করে চলার, আর এক প্রকার প্রাণীকে দু'পায়ের উপর এবং অন্যদেরকে চার পায়ের মাধ্যমে চলার সুযোগ দিয়েছেন, তা এজন্যে যেন মানুষ আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমত দেখে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং সরল সঠিক পথ লাভ করে। মূলতঃ এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ পাক পৃথিবীতে তাঁর কুদরতের অনেক জীবন্ত এবং জ্বলন্ত নিদর্শন রেখেছেন,

لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ

"নিশ্চয়ই আমি সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ (পবিত্র কোরআনে) নাজিল করেছি।" অথবা এর অর্থ হলো সমগ্র বিশ্বজগতে এমন কিছু নিদর্শন রয়েছে, যা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। তিনি যে মহান স্রষ্টা, তিনি যে মহাজ্ঞানী, তিনি যে বিজ্ঞানময়, তিনি যে সর্বশক্তিমান, সর্বগুণাকর, সমগ্র সৃষ্টিজগত তাঁরই কর্তৃত্বাধীন- এ কথার জীবন্ত সাক্ষী হলো তাঁর প্রতিটি সৃষ্টি। এসব বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহ দেখে মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য হয় এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস ও ভরষা রাখা, তাঁর প্রতি অনুগত হওয়া, তাঁর বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করা, এক কথায় হেদায়েত লাভ করা।

কিন্তু হেদায়েতের তৌফিক একমাত্র আল্লাহ পাকের হাতেই রয়েছে, তিনি তৌফিক না দিলে কেউ হেদায়েত লাভ করতে পারে না, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

আর আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথের হেদায়েত করেন, অর্থাৎ ইসলামের পথে চলার তৌফিক দান করেন, আর এ পথই হলো দোযখের শাস্তি থেকে নাযাত পাওয়ার এবং জান্নাত লাভের ও আল্লাহ পাকের নৈকট্য ধন্য হওয়ার।

বস্তুতঃ ঈমান হলো আল্লাহ পাকের মহান দান, ঈমান লাভের জন্যে আল্লাহ পাকের তৌফিক পূর্বশর্ত। এজন্যে সূরায়ে ফাতেহায় হেদায়েত লাভের তৌফিকের জন্যে দোয়া করার শিক্ষা দেয়া হয়েছেঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাও" আর যাদেরকে আল্লাহ পাক এ তৌফিক দান করেছেন তাদের একান্ত কর্তব্য হলো এজন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে শোকর গুজার হওয়া, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা।

وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا
ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ

আর লোকেরা বলে আমরা আল্লাহ এবং রসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আনুগত্যও স্বীকার করে নিয়েছি।

শানে নজুল

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এক খন্ড জমীনকে কেন্দ্র করে জনৈক ইহুদী ও মোনাফেকের মধ্যে ঝগড়া ছিল। ইহুদীর ইচ্ছা ছিল হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এ কলহের মীমাংসা করা, কেননা তার নিশ্চিত

বিশ্বাস ছিল যে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুলুম করবেন না, কারো হক্ব বিনষ্ট করবেন না, তিনি ছিলেন ন্যায় বিচারের প্রতীক। কিন্তু মোনাফেক বলল, কাব এবনে আশরাফ নামক ইহুদীর দ্বারা এর মীমাংসা করাও। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।১

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, হক্ব অত্যন্ত সুস্পষ্ট, কিন্তু হক্ব গ্রহণের তৌফিক একমাত্র আল্লাহ পাকের হাতেই রয়েছে। আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত দান করেন। এর দ্বারা একথা বোঝা যায় যে কিছু লোক হেদায়েত পাবে আর কিছু লোক পাবেনা। যারা হেদায়েত পাবেনা তাদের মধ্যে এমনও লোক রয়েছে, যারা মুখে ঈমানের দাবী করবে, কিন্তু তাদের অন্তর ঈমান ও আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হবে। এরাই হলো মোনাফেকের দল। ইসলামের সত্যতা তাদের নিকট সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও তারা আন্তরিকভাবে তা গ্রহণ করেনা। আলোচ্য আয়াতে মোনাফেকদের দ্বিমুখী নীতির এবং তাদের কলংকময় জীবনের কথাই বর্ণিত হয়েছে। তারা ইসলামের সত্যতার কথা প্রকাশ করত, প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের দাবীও করত, কিন্তু অন্তরে তাদের বিশ্বাস থাকতনা, শুধু প্রতারণার লক্ষ্যেই তারা একথা প্রকাশ করত। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَيَقُولُونَ

অর্থাৎ মোনাফেকরা মুখে অত্যন্ত ফলাও করে বলে যে তারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আনুগত্য প্রকাশ করেছে, অথচ এরপর তাদের একদল এর থেকে মূখ ফিরিয়ে নেয়, আর এজন্যেই পরবর্তী বাক্যে তাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত ঘোষণা করা হয়েছে, وَمَآ أُولَٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ

প্রকৃত পক্ষে, তারা মোমেন নয়।২

হযরত ওমর (রাঃ)—এর ফারুক উপাধী লাভ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -৩৯২

তফসীরে কবীর, খন্ড- ২৪, পৃষ্ঠা-২০

২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৪০

এ ঘটনা সম্পর্কে আল্লামা আলুসী (রঃ) আরো লিখেছেনঃ অবশেষে ঐ মোনাফেক এবং ইহুদী উপরোক্ত বিষয় নিয়ে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামমের দরবারে হাজির হয়। তিনি ইহুদীর পক্ষে রায় দেন। কিন্তু মোনাফেক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ রায় মেনে নিতে রাজী হলনা, সে বলল, আমরা পুনঃ বিচার করাবো হযরত ওমর (রাঃ)- এর দ্বারা, এরপর তারা উভয়ে হযরত ওমর (রাঃ)- এর কাছে হাজির হলো এবং ইহুদী ব্যক্তিটি বলল, আমাদের এ মোকদ্দমায় হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার পক্ষে রায় দিয়েছেন, কিন্তু এই ব্যক্তি সে রায় মানেনি, তাই সে আপনার নিকট পুনঃবিচারের জন্যে হাজির হয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) মোনাফেক লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ বিবরণ কি সত্য? মোনাফেক লোকটি বলল, হ্যাঁ। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ আমি বাড়ীর ভেতর থেকে আসছি, তোমরা আমি না আসা পর্যন্ত এখানেই থাক। হযরত ওমর (রাঃ) কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর তবরারীটি নিয়ে বের হয়ে আসলেন এবং ঐ মোনাফেককে দ্বিখন্ডিত করলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ফয়সালা মানেনা, তার সম্পর্কে আমি এ সিদ্ধান্তই করি। তখন এ আয়াত নজিল হয় এবং হযরত জীব্রাঈল (আঃ) একথাও বলেন যে ওমর (রাঃ) হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছেন। আর তখন থেকেই হযরত ওমর (রাঃ) "আল ফারুক" উপাধিতে ভূষিত হলেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।১

৪৮ وَإِذَا دُعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ

আর তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়ার জন্যে যখন তাদেরকে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের দিকে আহবান করা হয়, তখনই তাদের একদল লোক মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর যদি তাদের কিছু প্রাপ্য থাকে তবে তারা অত্যন্ত বিনীত হয়ে রসূলের নিকট হাজির হয়।

মোনাফেকরাই জালেম

এবনে আবি হাতেম এ আয়াত সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী (রাঃ)- এর একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মোনাফেকদেরকে কোন বিষয়ে মীমাংসা করার জন্যে যখন কেউ বলত, চল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে যাই, তিনি আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন। তখন যদি তারা সত্যের উপর থাকত

১। তফসীরে রুহুল মা'আনী, খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-১৯৪

এবং নিশ্চিত বিশ্বাস থাকত যে আমরা সত্যের উপর রয়েছি, তখন তারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হত।

পক্ষান্তরে, যখন তারা অন্যায় পথে থাকত এবং এ সত্য উপলব্ধি করত যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অন্যায়ের পক্ষে রায় দেবেন না, তখন তারা তাঁর নিকট আসতে রাজী হতোনা। কেননা, তারা এসত্য উপলব্ধি করত যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কখনো অন্যায়ের পক্ষে রায় দেবেন না, এমন অবস্থায় তাদের স্বার্থ সিদ্ধি হবেনা। এ সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

وَإِذَا دُعُوٓا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ....

অর্থাৎ যখন তাদেরকে ডাকা হয় আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের দিকে যেন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেন, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়।

কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে। যখন তাদেরকে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের হুকুমের দিকে ডাকা হয়, তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। তবে যখন তারা লক্ষ্য করে যে শরীয়তের ফয়সালা তাদের পক্ষে হবে তখন তারা খুব আনন্দিত অবস্থায় হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়।

পক্ষান্তরে, যখন তারা লক্ষ্য করে যে শরীয়তের ফয়সালা তাদের পক্ষে হবে না কেননা তারা নিজেরাই অন্যায় পথে রয়েছে, তখন তারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের দরবার থেকে বিমুখ হয়। এরপর এ মোনাফেকদের তিনটি অবস্থার বিবরণ রয়েছে।

أَفِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ

তবে কি তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে?

أَمِ ٱرْتَابُوٓا

অথবা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের সত্যতার ব্যাপারে তাদের অন্তরে সন্দেহ রয়েছে?

أَمْ يَخَافُونَ

অথবা তারা কি এ আশংকা করে যে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল তাদের প্রতি জুলুম করবেন?

অর্থাৎ তাদের অন্তরে যে ব্যাধি রয়েছে, সেই ব্যাধির কারণেই তারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের কথা মানতে পারেনা। তাদের অন্তরের এ ব্যাধিই হয়েছে তাদের ধ্বংসের মূল কারণ।

অথবা তারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের সত্যতা সম্পর্কে সন্দিহান। তাদের এ সন্দেহ তাদের লোভ লালসা, তাদের স্বার্থান্ধতা তাদেরকে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের দরবারে হাজির হতে বাধা দেয়। অথবা তারা কি এ আশংকা করে যে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল তাদের প্রতি জুলুম করবেন? এ জন্যে তাঁর দরবারে হাজির হতে তারা ভয় পায়। প্রকৃত অবস্থা এই যে আল্লাহর রসূলের দরবারে কখনও অন্যায় হয় না, কখনও অবিচার হয়না, তিনি কারো প্রতি জুলুম করেন না, এসব বিষয় তাঁর ব্যাপারে সম্পূর্ণ কল্পনাতীত।

بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّٰلِمُونَ

বরং এ হতভাগারাই জালেম, তারা নিজেদের প্রতি নিজেরাই জুলুম করে, এজন্যেই তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে বিচার নিয়ে যেতে সাহস করেনা, কেননা তাদের অন্যায় স্বার্থ সেখানে সিদ্ধি হবেনা।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ "তারাই জালেম।" এর তাৎপর্য হলো তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করে কেননা, তারা অন্তর দিয়ে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস করেনা এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের বিধি-নিষেধও মানেনা, তাদের সব কিছু মৌখিক, লৌকিক, কিছুই আন্তরিক নয়, এজন্যে তারা জালেম।

দ্বিতীয়তঃ তারা এ অর্থেও জালেম যে তারা অন্যের অর্থ-সম্পদ কুক্ষিগত করতে অত্যন্ত তৎপর। এভাবে তারা অন্যের প্রতিও জুলুম করে অতএব, তারাই জালেম।১

আর এ জুলুমের ভয়াবহ পরিণতি তাদেরকেই ভোগ করতে হবে। এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে তাদের স্বার্থপরতা, হীনমন্যতার কারণে তারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি খাঁটি বিশ্বাস করেনি, আর এ অবিশ্বাসের কারণে তাদেরকে চিরদিন দোজখের শাস্তি ভোগ করতে হবে। অতএব, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -৩৯৩

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ
بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَن
يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا
تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾

তরজমা

(৫১) মোমেনদের মধ্যে মীমাংসার জন্যে যখন তাদেরকে আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলের দিকে আহবান করা হয়, তখন তারা শুধু বলে, আমরা শ্রবণ করেছি এবং মেনে নিয়েছি, আর তারাইতো সফলকাম।

(৫২) আর যারা আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলের অনুগত হয় এবং আল্লাহ পাককে ভয় করে চলে এবং তাঁর নাফরমানী থেকে সাবধান থাকে, তারাই হয় সাফল্যমন্ডিত।

(৫৩) আর তারা (মোনাফেকরা) আল্লাহ পাকের নামে নিজেদের শপথকে অত্যন্ত জোরালো করে বলে; যদি আপনি তাদেরকে আদেশ দেন তবে তারা সব কিছু পরিত্যাগ করে জেহাদের জন্যে বের হয়ে পড়বে। (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা শপথ করোনা, যথা নিয়মে হুকুম মেনে চলাই যথেষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে মোনাফেকদের এ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে তাদের কথা ও কাজে কোন সামঞ্জস্য নেই, তারা মুখে যা বলে, কর্মের মাধ্যমে তার সত্যতা প্রমাণ করেনা।

আর এ আয়াতে প্রকৃত মোমেনদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, মোমেনদের অবস্থা মোনাফেকদের অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

মোমেনদেরকে যখন আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের দিকে আহবান করা হয়, তখন তারা বলে আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের হুকুম পালনে তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণে মোমেনগণ এতটুকু বিলম্বও করেনা, ইতঃস্তুতও করেনা এমনকি, নিজের লাভ লোকসানের কথাও চিন্তা করেনা। কেননা, তারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের হুকুম পালন করার মধ্যেই চির সাফল্য নিহিত রয়েছে। এজন্যে মোমেনদেরকে যখন ডাকা হয়, তখন তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে ছুটে আসে এবং মুহূর্ত মাত্রও বিলম্ব করেনা এবং তাদেরকে যে হুকুম দেয়া হয়, তা পালনে সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়, যদি তাদের নিজেদের স্বার্থহানিও হয়, তবে সেদিকে তারা ভ্রুক্ষেপও করেনা, এভাবে আল্লাহ এবং রসূলের প্রতি যারা আনুগত্য প্রকাশ করে, পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে তাদের সাফল্য হবে সুনিশ্চিত। একথার ঘোষণা রয়েছে পরবর্তী বাক্যে।

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

আর তারাই হবে অবশেষে সফলকাম।

অর্থাৎ যাদের কথা ও কাজে রয়েছে সামঞ্জস্য, যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি হয় অনুগত, শরীয়তের বিধান পালনে হয় তৎপর, তারাই পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে লাভ করবে সাফল্যের মনি–মানিক্য।

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

"আর যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ঐ আনুগত্য প্রকাশের কারণে যদি তাদের কোন ক্ষতিও হয়, তবুও তারা অনুগত থাকে।

وَيَخْشَ اللَّهَ

আর তারা আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাকে, অর্থাৎ গত জীবনে যদি কোন গুণাহ হয়ে থাকে, তার শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে ভয় করতে থাকে।

وَيَتَّقْهِ

এবং আল্লাহ্ পাকের ভয়ে সাবধান হয়ে জীবন-যাপন করে, পাপাচার থেকে আত্মরক্ষা করতে থাকে, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.

জীবন-সাধনায় তারাই হবে সফলকাম, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভে তারাই হবে ধন্য।

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জীবন-সাধনাকে সার্থক করার জন্যে কয়েকটি গুণ অর্জন করা পূর্বশর্ত।

(এক) আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান।

(দুই) আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ তথা শরীয়তের যাবতীয় বিধান মেনে চলা এবং পূর্বে কৃত ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যে তওবা এস্তেগফার করা।

(তিন) সর্বদা আল্লাহ পাককে ভয় করা, তাকওয়া ও পরহেজগারী অবলম্বন করা এবং সর্বপ্রকার পাপাচার থেকে আত্মরক্ষা করা।

যারা এসব গুণাবলী অর্জন করবে, পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনে তাদের সাফল্য হবে সুনিশ্চিত, তারা লাভ করবে সমূহ কল্যাণ।

মোমেনের কর্তব্য

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তিনি ছিলেন আনসারী সাহাবায়ে কেরামের অন্যতম নেতা। ইন্তেকালের সময় তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র জানাদা (রাঃ)-কে বললেন, তুমি আমার নিকট থেকে শুন, তোমাদের দায়িত্ব কি? তোমাদের দায়িত্ব হল, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা শ্রবণ করা ও মেনে নেয়া, সেই আদেশ কঠিন হোক বা সহজ হোক, তোমাদের সুখের সময় হোক কি দুঃখের সময়, আর এমন সময়ও যখন তোমার হক অন্যকে দিয়ে দেয়া হয়। (অর্থাৎ সকল অবস্থায় আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা) তোমার রসনাকে সুবিচার ও সত্যবাদীতার গুণে গুণান্বিত কর। যে ব্যক্তি যে কাজের উপযুক্ত তার নিকট থেকে সে কাজ ছিনিয়ে নিওনা, তবে সে যদি প্রকাশ্যে নাফরমানীর আদেশ দেয় তবে তা মেনে নিওনা। পবিত্র কোরআনের বিধানের বিরুদ্ধে যদি কেউ কোন কথা বলে তবে কখনও তা মানবে না। সর্বদা আল্লাহর কিতাব মেনে চলবে।

কল্যাণের পথ

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা ব্যতীত ইসলামের দাবীর সত্যতা প্রমাণিত হয় না। আর যা কিছু কল্যাণ রয়েছে তা হল মুসলমানদের ঐক্যের মধ্যে, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের মধ্যে এবং খলিফাতুল মুসলেমীন ও সাধারণ মুসলমানের কল্যাণ সাধনের মধ্যে।

খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, ইসলামের মহান শিক্ষা হল, আল্লাহ পাকের একত্ববাদের সাক্ষ্য প্রদান করা, নামাজ সঠিকভাবে আদায় করা, যাকাত আদায় করা এবং মুসলমানদের যিনি রাষ্ট্রনায়ক হবেন বা আমিরুল মুমেনীন হবেন, তার কথা মেনে চলা। যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের অনুগত হয়, বিধি-নিষেধ মেনে চলে, হুকুম পালন করে, নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকে, যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকে তবে তার ব্যাপারে ভীত থাকে, ভবিষ্যতে পাপাচার থেকে আত্মরক্ষা করে, কল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ করে এবং মন্দ কাজ থেকে আত্মরক্ষা করে, দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে তারাই সফলকাম হবে।১

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ

আর তারা আল্লাহ পাকের নামে নিজেদের শপথকে অত্যন্ত জোরালো করে বলে।

পূর্ববর্তী দু'খানি আয়াতে মোমেনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াত থেকে পুনরায় মোনাফেকদের অবস্থার বিবরণ রয়েছে। মোনাফেকরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করতো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাদের কথা বিশ্বাস করাবার জন্য আল্লাহ পাকের নামে শপথ করে জোরালো ভাষায় দাবী করতো যে তারা প্রকৃত মুসলমান। শপথ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতো, আমরা আপনার গোলাম, আপনার যাবতীয় হুকুম পালন করতে আমরা প্রস্তুত। আপনি যদি জেহাদের জন্য আদেশ করেন তবে আমরা বাড়ী ঘর ধন-দৌলত সব ফেলে বের হয়ে পড়বো। মোনাফেকদের এ দাবীর প্রতি উত্তরেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا

হে রসূল! আপনি বলুন, তোমাদের মিথ্যা শপথ করার কোন প্রয়োজন নেই, তোমাদের আনুগত্যের অবস্থা আমার জানা আছে অতএব, শপথ করোনা, যথা নিয়মে আনুগত্য প্রকাশ কর।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ অর্থ হল, তোমাদের আনুগত্যের দাবী হল মৌখিক, আন্তরিক নয় বাস্তবিক নয়। তফসীরকার

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৮, পৃষ্ঠা-৭৪

মুকাতেল (রঃ) এর অর্থ লিখেছেন, তোমরা সঠিকভাবে আনুগত্য প্রকাশ কর। আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, আনুগত্যের শপথ নিস্প্রয়োজন, সঠিক আনুগত্যই কাম্য।

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই।

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ
مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى
الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ
عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ
مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَنْ
كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾ لَا تَحْسَبَنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ وَلَبِئْسَ
الْمَصِيرُ ﴿٥٧﴾

তরজমা

(৫৪) (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর এবং তাঁর রসূলের প্রতিও অনুগত হও, তবু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে চল, তবে রসূলের প্রতি অর্পিত দায়িত্বের জন্যে তিনি দায়ী এবং তোমাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্বের জন্যে তোমরা দায়ী। আর যদি তোমরা তাঁর অনুগত হও তবে সৎপথ পাবে, আর সুস্পষ্ট ভাবে (আল্লাহ পাকের) বাণী পৌঁছিয়ে দেয়াই রসূলের কাজ।

(৫৫) তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, আল্লাহ পাক তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে আধিপত্য দান করবেন, যেমন তাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে আধিপত্য দান করেছিলেন, তাদের জন্যে তিনি যে দ্বীন ধর্ম পছন্দ করেছেন তিনি অবশ্যই তাদের জন্যে তা সুদৃঢ় করবেন। আর তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে দান করবেন নিরাপত্তা, তারা আমারই বন্দেগী করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবেনা। এরপরও যারা কুফরী ও নাফরমানী করবে, তারাইতো নাফরমান।

(৫৬) আর তোমরা নামায কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং রসূলের কথা মেনে চল, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে।

(৫৭) (হে রসূল!) আপনি পৃথিবীতে কাফেরদেরকে প্রবল শক্তিশালী মনে করবেন না, (অবশেষে) তাদের আশ্রয়স্থল হবে দোযখ, আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে প্রথমে মোমেনদের বৈশিষ্ট্য এবং শুভ-পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে, এরপর মোনাফেকদের মোনাফেকীর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে নাজাতের পথ-নির্দেশ করা হয়েছে এবং সাধারণভাবে সকলকে সরল সঠিক পথ অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

হে রসূল! আপনি ঘোষণা করুন, তোমরা আল্লাহ পাকের অনুগত হও, আল্লাহর রসূলের কথা মেনে চল, মূলতঃ এটিই নাজাতের পথ। আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের মাধ্যমে মানুষ তার জীবন-সাধনাকে সার্থক করতে পারে, জীবনের উদ্দেশ্যকে সফল করতে পারে, লাভ করতে পারে

শান্তি, মুক্তি কল্যাণ। যদি মানুষ আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ না হয়, তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং ভরষা রাখে, তাঁকে ভয় করে চলে এবং জীবনের সকল স্তরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করে তবে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে সে লাভ করে চির সাফল্য।

فَإِنْ تَوَلَّوْا

কিন্তু তোমরা যদি আল্লাহর রসূলের অনুসারী না হও, তাঁর কথা মতে না চল তবে তাতে তাঁর কোন ক্ষতি নেই, ক্ষতিগ্রস্ত হবে তোমরা। আল্লাহর রসূলের দায়িত্ব ছিল আল্লাহ পাকের মহান বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছে দেয়া, তিনি এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন, আর তোমাদের কর্তব্য ছিল তার প্রতি আমল করা কিন্তু তোমরা তা করোনি অতএব, তার ভয়াবহ পরিণতি তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে।

এতে রসূলের কোন ক্ষতি হবে না। তোমাদেরই হবে সর্বনাশ, কেননা, তোমাদের পাপের বোঝা শুধু তোমাদেরকেই বহন করতে হবে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, হেদায়েত শুধু হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুকরণেই রয়েছে কেননা, তিনি সরল সঠিক পথের আহবায়ক, আর এ সরল সঠিক পথই মানুষকে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভে ধন্য করে। আল্লাহ পাকের কতৃত্ব, আধিপত্য সর্বত্র বিরাজমান। আর আল্লাহর রসূলের দায়িত্ব হল আল্লাহ পাকের পয়গাম মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া আর এ দায়িত্ব তিনি যথাযথ ভাবে পালন করেছেন যদি তোমরা তাঁর অনুসরণ কর তবে হেদায়েত লাভ করবে, সত্য পথের সন্ধান পাবে এবং জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِينُ

আর আল্লাহ পাকের মহান বাণী যথাযথ ভাবে পৌঁছে দেয়াই পয়গম্বরের কাজ। অতএব, তোমরা তাঁরই অনুসরণ কর, তাহলে তোমাদের ভবিষ্যত হবে উজ্জ্বল। তোমাদের জীবন-সাধনা হবে সার্থক, সুন্দর এবং সফলকাম। এ পর্যায়ে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) ওহাব এবনে মোনাব্বার সূত্রে একটি ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

উম্মতে মোহাম্মদীয়ার বৈশিষ্ট্য

বণী ইসরাঈলের শায়আ (আঃ)-এর নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এই মর্মে ওহী আসল যে তুমি বণী ইসরাঈলের মজলিসে দন্ডায়মান হও, আমি যা ইচ্ছা সে কথা তোমার রসনা থেকে বের করব। তাই হযরত শায়আ (আঃ) দন্ডায়মান

হলেন, তাঁর জবানী থেকে আল্লাহ পাক যে ভাষণ বের করলেন তা হল এই, "হে আসমান! শ্রবণ কর, আর হে জমীন! নিরব হও, আল্লাহ পাক একটি শান পূর্ণ করতে চান, আর একটি বিষয়ে তদবির করতে ইচ্ছা করেছেন, তিনি ইচ্ছা করলে অরণ্যকে আবাদ করে দেন এবং যা বিরাণ তাকে জনবসতিপূর্ণ করে দেন। আর তিনি ইচ্ছা করলে মরুভূমিকে শস্য-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ করে দেন, তিনি ইচ্ছা করলে সম্পদশালী করে দেন এবং রাখালকে বাদশাহ বানিয়ে দেন, যারা কখনো লেখাপড়া শেখেনি, তাদের মধ্য থেকে একজন উম্মীকে নবী বানিয়ে প্রেরণ করবেন, যিনি কখনও মন্দ কথা বলেন না, যিনি চরিত্র-মাধুর্যের অধিকারী, যিনি বাজারে শোরগোল কারী নন, তিনি অত্যন্ত বিনয়ী, তাঁর চাদরের হাওয়ায় সেই প্রদীপটিও নেভেনা যার পার্শ্ব দিয়ে তিনি অতিক্রম করেন, তাঁর রসনা হবে পবিত্র, তাঁর কারণে অন্ধ ব্যক্তি চক্ষুস্মান হবে, বধির ব্যক্তি শ্রবণ করবে, মনের বন্ধ অন্তর তাঁর বরকতে উন্মুক্ত হবে, তাঁকে সাফল্য ও কল্যাণকর কাজ দ্বারা আমি সুসজ্জিত করব, চরিত্র মাধুর্যের দ্বারা তাঁকে আমি ধন্য করব, শান্তি হবে তাঁর পোষাক, নেকী হবে তাঁর বৈশিষ্ট্য, তাকওয়া পরহেজগারী হবে তাঁর অন্তর, হেকমত হবে তাঁর কথা, সত্যবাদিতা হবে তাঁর মেজায, ক্ষমা ও ঔদার্য্য এবং পরের কল্যাণ কামনা হবে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। হক্ক হবে তাঁর শরীয়ত, ন্যায় বিচার কায়েম করা হবে তাঁর জীবন-চরিত। ইসলাম হবে তাঁর মিল্লাত, আর আহমদ হবে তাঁর নাম। গোমরাহীর পরে আমি তাঁর মাধ্যমে হেদায়েতের প্রসার ঘটাব, মূর্খতার পর তাঁর মাধ্যমে আসবে জ্ঞানের যুগ। অবনতির পর তাঁর মাধ্যমে হবে উন্নতি। তাঁর কারণে অজানাকে মানুষ জানতে পারবে, যা কম তা বেড়ে যাবে, দারিদ্র্য ঘুচে যাবে এবং তার স্থলে আসবে সম্পদ, তার মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন লোকদের আমি একত্রিত করে দেব, শত্রুতার পর আসবে বন্ধুত্ব, পরস্পরের বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর হবে একত্রিত। মতভেদের পর প্রতিষ্ঠিত হবে ঐক্যমত, আল্লাহ পাকের অনেক বান্দা ধ্বংস থেকে রক্ষা পাবে, আর ঐ নবীর উম্মতকে আমি সকল উম্মতের মধ্যে উৎকৃষ্ট করব। যাদের আবির্ভাব হবে মানুষের কল্যাণার্থে, যারা মানুষকে কল্যাণকর কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে তার উম্মত হবে খাঁটি মোমেন, আল্লাহ পাকের যত রসূল যা কিছু তাঁর নিকট থেকে নিয়ে এসেছেন, তাঁর উম্মতীরা সকলকে মেনে নেবে, কাউকে অস্বীকার করবেনা।১

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ

১। তফসীরে ইবনে কাসীর, পারা-১৮, পৃষ্ঠা-৭৫-৭৬

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, আল্লাহ পাক তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে আধিপত্য দান করবেনই যেমন, তাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে আধিপত্য দান করেছিলেন, তাদের জন্যে তিনি যে দ্বীন পছন্দ করেছেন, তিনি অবশ্যই তাদের জন্যে তা সুদৃঢ় করবেন। আর তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে দান করবেন নিরাপত্তা, তারা আমারই বন্দেগী করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবেনা, কিন্তু এরপরও যারা কুফরী ও নাফরমানী করে তবে তারাইতো নাফরমান।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে সর্ব প্রথম মোনাফেকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, এরপর মোমেনদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, আর আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে পৃথিবীতে আধিপত্য দান করবেন, ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে থাকবে, বর্তমানে যে কাফের এবং মোনাফেকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কিংবা যুদ্ধ করে তাদের সকলকে আল্লাহ পাক মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দেবেন। ইসলাম প্রাধান্য বিস্তার করবে, কুফর এবং নাফরমানি ভূলুণ্ঠিত হবে তখন তোমাদেরকে আর অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে দিন-রাত অতিবাহিত করতে হবে না। তোমরা হবে সম্মানিত এবং তোমাদের দুশমনরা হবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত, আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে সম্মান দান করবেন আর তোমাদের হাত দিয়ে কাফেরদের লাঞ্ছিত করবেন।১

শানে নজুল

তেবরানী এবং হাকেম হযরত উবাই এবনে কাবের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনা শরীফ আগমন করেন তখন মদীনাবাসী (আনসার) সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের অবস্থানের ব্যবস্থা করেন, তখন সারা আরব তাঁদের দুশমন হয়ে পড়ে, অবস্থা এত গুরুতর হয়ে পড়ে যে সর্বক্ষণ দুশমনের আক্রমণের আশংকা থাকতো। এজন্যে সর্বক্ষণ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত থাকতে হতো, অস্ত্রবিহীন অবস্থায় এক মুহূর্তও অতিবাহিত করা সম্ভব হতো না। তখন সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে এ আকাঙ্খা হতো, যদি আমরা শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ জীবন লাভ করতাম কত ভালো হতো। আর আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ভয়

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ). খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৪২

না থাকতো, তবে নিশ্চিন্ত মনে আল্লাহ পাকের এবাদত করতে পারতাম, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।১

কোন কোন তফসীরকার এ আয়াত নাজিল হওয়ার পটভূমি সম্পর্কে লিখেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তাঁর পর আর কোন নবী আসবেন না, কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর নবুওয়ত স্থায়ী থাকবে, এতে কখনো কোন পরিবর্তন হবে না। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তো কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে স্বশরীরে থাকবেন না, বরং এক সময় আসবে যখন তাঁকে পৃথিবী থেকে আল্লাহ পাকের হুকুমে বিদায় নিতে হবে তখন অর্থাৎ তাঁর অবর্তমানে কি অবস্থা হবে, কে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন, এসব বিষয় নিয়ে মুসলমানগণ চরম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন।

তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে সু-সংবাদ দিয়েছেন যে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই কেননা, তোমাদের মধ্যে যারা প্রকৃত মোমেন হবে, নেক আমল করবে, কথায় ও কাজে যাদের সামঞ্জস্য থাকবে, বিশ্বাস এবং আদর্শে, আচার-আচরণে, চিন্তা-চেতনায় যাদের মধ্যে অধিকতর গুণাবলী থাকবে আল্লাহ পাক তাদেরকেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পর তাঁর খেলাফত দান করবেন। তারা এ পৃথিবীতে ক্ষমতা লাভ করবে; নির্ভয়ে, নির্বিঘ্নে, নিরাপদে তারা এ দায়িত্ব পালন করবে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে এ প্রতিশ্রুতি দান করেছেন।১

মুসলমানদেরকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার সুসংবাদ

কোন কোন তফসীরকার পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্কের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের অনুগত হবে এবং আল্লাহ পাককে ভয় করে জীবন যাপন করবে, তাঁর বিধি-নিষেধ যথাযথ ভাবে পালন করবে, তারাই অবশেষে সফলকাম হবে। এতে মোমেনদের পরকালীন জিন্দেগীর সাফল্যের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, আর আলোচ্য আয়াতে দুনিয়ার জিন্দেগীর সাফল্যের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে শুধু যে আখেরাতের সাফল্য দান করবেন তাই নয়, বরং দুনিয়ার ক্ষমতাও আল্লাহ পাক তাদেরকেই দান করবেন, তারাই পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করবে কেননা, তাদের দ্বারাই পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের হুকুম জারি হবে। অতএব, যারা

১। তফসীরে রুহুল মা'আনী, খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-২০২

২। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৪৬৩

ঈমান ও নেক আমলের গুণে গুণান্বিত হবে, যারা সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে এবং অসত্যকে রুখে দাঁড়াবে, নামাজ কায়েম করবে তথা আল্লাহ পাকের হক ও বান্দার হক সঠিক ভাবে আদায় করবে, আল্লাহ পাক তাদেরকেই দুনিয়ার ক্ষমতা দান করবেন যেমন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আল্লাহ পাক খোলাফায়ে রাশেদীনকে ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছিলেন এবং সুদীর্ঘ তিরিশটি বছর তাঁরা ইসলামী হুকুমত পরিচালনা করেছিলেন, মাত্র এক যুগের মধ্যেই শুধু আরব নয়, বরং পারশ্য এবং রোমান সাম্রাজ্য তখন মুসলমানদের করতলগত হয়, ইসলামের অভ্যুত্থান হয় এবং তদানীন্তন পৃথিবীর এক চতুর্থাংশের উপর ইসলামের চন্দ্র তারকা খচিত পতাকা উড্ডীন থাকে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক যে প্রতিশ্রুতি মুসলমানদেরকে দিয়েছেন তা বাস্তবায়িত হয়।১

বস্তুতঃ আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের সে সব গুণের উল্লেখ রয়েছে, যেমন আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান, সৎকাজ, আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ- এসব গুণ অর্জন সাপেক্ষে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভের বরকতে মুসলমানগণ এসব গুণ পরিপূর্ণভাবে অর্জন করেছিলেন, ফলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে সারা আরবে ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়েছিলো এবং তারপরে খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে এই প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিলো। তাঁদের পর হযরত ওমর এবনে আবদুল আজীজের যুগেও একই নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। বিশ্ববাসী দেখেছিলো এক নয়নাভিরাম দৃশ্য, ইসলামের ফলশ্রুতিতে সেদিন মানবতার কল্যাণের পরিপূর্ণ রূপায়ন হয়েছিলো, মানবতার উৎকর্ষ সাধনের পূর্ণ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হয়েছিল, যার দৃষ্টান্ত আজকের পৃথিবীতে খুঁজেও পাওয়া যাবে না।

كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

যেমন ইতিপূর্বে নেককার লোকদেরকে পৃথিবীর ক্ষমতা দান করা হয়েছিলো, বণী ইসরাঈলে হযরত দাউদ (আঃ) এবং হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে নবুওয়তের পাশাপাশি দুনিয়ার বাদশাহাত দান করা হয়েছিলো। তফসীরকারগণ লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে নেককার মোমেনদেরকে আল্লাহ পাক দুনিয়ার ক্ষমতা প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি দান করেছেন তার দ্বার আজও উন্মুক্ত এবং কেয়ামত পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই সুসংবাদ দিয়ে এরশাদ করেছেন, কেয়ামতের প্রাক্কালে ইমাম মাহদীর আগমন হবে, ন্যায়-বিচার দ্বারা তিনি বিশ্বকে পরিপূর্ণ করে দেবেন, ইসলামের মহান আর্দশকে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত

১। তফসীরে হাক্কানী, পারা-১৮, পৃষ্ঠা -৪৪

করবেন। আর তখন বিশ্ববাসী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের বাস্তব রূপায়ন পুনরায় দেখতে পাবে।

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ

আর আল্লাহ পাক তাদের জন্য যে দ্বীনকে পছন্দ করেছেন তাকে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন, অর্থাৎ আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে এ তৌফিক দান করবেন যেন তারা দ্বীন ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

হযরত আবদুল্লাহ এবন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক পৃথিবীতে মুসলমানদেরকে ব্যাপক ক্ষমতা দান করবেন, পৃথিবীর বহু দেশ মুসলমানদের করতলগত করে দেবেন এবং অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মকে প্রাধান্য দান করবেন।১ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

আর তাদের ভয়ের পরিবর্তে আল্লাহ পাক তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন অর্থাৎ যখন মুসলমানগণ ইসলামের প্রাথমিক যুগে মদীনা মনোওয়ারায় কাফেরদের হামলার আশংকা করতেন, সেই অবস্থার অবশ্যই পরিবর্তন হবে, আল্লাহ পাকের রহমতে মুসলমানদের হাতে আসবে ক্ষমতা, ফলে ভয়-ভীতি দূরীভূত হবে। আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে জীবন-বিধান দান করবেন, তবে এর জন্যে পূর্ব শর্ত হলো-

يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ তারা শুধু আমার বন্দেগী করবে এবং আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন যে এ আয়াত দ্বারা খোলাফায়ে রাশেদার ক্ষমতা লাভের এবং তাঁদের বরহক হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, কেননা তাঁদের ক্ষমতা লাভের মাধ্যমেই আলোচ্য আয়াতের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত হয়েছে।২

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আবুল আলীয়া বর্ণনা করেছেন, ইসলামের আর্বিভাবের পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি মক্কার কাফেররা অকথ্য নির্যাতন করে, তখন পবিত্র কোরআনে কাফেরদের জুলুম অত্যাচারের ব্যাপারে সবর অবলম্বন করার হুকুম করা হয়। এরপর মক্কা শরীফ থেকে হিজরতের হুকুম দেয়া হয় মদীনা মনোওয়ারায় আগমনের পর সাহাবায়ে কেরামকে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের অনুমতি দেয়া হয়, তখন অবস্থা এই ছিলো যে, মুসলমানগণ সর্বক্ষণ অস্ত্র সঙ্গে রাখতেন, তখন এক ব্যক্তি বলছিলেন, আমাদের জীবনে কি এমন সময় আসবেনা যখন আমরা নিরাপদে জীবন যাপন করতে পারবো,

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -৩৯৭

২। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা -৭২৪

তখনই আল্লাহ পাক এ আয়াত নাজিল করেন এবং এর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে পৃথিবীর ক্ষমতা লাভের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

এবনে আবি হাতেম হযরত বারা (রাঃ)এর বর্ণনার উল্লেখ করেছেন, এ আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে, আমরা অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ছিলাম, এরপর আল্লাহ পাক তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন, ভয়ের পরিবর্তে নিরাপত্তা দান করেন এবং পৃথিবীতে মুসলমানদের বিজয় দান করেন। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের ক্ষমতা লাভের যে ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছে তা অল্প কিছু দিনের মধ্যেই বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে। তাই এটি হলো নবুওয়তের দলিল কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রদত্ত সুসংবাদ অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এটি হলো খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতের প্রতি ইঙ্গিত। তৃতীয়ত, ইসলামকে যে আল্লাহ পাক মানব জাতির জন্যে জীবন-বিধান রূপে পছন্দ করেছেন, এ আয়াত তারই দলিল। এতদ্ব্যতীত, খোলাফায়ে রাশেদীন সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতবাদের সত্যতাও এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়।১

হযরত আদি এবনে হাতেম (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে তার জঠর জ্বালার কথা প্রকাশ করল, আরেক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! পথে আমার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠিত হয়েছে। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, হে আদ! তুমি হায়রা নামক স্থান দেখেছ? আমি আরজ করলাম, আমি নিজে দেখিনি তবে এর সম্পর্কে শুনেছি, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, যদি তোমার বয়স কিছুটা দীর্ঘ হয়, তবে তুমি দেখবে একজন স্ত্রীলোক (একাকী) হায়রা থেকে ভ্রমণ করবে এবং কাবা শরীফে তওয়াফ করবে, আর সে আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কোন কিছুকে ভয় করবেনা, তখন আমি মনে মনে বললাম, যে সে সময় বণী তাঈ গোত্রের লুণ্ঠনকারীরা কোথায় থাকবে? যারা দেশে আগুণ লাগিয়ে রেখেছে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, যদি তোমার বয়স আরো একটু সুদীর্ঘ হয় তবে তোমরা পারশ্য রাজার সাম্রাজ্য জয় করবে, আমি আরজ করলাম, কেসরা বিন হরমুজের কথা? তখন তিনি এরশাদ করলেন, হ্যাঁ কেসরা বিন হরমুজ। এরপর তিনি এরশাদ করলেন, যদি তোমার বয়স আরো একটু সুদীর্ঘ হয় তবে তুমি দেখে নিবে যে মানুষ এক মুঠো রৌপ্য বা স্বর্ণ গ্রহণকারীর অনুসন্ধান করবে, কিন্তু কোন গ্রহণকারী পাওয়া যাবেনা। আর যেদিন মানুষ তার প্রতিপালকের সামনে হাজির হবে আর বান্দা এবং তার প্রতিপালকের মধ্যে কোন ব্যাখ্যাকারী থাকবেনা যে বান্দাকে আল্লাহ পাকের বাণী বুঝিয়ে দেবে এবং আল্লাহ পাক সরাসরি

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -৩৯৮

বান্দার সংগে কথা বলবেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, আমি কি তোমার নিকট আমার রসূল প্রেরণ করিনি? বান্দা বলবে, অবশ্যই। আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, আমি কি তোমাকে ধন-সম্পদ দান করিনি? আমি কি দয়া করিনি? বান্দা আরজ করবে, অবশ্যই। তখন মানুষ তার ডান দিকে দেখবে, কিন্তু দোযখ ব্যতীত কিছুই দেখা যাবেনা এবং বাঁদিকে দেখবে, সেখানেও দোযখ ব্যতীত কিছুই দেখা যাবেনা। (তখন তাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে)। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, দোযখ থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা কর, এমনকি একটি খেজুরের অংশ বিশেষ দান করেও। অর্থাৎ খেজুরের অংশ দারিদ্র্য- প্রপীড়িত মানুষকে দান করাও দোযখ থেকে বাঁচার কারণ হতে পারে। যদি খেজুরের অংশ বিশেষও দান করা সম্ভব না হয় তবে সাহায্যপ্রার্থীর সঙ্গে মিষ্টি কথা বলে নিজেকে দোযখ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা কর।

হরত আদী (রাঃ) (তাঁর শাগরিদকে) বললেন, আমি দেখেছি একজন স্ত্রীলোক হাইরা নামক স্থান থেকে রওয়ানা হয়ে কাবা শরীফের তওয়াফ করেছে, কিন্তু পথে কোন ডাকাত বা লুণ্ঠনকারীর ব্যাপারে কোন আশংকা করেনি, আল্লাহ পাক ব্যতীত তার আর কোন বিষয়ের ভয় হয়নি, আর পারশ্য রাজা কেসরা এবনে হরমুজের ধন-ভান্ডার বিজয় লাভে আমি অংশ গ্রহণ করি, যদি ভবিষ্যতে তোমার বয়স সুদীর্ঘ হয় তবে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এই বাণীর সত্যতাও দেখতে পাবে যে মানুষ দান করার জন্যে একমুঠো স্বর্ণ বা রৌপ্য দান করার উদ্দেশ্য নিয়ে ঘুরছে কিন্তু তা গ্রহণকারী পাওয়া যাবেনা।১

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ

অর্থাৎ এরপরও যদি কেউ নাফরমানী করে তবে তারাই হবে ফাসেক।

فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

এরাই ফাসেক অর্থাৎ ঈমানের গন্ডি থেকে তারা বের হয়ে যাবে।

আল্লামা বগভী লিখেছেন, তফসীরকারগণ বলেছেন, সর্বপ্রথম আল্লাহর নেয়ামতের না-শোকরী করেছে সেই সব লোক যারা হযরত ওসমান (রাঃ)-কে শহীদ করেছে। হযরত ওসমান (রাঃ)-কে যখন শহীদ করে, তখন আল্লাহ পাক সেই নেয়ামত তুলে নেন, যা আল্লাহ পাক তাদেরকে দান করেছিলেন। যাহোক, তাদের মধ্যে একটি ভয়-ভীতির সঞ্চার হয় এবং তারা ধর্মীয় দিক থেকে পরস্পর ভাই ভাই হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে একে অন্যকে হত্যা করতে শুরু করে।

আল্লামা বগভী (রঃ) হোমায়েদ এবনে হেলালের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -৩৯৯

আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) হযরত ওসমান এবনে আফফান (রাঃ) সম্পর্কে বলেছেন, যখন থেকে মদীনা শরীফে হযরত রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শুভাগমন হয়েছে তখন থেকে আজ পর্যন্ত নিরাপত্তা বিধানকারী তোমাদের এই শহরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, যদি তোমরা ওসমানকে হত্যা কর তবে ফেরেশতাগণ চলে যাবে, আর কখনও ফিরে আসবেনা, যে ব্যক্তি ওসমান (রাঃ)-কে শহীদ করবে, তবে আল্লাহর শপথ! সে আল্লাহ পাকের সম্মুখে কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত অবস্থায় হাজির হবে। আল্লাহ পাকের তরবারী খাপের ভেতর রয়েছে, যদি আল্লাহ পাক সেই তরবারীকে খাপের ভেতর থেকে বের করেন তবে কেয়ামত পর্যন্ত তা আর খাপে প্রবেশ করবেনা, কেননা যখনই কোন নবীকে শহীদ করা হয় তখন তার প্রতিবাদে সত্তর হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। আর যখন কোন খলিফাকে শহীদ করা হয় তখন তার প্রতিশোধে পয়ত্রিশ হাজার লোককে হত্যা করা হয়।১

وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَآتُوا الزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞

আর তোমরা নামাজ কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর, আল্লাহর রসূলের অনুগত হও, জীবনের সকল স্তরে তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ কর, তিনি যা আদেশ প্রদান করেন তা মেনে চলো, হয়ত তোমাদের প্রতি রহমত করা হবে কেননা, রহমতুললিল আলামীনের অনুসরণের মাধ্যমেই আল্লাহ পাকের রহমত লাভ হয়ে থাকে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও অনুকরণের নির্দেশের পাশাপাশি রহমত করার সে আশা দেয়া হয়েছে তা এ কথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণের সঙ্গে আল্লাহ পাকের রহমত লাভের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, এবং তার আগে আদেশ দেয়া হয়েছে নামাজ কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতে থাক কেননা, এটিই হলো আল্লাহ পাকের রহমত লাভের একমাত্র পন্থা।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

(হে রসূল!) আপনি পৃথিবীতে কাফেরদেরকে প্রবল শক্তিশালী মনে করবেন না অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলকে মানে না আল্লাহ পাকের অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হয় এবং তাঁর রসূলের আদর্শ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়, তাদেরকে প্রবল প্রতাপশালী মনে করবেন না যে তারা সত্যের মোকাবেলায় বিজয় লাভ করবে, অথবা এদিক সেদিক পলায়ন করে আল্লাহ পাকের আযাব থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে অবশ্যই নয়, দুরাত্মা কাফেরদের আদৌ রেহাই নেই, দোযখে তাদের ঠিকানা নির্দিষ্ট হয়ে আছে, আর তা অত্যন্ত মন্দ ঠিকানা। পূর্ববর্তী আয়াতের শেষে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -৪০০

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ বলে, মোমেনদের উদ্দেশ্যে রহমত রাভের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। আর এ আয়াতের শেষে وَمَأْوٰىهُمُ النَّارُ বলে কাফেরদের উদ্দেশ্যে দোযখের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

যে ঘোষণা ঘটনায় পরিণত হয়

আলোচ্য আয়াত সমূহে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং ঈমানের দাবি মোতাবেক সৎ কাজ করবে, আল্লাহ পাক শুধু যে আখেরাতে তাদেরকে চির শান্তি, চির মুক্তি দান করবেন তাই নয়; বরং দুনিয়ার ক্ষমতাও তাদেরকে দান করবেন। দ্বিতীয়ত, যে দ্বীনকে আল্লাহ পাক মুসলমানদের জন্যে পছন্দ করেছেন তাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন তথা ইসলামকে দুনিয়াতে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। তৃতীয়ত, ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুগে মুসলমানগণ যেভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় জীবন যাপন করেছেন, সে অবস্থার অবসান ঘটাবেন, ভয়-ভীতির স্থলে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করবেন। মুসলিম জাতি লাভ করবে, নিঃশংক জীবন। আলোচ্য আয়াত সমূহে মুসলিম জাতিকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, আল্লাহ পাক অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দিয়েছেন। হেজাজ নজদ, ইয়ামান এবং বাহরাইন পর্যন্ত স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই মুসলিম জাতির করতলগত হয়। তদানীন্তন কালে পৃথিবীতে দু'টি পরাশক্তি ছিল। পারশ্য সাম্রাজ্য এবং রোমক সাম্রাজ্য। মুসলিম জাতির অভ্যুত্থানের মাত্র বারো বছরের মধ্যে উভয় পরাশক্তি ভুলুন্ঠিত হয়। আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে এমন বিজয় দান করেন যার কোন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে নেই। পারশ্য সাম্রাজ্য তখন অগ্নি পূজকদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, আর রোমক সাম্রাজ্যে ছিল খৃষ্টানদের ক্ষমতা। উভয় সাম্রাজ্যই তখন অগাধ সম্পদ ও অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী ছিল এবং উভয় পরাশক্তির মধ্যে হাজার বছর ধরে যুদ্ধ অব্যাহত ছিল। কিন্তু একে অন্যকে পরাজিত করতে পারেনি। মুসলিম জাতি যারা ঈমানের বলে বলীয়ান ছিল তাদের সম্মুখে এই দু'টি পরাশক্তি বেশী দিন টিকতে পারেনি। সাহাবায়ে কেরাম তখন এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে যে ওয়াদা করেছেন তা পরিপূর্ণ করেছেন। অথচ তখন মুসলমানদের কাছে জাগতিক শক্তি বলতে তেমন কিছুই ছিলনা, কোন নিয়মিত সৈন্য বাহিনীও ছিলনা। যানবাহনেরও কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ছিলনা, যা কিছু হয়েছিল তা হয়েছিল একমাত্র আল্লাহ পাকের দানে।

দ্বিতীয়তঃ যদিও কাফেরদের নিকট পর্যাপ্ত আর্থিক ও সামরিক শক্তি ছিল, তাদের জনশক্তির অভাব ছিলনা, কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সোনালী যুগে এ সত্য সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে

ঈমানী শক্তির মোকাবেলায় জাগতিক শক্তি কখনও টিকতে পারেনা। আর সেই ঈমানী শক্তির অধিকারী ছিলেন মুসলিম জাতি।

তৃতীয়তঃ আলোচ্য একটি আয়াতে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন,

وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

তোমরা আমার রসূলের আনুগত হও, তাঁর কথা মেনে চল, তাহলে তোমাদের প্রতি রহমতের বারিধারা বর্ষিত হবে। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণের মাধ্যমে অর্জিত হয় সাফল্যের মনি মানিক্য। সাহাবায়ে কেরাম এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। এজন্যে তাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণে কখনও প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হতেন না। ফলে আল্লাহ্ পাক তাঁদেরকে দান করেছিলেন অসাধারণ সাফল্য।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, সাফল্যের এ পথ আজো রুদ্ধ হয়নি, রয়েছে চির উন্মুক্ত। মুসলিম জাতি যখনই এবং যেখানে জাতীয় ভিত্তিতে ঈমান ও নেক আমলের শর্ত পুরো করবে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করবে জীবনের প্রতি পদক্ষেপ, সেখানে আল্লাহ পাক মুসলিম জাতিকে দান করবেন পৃথিবীতে ক্ষমতা, সম্পদ, আধিপত্য, সাফল্য এবং সার্বিক কল্যাণ।

পক্ষান্তরে, যদি উল্লেখিত শর্ত পুরো না হয় এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ না করা হয় তবে তার শোচনীয় পরিণাম স্বরূপ ব্যর্থতা তথা অবমাননা, লাঞ্ছনা হবে অবধারিত। বলাবাহুল্য বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে ইউরোপের বসনিয়ায়, আফ্রিকার সোমালিয়াতে, আরব জাহানের ফিলিস্তিনে, উপমহাদেশের ভারতে, বার্মার রোহিংগা এবং ফিলিপাইনের মরো মুসলমানদের যে দুর্গতি হয়েছে তার একমাত্র কারণ পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা থেকে দূরে থাকা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ না করা।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ
اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ؕ مِنْ
قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ
وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ۚ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ
لَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ؕ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى
بَعْضٍ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۵۸﴾

তরজমা

(৫৮) হে মুমিনগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা সাবালক হয়নি তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিনটি সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের নামাজের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে, যখন তোমরা তোমাদের পোষাক খুলে রাখ এবং এশার নামাজের পর। এই তিনটি সময় ব্যতীত অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তাতে তোমাদের জন্যে ও তাদের জন্যে কোন দোষ নেই, তোমাদের একে অপরের নিকট তো আসা যাওয়া করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ পাক তোমাদের নিকট তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

তফসীরুল কোরআন

শানে নজুল

এবনে আবি হাতেম মোকাতেল এবনে হাইয়ানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আসমা বিনতে সাবেতের একটি গোলাম ছিল যে প্রায়ই হযরত আসমার নিকট এমন সময় অনুমতি ব্যতীত আসতো, যখন তাঁর নিকট তার আসা তিনি অপছন্দ করতেন। হযরত আসমা (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে

আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের খাদেম এবং গোলাম এমন সময় আমাদের নিকট আসে, যখন আমাদের নিকট তাদের আসা অপছন্দনীয়, তখন এ আয়াত নাজিল হয়। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ

হে মুমিনগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা সাবালক হয়নি তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিনটি সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

এ সূরার প্রারম্ভে মানুষের নৈতিক মান উন্নীত করার এবং চরিত্র মাধুর্য অর্জন করার হুকুম ছিল, তন্মধ্যে একটি কথা ছিল কারো গৃহে প্রবেশ করার পূর্বে অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ। আলোচ্য আয়াতে এ পর্যায়ের আরো কিছু বিধি-নিষেধ উল্লেখিত হয়েছে। গোলাম-বাঁদী বা চাকর-বাকরদের অনুমতি প্রার্থনা করে মনিবের গৃহে প্রবেশ করার নির্দেশ রয়েছে। সূরার শুরুতে কারোর গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণের যে নির্দেশ রয়েছে, তা ছিল আগন্তুকদের ব্যাপারে যে কারো বাড়ীতে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ বৈধ নয়। আর এ আয়াতে অনুমতি গ্রহণের নির্দেশের উল্লেখ রয়েছে গোলাম বাঁদী চাকর-বাকরের ব্যাপারে, বিশেষতঃ তিনটি নির্দিষ্ট সময়ে তারা যেন তোমাদের কক্ষে অনুমতি লাভের পরই প্রবেশ করে। কেননা, এ সময়গুলোতে সাধারণতঃ মানুষ বিশ্রাম করে থাকে, আর তন্দ্রাহত বা ঘুমন্ত অবস্থায় কখনও দেহের পোষাক সঠিক অবস্থায় না-ও থাকতে পারে। এজন্যে গোলাম বাঁদী বা চাকর-বাকরকে এ বিশেষ সময়গুলোতে অনুমতি ব্যতীত কারো কক্ষে প্রবেশ না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।১

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একজন আনসারী গোলামকে দ্বিপ্রহরের সময় হযরত ওমর (রাঃ)-কে ডেকে আনার জন্যে প্রেরণ করেন। গোলাম হযরত ওমর (রাঃ)-এর ঘরে এমন সময় প্রবেশ করে, যখন তার প্রবেশ করা হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট অপছন্দীয় হয়েছিল, কেননা, তিনি ছিলেন ঘুমন্ত, গোলাম তাঁকে হঠাৎ জাগ্রত করেছিল তখন তাঁর পরিধেয় বস্ত্র খুলে গিয়েছিল, তাই এমন সময় গোলামের প্রবেশ তাঁর অপছন্দনীয় হয়েছিল, তখনই

لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ

আয়াতাংশ নাজিল হয়।২

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৫৯

২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৮, পৃষ্ঠা-৮১

আয়াতের মর্মকথা

এ আয়াতে আত্মীয়-স্বজন, গোলাম বাঁদী চাকর-বাকর, নাবালক ছেলে-মেয়ে সকলের জন্যে কারো গৃহে প্রবেশের ব্যাপারে বিধি-নিষেধের উল্লেখ রয়েছে। ফজরের নামাজের পূর্বে, দুপুর বেলায় এবং এশার নামাজের পরে যেন অনুমতি প্রার্থনা করে কারো ঘরে প্রবেশ করা হয়। কেননা, এ তিনটি সময়ে মানুষ তার গৃহে বিশ্রাম করে, গায়ের পোষাক খুলে রাখে।

مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ

অর্থাৎ ফজরের নামাজের পূর্বে কেননা, এ সময় মানুষ জাগ্রত হয়, পোষাক পরিবর্তন করে।

وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ

দ্বিপ্রহরের সময় যখন তোমরা পোষাক খুলে রাখ।

وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ

আর এশার নামাজের পর, তখনও সাধারণতঃ মানুষ পোষাক খুলে বিশ্রাম করে।

ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ

'এ তিনটি সময় তোমাদের পর্দা করার' অর্থাৎ এ তিনটি সময় অবশ্যই বাড়ীর লোকদেরকেও কারো ঘরে প্রবেশ করার জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে এমনকি, চাকর চাকরানীও অনুমতি ব্যতীত ঘরে প্রবেশ করবেনা।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ উপরোল্লিখিত নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত অন্য সময় দাস-দাসী, চাকর-বাকর বা কম বয়সী ছেলে পেলের গৃহে প্রবেশে কোন দোষ নেই। কেননা, তাদের সর্বদা গৃহে আসা-যাওয়া করতেই হয়, আর প্রত্যেকবারের জন্যে অনুমতি গ্রহণে বাধ্য করা হলে উভয় পক্ষেরই অসুবিধা হওয়ার আশংকা থাকে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, তিনটি আয়াতের উপর আমল করার ব্যাপারে লোকেরা গাফলত করছে।

(এক) আলোচ্য আয়াত

(দুই) সূরায়ে নেছার وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ

(তিন) সূরায়ে হুযুরাতের اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ

প্রথম আয়াতে তিনটি সময়ে চাকর-বাকর, গোলাম-বাঁদীকে গৃহে প্রবেশের সময় অনুমতি প্রার্থনা করার নির্দেশ রয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে এরশাদ হয়েছে, উত্তরাধিকার বিতরণের সময় যদি আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন হাজির হয়, তবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে তাদেরকেও যৎসামান্য দান করার নির্দেশ রয়েছে। আর তৃতীয় আয়াতে বংশ পরিচয়ের উপর গৌরব না করার আদেশ দেয়া হয়েছে কেননা, ইসলামে তাকওয়া পরহেজগারীই হল অধিকতর সম্মান লাভের মানদন্ড।

ইমাম শাবী (রঃ)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে এ আয়াত সমূহের উপর লোকেরা আমল করা ছেড়ে দিয়েছে কেন? তিনি বলেন, আল্লাহ পাকের দরবারে আমল করার তওফিকের জন্যে দোয়া করা কর্তব্য।১

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

এভাবেই আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে তাঁর আয়াত সমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে থাকেন। আর আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, তিনি বিজ্ঞানময়। অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। কোন্ কাজে মানুষের কল্যাণ আর কোন্ কাজে অকল্যাণ তা তিনিই ভাল জানেন, তাই তাঁর প্রতিটি আদেশ তাৎপর্যবহ, বৈশিষ্ট্যমন্ডিত এবং কল্যাণময়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ এ আয়াতের হুকুম সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীগণ একাধিক মত পোষণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যখন এ আয়াত নাজিল হয়, তখন লোকেরা ছিল দারিদ্র্য-প্রপীড়িত, ঘরের পর্দার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা সাধারণতঃ হতোনা। এ কারণে কখনও কখনও খাদেম খেদমতগার, চাকর-বাকর অসময়ে প্রবেশ করলে গৃহবাসীদের অসুবিধা হতো, তাই এ আদেশ হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী কালে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে সম্পদশালী করেছেন, দারিদ্র দূরীভূত হয়েছে, এজন্যে চাকর-বাকরের অনুমতি প্রার্থনার তেমন প্রয়োজন রয়নি।

সায়ীদ এবনে জুবায়ের (রাঃ) বলেছেন, কোন কোন লোকের ধারণা এ আয়াতের হুকুম মনসুখ হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা তা নয়, আল্লাহর শপথ তা মনসুখ নয়, বরং লোকেরা এ আয়াতের উপর আমল করার ব্যাপারে গাফলত করেছে, তিনটি নির্ধারিত সময় যে কোন মানুষ বিশ্রাম করে, এবং পরিধেয় বস্ত্র খুলে রাখে, তাই এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।২

আল্লামা সয়ুতি (রঃ) এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।৩

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৮, পৃষ্ঠা-৭৯

২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -৪০৩-০৪

৩। তফসীরে আদদররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬১৬৩

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا
اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي
لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ
ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ
خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

তরজমা

(৫৯) আর তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন তারাও যেন অনুমতি প্রার্থণা করে, যেমন তাদের বয়জেষ্ঠগণ অনুমতি গ্রহণ করে থাকে, এভাবে আল্লাহ পাক তাঁর আয়াত সমূহ তোমাদের জন্যে বর্ণনা করে থাকেন, আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, তিনি বিজ্ঞানময়।

(৬০) আর যে সব বৃদ্ধা নারী ঘরে বসে আছে, বিবাহের আশা পর্যন্ত তাদের নেই, তাদের নিজেদের বহির্বাস খুলে রাখতে কোন গুণাহ নেই, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, তাবে এ কাজ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্যে উত্তম। আর আল্লাহ পাক সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

তফসীরুল কোরআন

সন্তান-সন্ততি যতক্ষণ নাবালক থাকে, ততক্ষণ উল্লেখিত তিনটি সময় ব্যতীত অন্য সময়ে গৃহে প্রবেশের জন্যে তাদের অনুমতি গ্রহণ জরুরী হয়না , তারা অনুমতি ব্যতীত অনায়াসে ঘরে আসা যাওয়া করতে পারে। কিন্তু যখন তারা সাবালক হয়ে

যায়, তখন তাদেরকেও অন্যদের ন্যায় ঘরে প্রবেশের জন্যে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

كَذٰلِكَ

এভাবেই আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে তাঁর আয়াত সমূহ তথা বিধি-নিষেধ সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করে থাকেন। আর আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, তিনি তোমাদের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তিনি বিজ্ঞানময়, তাঁর প্রতিটি আদেশ হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ। তিনি জানেন কোন্ কাজে রয়েছে তোমাদের কল্যাণ, আর কিসে রয়েছে তোমাদের অকল্যান।

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ

আর যে সব বৃদ্ধা নারী ঘরে বসে আছে, বিবাহের আশা পর্যন্ত তাদের নেই, তাদের নিজেদের বহির্বাস খুলে রাখতে কোন গুণাহ নেই, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, তবে একাজ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্যে উত্তম।

তফসীরকারগণ বলেছেন, যে সব বৃদ্ধা মহিলাদের বিবাহের বয়স পার হয়ে গেছে, বিবাহের কোন আশা করাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাদের সম্পর্কে এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে তারা যদি স্বল্প বসন পরিধান করে স্বগৃহে থাকে, তবে তাতে দোষ নেই।

পূর্ববর্তী আয়াতে এ আদেশ রয়েছে, لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ

মহিলারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, আর এ আয়াতে বৃদ্ধা মহিলাদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে যে, তারা যদি স্বল্প বসনে গৃহে থাকে তাতে দোষ নেই, কিন্তু কোন সাজ-সজ্জা বা সৌন্দর্য প্রকাশ করার কোন প্রকার ইচ্ছা যেন না থাকে, তবে উত্তম হল পুরোপুরি পর্দা করে থাকা। وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

আল্লাহ পাক সর্বশ্রোতা, তিনি সব কিছু শোনেন, তিনি মহাজ্ঞানী, তিনি সব কিছু জানেন।

ব্যভিচার বা অন্যায় অনাচার পরিহার করার লক্ষ্যেই এসব বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু এসব বিধানের উপর কে সঠিক ভাবে আমল করে এবং কে করেনা, আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, কোন কিছুই তাঁর অগোচরে নেই, প্রত্যেককে এ কথা মনে রাখতে হবে যে দুনিয়াতে যার আচার যেমন হবে কেয়ামতের দিন তার বিচারও তেমনি হবে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ পাক সর্বশ্রোতা, তাই কোন নারী পুরুষের মধ্যে যে কথা হোক, তা তিনি শ্রবণ করেন আর তাদের যে উদ্দেশ্য থাকে সে সম্পর্কেও তিনি অবগত থাকেন।

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى
حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ
وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ بُيُوْتِكُمْ اَوْ
بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ
بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ
اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ
مَّفَاتِحَهٗٓ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ
تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا ؕ فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا
فَسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً
طَيِّبَةً ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦١﴾

তরজমা

(৬১) যারা অন্ধ, খোঁড়া এবং রুগ্ন, তাদের জন্যে দোষ নেই এবং স্বয়ং তোমাদের জন্যেও দোষ নেই, এতে যে তোমরা স্বয়ং (অথবা সেই মাজুরগণ) নিজেদের গৃহ সমূহে আহার কর, অথবা তোমাদের পিতৃগণের গৃহে, মাতৃগণের গৃহে, ভ্রাতৃগণের গৃহে, ভগ্নিগণের গৃহে, পিতৃব্যদের গৃহে, ফুফুদের গৃহে, মামাদের গৃহে, খালাদের গৃহে, তোমরা যে গৃহের চাবির মালিক সেই গৃহে, অথবা তোমাদের নিজেদের বন্ধু–বান্ধবদের গৃহে তোমরা একত্রে আহার কর বা পৃথক পৃথক আহার কর তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করতে ইচ্ছা কর, তখন নিজেদের লোকদের প্রতি সালাম দিও, দোয়া স্বরূপ, এতে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে রয়েছে বরকত এবং কল্যাণ। এভাবেই আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে বর্ণনা করেন আয়াত সমূহ, যাতে করে তোমরা বুঝতে পার।

তফসীরুল কোরআন

শানে নজুল

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, অন্ধ, খোঁড়া এবং অসুস্থ লোকেরা সুস্থ লোকদের সঙ্গে একত্রে বসে খাবার গ্রহণে অনিচ্ছুক থাকত কেননা, প্রাক-ইসলামিক যুগে সুস্থ লোকেরা তাদেরকে ঘৃণা করত এবং তাদের সাথে বসে খাবার গ্রহণে আপত্তি করত। অন্ধ ব্যক্তি বলত, হয়তো আমি পরিমাণে বেশি খেয়ে ফেলব, (ফলে অন্যদের খাবার কম হয়ে যাবে)। খোঁড়া ব্যক্তি বলত, আমার বসবার জন্যে দু'জনের স্থান দরকার হয়, হয়তো এ কারণে অন্য মানুষের কষ্ট হবে।১

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে যে সব বিধি-নিষেধ বর্ণিত হয়েছে, তা ছিল পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয়। এ আয়াতে একত্রে পানাহার গ্রহণ সম্পর্কে নিয়ম-কানুন বর্ণিত হয়েছে। কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন,

لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"অর্থাৎ তোমরা পরস্পর অন্যায় ভাবে কারো অর্থ-সম্পদ হজম করোনা।" এ আয়াত নাজিল হবার পর সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করলেন এমনকি, নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে পানাহার পরিত্যাগ করলেন, তারা মনে করলেন, নিস্প্রয়োজনে কারো বাড়ীতে পানাহার হালাল হবেনা এমনকি, যারা অন্ধ এবং খোঁড়া, তারা নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে আসা যাওয়া বন্ধ করে দিলেন, তারা ধারণা করলেন, হয়তো আমাদের আসা যাওয়ার কারণে তাদের কষ্ট হবে। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, অন্ধ, খোঁড়া, রোগী, দুর্বল দারিদ্র্য-প্রপীড়িত লোকদের সঙ্গে একত্রে বসে খাবার গ্রহণে কোন দোষ নেই, যেভাবে জাহেলিয়াতের যুগে এমন লোকদের সঙ্গে একত্রে বসে খাবার গ্রহণে ঘৃণাবোধ করা হতো, ঠিক তেমনিভাবে ইসলামের আবির্ভাবের পরও মোমেনগণ তাদের সঙ্গে একত্রে আহার গ্রহণে ভয় করতেন, যদি কোন অসতর্ক মুহূর্তে তাদের প্রতি কোন অবমাননা হয়ে যায় অথবা তাদের কোন আচরণ ঐ মাজুর লোকদের মনঃকষ্টের কারণ হয়। এ কারণে তারা এ সব লোককে এড়িয়ে চলতেন কেননা, অন্ধ ব্যক্তি খাবার দেখেনা, আর খোঁড়া ব্যক্তি ঠিকভাবে বসতে পারেনা, আর রোগীরা দুর্বলতার কারণে খাবার স্বহস্তে তুলে খেতেও পারেনা। এমনি অবস্থায় ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানগণ তাদের সঙ্গে বসে খাওয়া পছন্দ করতেন না। আর এ কারণেই

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -৪০৮

আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেন, অন্ধ, খোঁড়া, রুগ্ন ব্যক্তির সঙ্গে একত্রে বসে খাবার গ্রহণে কোন দোষ নেই।

এ পর্যায়ে হযরত সায়ীদ এবনুল মুসায়্যেব (রাঃ) বর্ণনা করেন, মুসলমানগণ যখন জেহাদে গমন করতেন, তখন তারা উপরোল্লিখিত অসহায় লোকদেরকে বাড়ীতে রেখে গৃহের চাবি দিয়ে চলে যেতেন এবং বলতেন, তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হল, কিন্তু তবুও তারা এ ব্যাপারে অসুবিধা অনুভব করতেন এবং বলতেন, গৃহকর্তারা যখন বাড়ীতে নেই এমন অবস্থায় এই গৃহে প্রবেশ করা অনুচিত হবে। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, যে সব পঙ্গু, অন্ধ লোকেরা জেহাদে গমনে সক্ষম হতোনা, তাদের সম্পর্কেই এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

এতে তাদেরকে জেহাদে অংশ গ্রহণ না করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ

আর এতেও তোমাদের উপর কোন বাধ্যবাধকতা নেই যে তোমরা তোমাদের নিজেদের ঘর থেকে কিছু আহার কর।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতাংশে নিজেদের ঘর বলতে সেই সব ঘরকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে মানুষ তার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার নিয়ে বাস করে। আর প্রত্যেকের সন্তানের ঘরও তার নিজের ঘর বলেই পরিগণিত হয়। কেননা হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তুমি এবং তোমার ধন-সম্পদ তোমার পিতার।

(এবনে মাজা, হাকেম)

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আরো একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সে সম্পদই পবিত্রতম যা মানুষ নিজে রোজগার করে আর কোন ব্যক্তির সন্তানের রোজগারও তারই। অর্থাৎ স্ত্রী পুত্র পরিবারের রোজগার ভোগ করায় কোন দোষ নেই।

اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ

অর্থাৎ তোমাদের পিতা, মাতা, ভাই, বোন, পিতৃব্য, ফুফু, মামা, খালা এসব লোকের গৃহে প্রবেশ করায় এবং পানাহার করায় কোন দোষ নেই।

اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ

অথবা তোমরা যে ঘরের চাবির মালিক সে ঘরেও আহার করতে কোন দোষ নেই।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হল কোন লোককে কোন গৃহের, জায়গা সম্পত্তির দেখা শোনার দায়িত্ব অর্পণ করা হলে সেই জমীনের উৎপন্ন বস্তু থেকে ভোগ করার অধিকার থাকবে ব্যবস্থাপকের। এমনিভাবে, যদি কোন চতুস্পদ জন্তুর দেখা শোনার দায়িত্ব কারো প্রতি অর্পিত হয়, তবে তার দুধ পান করার অনুমতি রয়েছে, তবে তার উপর বোঝা চাপিয়ে দেয়ার অধিকার নেই।

এমনিভাবে, কোন জমীনের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কারো প্রতি অর্পিত হলে তার উৎপন্ন বস্তু আহার করার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু সেই উৎপন্ন বস্তু মওজুদ করার অনুমতি নেই। তফসীরকার জ্যাহ্যাক (রঃ) আলোচ্য ব্যাক্যাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর দ্বারা গোলাম বাঁদীদের গৃহ উদ্দেশ্য করা হয়েছে কেননা, কারো গোলাম বাঁদীর গৃহ তাদের মনিবদের মালিকানাধীন থাকে।

তফসীরকার একরামা (রঃ) বলেছেন, যখন কোন মানুষ কোন গৃহের চাবির মালিক হয়, তবে উক্ত গৃহের সম্পদের মালিকও সে-ই হয়। তাই ঐ সম্পদ থেকে কিছু আহার করায় কোন দোষ নেই।

সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি তার খাদ্য দ্রব্যের ব্যবস্থাপনায় কোন লোককে নিয়োজিত করে, তবে ঐ খাদ্য থেকে ব্যবস্থাপকের খাদ্য গ্রহণে কোন দোষ নেই।

এবনে জরীর (রঃ) বর্ণনা করেন যে ইমাম জুহরী (রঃ)-কে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখা সম্পর্কে কিজ্ঞাসা করা হয়। জুহরী (রঃ) বলেন, মুসলমানগণ যখন জেহাদে গমন করতেন তখন তাদের গৃহে অসুস্থ, অসহায়, পঙ্গু লোকদেরকে রেখে যেতেন এবং তাদেরকে বলতেন, ঘরে যা আছে তা থেকে তোমরা খেতে পার। কিন্তু ঐ অসহায় ব্যক্তিরা বলত, যখন গৃকর্তারা নেই, তখন আমরা কি করে তাতে প্রবেশ করতে পারি? আর এমন অবস্থায় কিভাবে এই ঘরের খাদ্য গ্রহণ করতে পারি। তখন এ আয়াত নাজিল হয় এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে অনুমতি প্রদান করা হয়।

أَوْ صَدِيقِكُمْ

অথবা তোমাদের বন্ধু-বান্ধরের ঘরে, অর্থাৎ-নিজেদের বন্ধু-বান্ধবের গৃহে তাদের অনুপস্থিতকালে গিয়ে কিছু আহার করার অনুমতি রয়েছে কেননা, তা বন্ধুর আনন্দেরই কারণ হবে।

আল্লামা বগভী লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ এ

আয়াত নাজিল হয়েছে হারেস এবনে আমর সম্পর্কে। হারেস হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জেহাদে গমনের সময় মালেক এবনে জায়েদকে তাঁর বাড়ীর দেখা-শুনার দায়িত্ব দিয়ে চলে যান। জেহাদ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দেখেন মালেক অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তোমার গৃহে খাবার থাকলেও তা গ্রহণের অনুমতি তো ছিলনা, এজন্যে ঐ খাবার গ্রহণ আমি অবৈধ মনে করেছি। তখন এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) একথাও লিখেছেন, এ আয়াতের কারণে তফসীরকার হাসান (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) এ মত পোষণ করতেন, আপন বন্ধুর গৃহে প্রবেশ করে তার অনুমতি ব্যতীত কিছু খেয়ে নেয়া বৈধ, তবে শর্ত হলো বন্ধুর বাড়ী থেকে বিনা অনুমতিতে কিছু নিয়ে যাওয়া বৈধ নয়, আর কোন কিছু মওজুদ করাও অবৈধ। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, এই আদেশ ছিল ইসলামের প্রথম যুগে, এখন তা বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু সঠিক কথা হল, এই আদেশ এখনও বলবত রয়েছে। তবে শর্ত হল বাড়ীর মালিক সুস্পষ্ট ভাবে যদি অনুমতি দেয় অথবা আকারে ইংগিতে যদি বুঝিয়ে দেয় তবে কারো বাড়ীতে এভাবে খাবার গ্রহণ বৈধ।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا

তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক পৃথক আহার কর, তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) -এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সম্পদশালী লোকেরা দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে গমন করতো, তারা আহার্য বস্তু সম্পদশালী লোকদের নিকট রাখতো, তখন সম্পদশালী লোকেরা বলতো, আল্লাহর শপথ! আমরা পানাহারে তোমাদের সাথে শরীক হয়ে গুণাহ করবো না কেননা, আমরা সম্পদশালী, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে বণী ইলায়েস এবনে বকর কেনানী সম্পর্কে। এ গোত্রের এক ব্যক্তি মেহমান ব্যতীত খাবার গ্রহণ করতো না। যদি কোন মেহমান পাওয়া যেত তখন আহার করতো। কখনো এমনও হত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন মেহমান তার সঙ্গে খাওয়ার জন্যে পেতনা এজন্যে সে আহার করতো না। এমনকি তার উষ্ট্রির দুগ্ধ পরিপূর্ন হয়ে থাকতো, কিন্তু কোন মেহমান তার সঙ্গে পান করার জন্য না পেলে সে দুগ্ধ দহন করতো না, যখন কোন মেহমান সে পেত, তখন তার সঙ্গে দুগ্ধ পান করতো। অন্যথায় সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত অবস্থায় অতিবাহিত করতো। তার সম্পর্কেই এ আয়াত নাজিল হয়েছে। তফসীরকার কাতাদা (রঃ) জাহ্যাক (রঃ) এবং এবনে

জুরায়েজ (রঃ) এ কথা বর্ণনা করেছেন।

এবনে জরীর ও বগভী (রঃ) এ পর্যায়ে একরামা ও আবু সালেহের উদ্ধৃতি দিয়েছেন এভাবে যে আনসার তথা মদীনাবাসী সাহাবায়ে কেরামের নিয়ম ছিল যখন তাঁদের নিকট কোন মেহমান আসতো, যতক্ষণ মেহমান খাবারে অংশগ্রহণ না করতেন, ততক্ষণ তারা খাবার গ্রহণ করতেন না। তাই এ আয়াতে তাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে যে তারা মেহমানদের সাথে একত্রিত হয়েও খেতে পারেন আর ভিন্ন ভিন্নও খেতে পারেন। শরীয়তের উদার নীতি ঘোষণা করা হয়েছে যে খাবার বেলায় একত্রে আহার করা যেমন বৈধ, ঠিক তেমনি পৃথক পৃথক ভাবে খাবার গ্রহণেরও অনুমতি রয়েছে।

فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ

তবে যখন তোমরা কারো ঘরে প্রবেশ করতে ইচ্ছা কর, তখন তোমরা নিজেদের লোকদের সালাম দিও।

পরস্পরের মোলাকাতে অভিবাদন স্বরূপ একে অন্যকে সালাম দেয়ার নির্দেশ রয়েছে এ আয়াতে।

عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ

অর্থাৎ নিজের ঘরে প্রবেশ কর অথবা অন্যের, যে কোন অবস্থায় পরস্পরকে সালাম দিও। এটি নেক দোয়া, এতে রয়েছে বরকত এবং সার্বিক কল্যাণ। হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে তাঁর নিদৃষ্ট আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। আদম (আঃ)-এর দৈর্ঘ ছিল ষাট হাত। আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ পাক তাঁকে নিদেশ প্রদান করেন যে ফেরেশতাদের একদল উপবিষ্ট রয়েছে, তাদের নিকট গমন করে তাদেরকে সালাম দাও, তারা তোমার সালামের যে জবাব দেবে তাই তোমার ও তোমার বংশধরদের জবাব হবে। আদম (আঃ) ফেরেশতাদেরকে আসসালামু আলাইকুম বললেন। ফেরেশতাগণ বললেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নির্দেশ স্বরূপ সালামের এ প্রথা প্রবর্তন করা হয়েছে।

مُبٰرَكَةً

সালামের মাহাত্ম

অর্থাৎ এটি হলো বরকতময়, কল্যাণকর। বরকতের অর্থ হল কল্যাণের আধিক্য, তথা অধিকতর কল্যাণ, طَيِّبَةً পবিত্র অর্থাৎ মোনাফেকী এবং লোক দেখানো থেকে পবিত্র।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এর অর্থ হল যারা সালাম শ্রবণ করে তারা আনন্দিত হয় অর্থাৎ যাকে সালাম দেয়া হয়, তা তার আনন্দের কারণ হয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হল উত্তম, সুন্দর।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ আমি দশ বছর যাবত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমত করেছি, (সুদীর্ঘ) সময়ের মধ্যে তিনি কখনও কোন ব্যাপারে একথা বলেননি, অমুক কাজটি কেন করলে? বা অমুক কাজটি কেন করলে না? একবার আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে দন্ডায়মান ছিলাম, আমি তাঁর দস্তে মোবারকে পানি ঢালছিলাম, তখন তিনি মাথা মোবারক উত্তোলন করে আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে তিনটি বিষয়ে শিক্ষা দেবনা? যা তোমার জন্যে হবে উপকারী। আমি আরজ করলাম, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক, এরপর তিনি এরশাদ করলেন, যখন আমার কোন উম্মতীর সংগে তোমার মোলাকাত হয়, তখন তাকে সালাম দিও। ফলে তোমার বয়স বাড়িয়ে দেয়া হবে। আর যখন গৃহে প্রবেশ কর তখন গৃহের অধিবাসীদেরকে সালাম দিও, তোমার গৃহের কল্যাণ বৃদ্ধি পাবে। আর চাশতের নামাজ পড়বে। কেননা, এই নামাজ হল সেই ব্যক্তির জন্যে যে আল্লাহ পাকের দরবারে প্রত্যাবর্তনকারী বলে মনে করে।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন তোমরা বাইরে যাও, তখন তোমাদের পরিবারবর্গকে সালাম দিয়ে বিদায় কর।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যদি ঘরে কেউ না-ও থাকে তবে এভাবে বলবে,

السَّلَامُ عَلَيْنَا مِنْ رَّبِّنَا السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ السَّلَامُ عَلٰى اَهْلِ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

অর্থাৎ আমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে আমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহ পাকের নেক বান্দাদের প্রতি এবং শান্তি বর্ষিত হোক এই ঘরের অধিবাসীদের প্রতি এবং আল্লাহ পাকের রহমত নাজিল হোক।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে জিজ্ঞাসা করল, ইসলামে সর্বোত্তম আমল কোন্‌টি। তিনি এরশাদ করলেন, তুমি মানুষকে আহার করাও এবং প্রত্যেককে সালাম কর তুমি তাকে চেন বা না চেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মুসলমানের প্রতি অন্য মুসলমানের ছয়টি হক্ব রয়েছে।

(এক) কোন মুসলমান যখন অসুস্থ হয়, তখন তার খোঁজ-খবর নেবে।

(দুই) আর যদি তার মৃত্যু হয় তবে জানাযায় হাজির হবে।

(তিন) যদি কোন মুসলমান দাওয়াত করে তবে তা গ্রহণ করবে।

(চার) যদি কোন মুসলমানের সঙ্গে মোলাকাত হয় তবে সালাম দেবে।

(পাঁচ) আর যদি কোন মুসলমানের হাঁচি আসে তবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে।

(ছয়) সে উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক তার কল্যাণ কামনা করবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যতক্ষণ তোমরা প্রকৃত মোমেন না হবে, ততক্ষণ জান্নাতে যেতে পারবেনা, আর যতক্ষণ একে অন্যকে ভাল না বাসবে ততক্ষণ প্রকৃত মোমেন হতে পারবেনা। আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের কথা বলবনা যদি তোমরা সে কাজটি কর তবে একে অন্যকে ভালবাসতে শুরু করবে অতএব, সালামের প্রসার কর।

(মুসলিম শরীফ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে আরোহী ব্যক্তি সালাম করবে সেই ব্যক্তিকে যে পদব্রজে রয়েছে। আর যে পদব্রজে চলছে সে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম করবে আর অল্প লোক বেশী লোককে সালাম করবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীস বোখারী শরীফে সংকলিত হয়েছে, তাতে রয়েছে- যে বয়সে ছোট সে বড়কে সালাম করবে।

হযরত ইমরান এবনে হাসীন (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে বলল, আসসালামু আলাইকুম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর সালামের জবাব দান করেন। এরপর ঐ ব্যক্তি

বসে গেল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, দশটি নেকী হয়েছে। কিছুক্ষণ পর আরো এক ব্যক্তি হাজির হল, সে বলল,আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তেমনি জবাব দান করলেন। এরপর লোকটি বসে গেল। তখণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, বিশ নেকী। এরপর আরেক ব্যক্তি আসল, তখন সে বলল, আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লহি ওয়াবারাকাতুহু। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে অনুরূপ জবাব দিলেন। এরপর সে বসে গেল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ত্রিশ।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا
مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ
الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾ لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ
الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ
يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا
فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ
يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٤﴾

তরজমা

(৬২) তারাই প্রকৃত মোমেন, যারা আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস করে এবং কোন সম্মিলিত কাজে যখন তারা রসূলের সঙ্গে একত্রিত হয় তখন তারা তাঁর অনুমতি না নিয়ে কখনও চলে যায় না। (হে রসূল!) যারা আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে প্রকৃতপক্ষে তারাই আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলকে মানে। অতএব, তারা যখন তাদের নিজেদের কোন কাজে আপনার নিকট অনুমতি চায় তবে তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা আপনি অনুমতি দিবেন, আর তাদের জন্যে আল্লাহ পাকের নিকট আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

(৬৩) রসূলের আহবানকে তোমাদের একে অন্যকে ডাকার ন্যায় মনে করোনা, তোমাদের মধ্যে যারা চুপি চুপি সরে পড়ে আল্লাহ পাক তাদেরকে ভালভাবেই জানেন। অতএব, যারা আল্লাহ পাকের হুকুমের বিরোধিতা করে তাদের ভয় করা উচিত, তাদের উপর কোন বিপদাপদ আপতিত হতে পারে, অথবা আসতে পারে তাদের উপর কোন মর্মান্তিক আযাব।

(৬৪) জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আসমান জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ পাকের, তিনি খুব ভাল করেই জানেন তোমরা যে অবস্থায় আছ এবং সেদিনকেও যেদিন তাদের সকলকে তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। সেদিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে। আল্লাহ পাক সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে সাধারণ মজলিস সমূহের আদব কায়দা, নিয়ম-কানুন সম্পর্কে উপদেশ স্থান পেয়েছে, কোন আগন্তুকের কারো বাড়ীতে প্রবেশের সঠিক নিয়মও ঘোষণা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মজলিসের আদব এবং নিয়ম-কানুন পালন সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে বের হওয়ার জন্যে অনুমতি প্রার্থনা একান্ত জরুরী। তিনি ডাকলে অনতিবিলম্বে সাড়া দেয়া অবশ্য কর্তব্য। তাঁর পবিত্র মজলিস থেকে অনুমতি না নিয়ে বের হয়ে যাওয়া এবং তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে হাজির না হওয়া অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ এবং মোনাফেকদের

বৈশিষ্ট্য। কেননা, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তাজীম করা, তাঁর মজলিশের আদব রক্ষা করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

শানে নজুল

এবনে এসহাক, এবনে মুনজের, বায়হাক্বী মোহাম্মদ এবনে কাব কারজীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, পঞ্চম হিজরীতে অনুষ্ঠিত আহযাবের যুদ্ধে সারা আরবের কাফেররা যুক্তফ্রন্ট করে প্রাণের মদীনা আক্রমণ করে। কাফেরদের সেনাপতি ছিল আবু সুফিয়ান। কাফেরদের আক্রমণের সংবাদ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পূর্বাহ্নেই পৌছেছিল, তাই তিনি মদীনা মোনাওয়ারার সমতল ভূমিতে এক বিরাট পরিখা খননের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তিন হাজার পূন্যাত্মা সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে তিনি এই পরিখা খননের কাজ আরম্ভ করেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজে মাটি কাটেন এবং মাটির বোঝা তুলে নেন, সাহাবায়ে কেরাম তাঁর সঙ্গে কর্মরত ছিলেন। কিন্তু মোনাফেকরা তখন কাজে গাফলত করছিল, এমনকি পরিখা খননের নামে প্রতারণা করছিল। সুযোগ পেলেই পেছন থেকে তারা সরে পড়তো এবং বাড়ী চলে যেত। মুসলমানদের চোখে ধূলো দিয়ে তারা এসব করতো। ঘটনাক্রমে যদি কোন মুসলমান দুর্ঘটনায় কবলিত হয়ে রণক্ষেত্র থেকে বাসস্থানে যেতে বাধ্য হতেন তখন তাঁর সম্পর্কে মোনাফেকরা এসে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট খবর দিত। আর মুসলমানগণ যদি একান্ত প্রয়োজন হত, তবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুমতি নিয়ে তারা বাড়ী যেতেন। কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ফিরে আসতেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।১

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

অর্থাৎ প্রকৃত মোমেন সে সব লোকই যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস রাখে আর যখন তারা কোন কাজে যৌথভাবে অংশগ্রহণ করে, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুমতি না নিয়ে সরে পড়েনা, যারা এভাবে সরে পড়ে তারা প্রকৃত মোমেন নয়। নিজের যত প্রয়োজনই থাকুক, কোন খাঁটি মোমেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র মজলিস থেকে তাঁর অনুমতি ব্যতীত বের হয়ে যায় না। কোন কোন তফসীরকার এ আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন, পূর্ববর্তী একটি আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আগমনকালে তাঁর অনুমতি প্রার্থনার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, আর আলোচ্য

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -৪১৬

তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬৬

আয়াতে মজলিস থেকে বিদায় গ্রহণের সময় অনুমতি প্রার্থনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বস্তুতঃ যারা প্রকৃত খাঁটি মোমেন, তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুমতি ব্যতীত তাঁর মজলিস থেকে সরে পড়ে না, শুধু মোনাফেকরাই এ অন্যায় আচরণ করে। ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ কালবী (রঃ) বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর ভাষণে কখনো মোনাফেকদের অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতেন, তখন মোনাফেকরা ডানে বামে দেখতো, যখন কাউকে না দেখত তখন কেটে পড়ত এবং নামাজও পড়তনা। আর যখন কাউকে দেখত তখন মসজিদেই থাকত, নামাজও আদায় করত। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর কোন মোমেন শত কাজ থাকা সত্ত্বেও হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুমতি ব্যতীত বের হতেন না। আর মোনাফেকরা বের হবার জন্যে অনুমতি গ্রহণ করতো না।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক এ আয়াতে মোমেন বান্দাগণকে একটি আদব শিক্ষা দিয়েছেন। "হে মোমেনগণ! যেভাবে তোমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হবার সময় তাঁর অনুমতি প্রার্থনা কর, ঠিক তেমনিভাবে তাঁর পবিত্র মজলিস থেকে বিদায় হবার সময়ও তাঁর অনুমতি প্রার্থনা কর। বিশেষতঃ যখন তোমরা কোন সম্মিলিত কাজে অংশ গ্রহণ কর, অথবা কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জরুরী পরামর্শ সভা বসে, তখন এমন মজলিস থেকে অনুমতি ব্যতীত তোমরা বের হবেনা।১

তফসীরকারগণ বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে অনুমতি প্রার্থনা করা সততা এবং আন্তরিকতার প্রমাণ এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ভক্তি ও অনুরক্তির নিদর্শন। যে প্রকৃত মোমেন সে তার নিজের প্রয়োজনের উপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুমতিকে প্রাধান্য দিয়েছে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, ওস্তাদ এবং পীর মুর্শেদের মজলিসের সম্পর্কেও এ নিয়মই কার্যকর রয়েছে।

وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ

আর যখন তারা আল্লাহ পাকের রসূলের সঙ্গে কোন সম্মিলিত কাজে অংশগ্রহণ করে, তারা আল্লাহর রসূলের অনুমতি না নিয়ে কোথাও সরে পড়ে না। যদি তাদের কোন প্রয়োজন হয়, তবে তারা আল্লাহ পাকের রসূলের সমীপে অনুমতি প্রার্থনা

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৮, পৃষ্ঠা-৮৫

করে। বস্তুতঃ তারাই প্রকৃত মোমেন কেননা, তারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসুলের কথা মেনে চলে। এটি প্রকৃত মোমেনের বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে যারা প্রকৃত মোমেন নয়, তারা প্রিয়বী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য থেকে পলায়নপর হয়, তাঁর অনুমতি ব্যতীতই তারা মজলিস থেকে কেটে পড়ে। এতে তাদের বেয়াদবী প্রকাশ পায়।

فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ

অর্থাৎ তারা যখন তাদের নিজেদের কোন কাজে যাওয়ার জন্যে (হে রসূল!) আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন আপনি যাকে ইচ্ছা তাকে অনুমতি দিন। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, যাকে ইচ্ছা তাকে অনুমতি দিন কথাটির তাৎপর্য হলো, যার সততা সত্যবাদিতা সম্পর্কে আপনি অবগত এবং এ সত্য আপনি উপলব্ধি করেন যে তার ওজর সত্য, তাকে অনুমতি দান করুন।

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾

আর হে রসূল! আপনি তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহর নবীর মজলিস থেকে চলে যাওয়া নিঃসন্দেহে একটি অশোভন আচরণ, আর তাঁর দরবারের বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়ার নিদর্শন। দুনিয়ার প্রয়োজনের আয়োজনে আখেরাতের নেয়ামত থেকে ক্ষণিকের জন্যে হলেও মাহরুম থাকার লক্ষণ, তাই হে রসূল! আপনি তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। এতে আরো একটি কথা প্রমাণিত হয় তা হলো, দুনিয়ার কাজকে আখেরাতের লাভের উপর প্রাধান্য দেয়ার একটি দৃষ্টান্ত কায়েম হয়। আর এজন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতের শানে নজুল সম্পর্কে বলেছেন, জুমার দিন যখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খোতবা প্রদানের জন্যে মিম্বরের দিকে গমন করতেন, তখন কোন কোন লোক তাঁর সম্মুখে এসে দন্ডায়মান হতো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এ সত্য উপলব্ধি করতেন যে সে বিদায় হবার জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করছে। তখন তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে অনুমতি দান করতেন।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, জুমার দিন (খোতবার সময়) ইমামের তরফ থেকে হাত দ্বারা ইংগিত করাই অনুমতির জন্যে যথেষ্ট।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, মুসলমানদের যাবতীয় সামাজিক ও জাতীয় কর্মের সম্পর্কে এটিই হল বিধান, এমন কোন কাজের জন্যে যখন সকলে জমায়েত হয়,

তখন ইমাম বা নেতার অনুমতি ব্যতীত জমায়েত ছেড়ে যাওয়া উচিত নয়। আর কেউ যদি নিতান্ত প্রয়োজনে যাওয়ার জন্যে অনুমতি **চায়,** তবে দেয়া বা না দেয়া ইমামের এখতিয়ারভুক্ত। তবে মসজিদে কেউ যদি হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ে এমন পরিস্থিতিতে ইমাম থেকে অনুমতি গ্রহণ অবশ্য কর্তব্য নয়।

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

রসূলের আহবানকে তোমাদের একে অন্যকে ডাকার ন্যায় মনে করোনা।

আবু নাইম দালায়েলে জাহ্যাক (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে গ্রাম্য লোকেরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে يا محمد يا ابا القاسم বলে ডাকতো। তখন এ আয়াত নাজিল হয় এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ডাক দেয়ার আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যেভাবে তোমরা একে অন্যকে ডাক এভাবে তোমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ডাক দিওনা; বরং

يا رسول الله

(হে আল্লাহর রসূল!) বলে ডাক দিও। যাতে করে তাঁর প্রতি আদব রক্ষা করতে পার। যেমন অন্য আয়াতে তাঁর প্রতি আদব রক্ষার্থে হুকুম হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ ....

হে মোমেনগণ! নবীর সম্মুখে তোমরা উচ্চস্বরে কথা বলোনা, এতেও তাঁর মজলিসের আদব রক্ষার তাগিদ রয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে এমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদব রক্ষার্থে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেন, তোমাদের নিজেদের পরস্পরের ডাক এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ডাকের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যখন কোন ব্যাপারে তিনি তোমাদেরকে আহবান করেন তবে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে হাজির হও। আর এ কথা মনে করোনা যে রসূলের আহবানও তেমনি, যেমন তোমরা একে অন্যকে ডাক। একে অন্যের ডাকে যদি মন চায় যাওয়া হয়, আর মন না চায় যাওয়া হয় না, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ডাকলে কখনও যেন এমন না হয়। এমনিভাবে যখন তাঁর দরবারে

তোমরা হাজির হও তখন ইচ্ছা হলেই অনুমতি ব্যতীত তাঁর দরবার থেকে বের হওয়া বৈধ নয়; বরং যখন বের হওয়ার একান্ত প্রয়োজন হয় তবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুমতি সাপেক্ষেই বের হতে পারে।

বস্তুতঃ এভাবে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক মানব জাতিকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারের আদব শিক্ষা দিয়েছেন, কিভাবে তাঁকে ডাকতে হবে? কিভাবে তাঁর সাথে কথা বলতে হবে? এ সব আদব কায়দা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারের আদব রক্ষা না হয়, তবে যাবতীয় নেক আমল বাতিল হওয়ার আশংকা রয়েছে বলেও সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হল তোমরা আল্লাহর রসূলকে অসন্তুষ্ট করোনা এবং তাঁর বদদোয়াকে সর্বদা ভয় কর, তাঁর বদদোয়া অন্যদের বদদোয়ার ন্যায় নয়।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতের আরও একটি অর্থ হল, তোমরা আল্লাহর রসূলের দোয়াকে নিজেদের পরস্পরের দোয়ার ন্যায় মনে করোনা। তাঁর দোয়া সর্বদা কবুল হয়। খবরদার! কখনও তোমরা তাঁকে কষ্ট দিওনা, যদি কোন কারণে তাঁর জবান মোবারক থেকে কোন বাক্য বের হয়ে যায় তবে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।১

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا

তোমাদের মধ্যে যারা চুপি চুপি সরে পড়ে আল্লাহ পাক তাদেরকে ভাল ভাবেই জানেন।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বলেছেন, মোনাফেকরা জুমার দিন খোতবার সময় বসে থাকা কষ্টদায়ক মনে করতো। এজন্যে তারা লোকচক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে আড়ালে আড়ালে চম্পট দেয়ার চেষ্টা করতো। আর কখনও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ডাক দিলে তাঁর মহান দরবারে হাজির হওয়ার ব্যাপারে তাদের যেন মরণ আসতো। তাই কিভাবে ফাঁকি দিয়ে গা ঢাকা দেবে তার জন্যে অজুহাত খুঁজতো। আল্লাহ পাক এ আয়াতে তাদের সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ করেছেন যে তোমরা মানুষকে ফাঁকি দিতে পার, তাদের দৃষ্টি এড়াতে পার, মানুষকে প্রতারণা করতে পার, কিন্তু আল্লাহ পাকের নিকট তোমাদের কোন কৃতকর্মই গোপন নেই, তোমাদের কোন আচরণই তাঁর অজানা নয়। অতএব,

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা -৪১৯

তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬৬

তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৮, পৃষ্ঠা-৮৫

তোমাদের ভয় করা উচিত আল্লাহ পাককে এবং তাঁর বিধি-নিষেধকে পালন করা উচিত আন্তরিকভাবে। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

অতএব, যারা আল্লাহ পাকের হুকুমের বিরোধিতা করে তাদের ভয় করা উচিত, তাদের উপর কোন বিপদ আপদ আপতিত হতে পারে, অথবা আসতে পারে তাদের উপর কোন মর্মান্তিক আযাব। এ আয়াতে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে সে সব লোকদের উদ্দেশ্যে, যারা আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধকে অমান্য করে। তাদের উপর যে কোন বিপদ আপদ আপতিত হতে পারে। অথবা কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের জন্যে আসতে পারে। বর্তমান পৃথিবীতে প্রলয়ংকরী বন্যা, ভূমিকম্প সহ যে সব প্রাকৃতিক দূর্যোগ বিভিন্ন দেশে হতে দেখা যায় তার একমাত্র কারণ হল আল্লাহ পাকের নাফরমানী এবং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদর্শচ্যুতি। ইতিহাস সাক্ষী! যখনই মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক দূর্গতি দেখা দিয়েছে তখনই প্রাকৃতিক দূর্যোগও এসেছে। হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগের প্রলয়ংকরী বন্যা থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত পৃথিবীর বহু দেশে এমন বিপদ যুগে যুগে দেখা দিয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এমন বিপদ-আপদের সম্পর্কেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আসমান জমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ পাকের।

আল্লাহ পাকই সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান।

যিনি আসমান জমীনের স্রষ্টা ও পালনকর্তা, যিনি বিশ্ব প্রতিপালক, যাঁর একটি আদেশের বহিঃপ্রকাশ হয়েছে বিশ্বজগতের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে, তাঁর নিকট পৃথিবীর কোন কিছুই গোপন নেই, সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির তিনি অধিকর্তা, সব কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, কর্তৃত্বাধীন। অতএব, মোনাফেকেরা যত প্রতারণাই করুক না কেন, আর মানুষের কাছে যত গোপনই থাকুক না কেন, আল্লাহ পাকের নিকট কিন্তু তাদের কোন কিছুই গোপন নেই। তারা যেন একথা ভালভাবে জেনে রাখে যে অবশেষে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে প্রত্যেকটি মানুষকে হাজির হতে হবে।

قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ

অর্থাৎ তোমাদের কার কি আকীদা বিশ্বাস, কে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি খাঁটি বিশ্বাসী আর কে মোনাফেক, প্রতারক সবই তিনি জানেন, সব কিছুই রয়েছে তাঁর নখদর্পনে।

وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ

যেদিন তারা আল্লাহ পাকের দরবারে ফিরে যাবে সেদিন তিনি তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করবেন। যদি ঈমানের সঙ্গে নেক আমল করে থাকে, তবে তার পুরস্কার সুনিশ্চিত। পক্ষান্তরে, যদি ঈমান ও নেক আমল না থাকে বরং অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ অবস্থায় জীবন অতিবাহিত হয়ে থাকে তবে কঠোর কঠিন শাস্তি অবধারিত।

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাকের বিশাল ক্ষমতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে তিনি নিখিল বিশ্বের একচ্ছত্র ক্ষমতার মালিক, তাঁর আধিপত্য সর্বত্র চির বিরাজমান। আর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে তিনি মহাজ্ঞানী, সব কিছু সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ জ্ঞাত, হিমালয়ের উচ্চ শিখরে ক্ষুদ্রতম যে প্রানীটি বর্তমান রয়েছে, এমনিভাবে আটলান্টিকের অতল তলে যা কিছু রয়েছে এর কোন কিছুই তাঁর আগাচরে নেই, তাই মানুষের যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত, তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান।

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ১-১১-৯৩ইং মোতাবেক ২৬শে জমাদিউল আউয়াল ১৪১৪ হিজরী, রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১.০০ টায় আল্লাহ পাকের রহমতে সূরায়ে নূরের তফসীর সুসম্পন্ন হলো। হে আল্লাহ! এই সাধনাকে কবুল কর, তফসীরে নূরুল কোরআনকে সম্পূর্ণ করার তওফিক দান কর। আমাদের অন্তরকে ঈমানের নূর দ্বারা আলোকিত কর।

اللهم نور قلوبنا بالايمان والاحسان ونور قبورنا

واتمم لنا نورنا واغفرلنا فانك انت الغفور الرحيم

সূরায়ে ফোরকান রুকু—৬, আয়াত—৭৭

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ পাকের নামে আরম্ভ করছি।

سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ سَبْعٌ وَّسَبْعُوْنَ اٰيَةً وَّسِتُّ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۙ﴿۱﴾

الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ

لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ﴿۲﴾

তরজমা

(১) কত মহান, মহিমময় তিনি, যিনি বিশ্ববাসীকে সতর্ক করার জন্যে তাঁর বান্দার প্রতি ফোরকান নাজিল করেছেন।

(২) আসমান জমীনের সার্বভৌমত্বের যিনি অধিকারী, তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন শরীক নেই, তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, এবং প্রত্যেককে পরিমাপ করে ঠিক করে দিয়েছেন।

সূরায়ে ফোরকান প্রসঙ্গে

পূর্ববর্তী সূরার শেষে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

يَعْلَمُ مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ

তিনি ভালভাবেই জানেন যে অবস্থায় তোমরা আছ অর্থাৎ তোমাদের আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত। এরপর এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, যেদিন তোমরা আল্লাহ পাকের নিকট ফিরে আসবে, সেদিন তোমাদেরকে অবহিত করা হবে তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে। এতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে কাফেরদের উদ্দেশ্যে, তাই এ সূরার শুরুতে এরশাদ হয়েছেঃ تَبَارَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ

কত মহান, মহিমময় তিনি, যিনি বিশ্ববাসীকে সতর্ক করার জন্যে তাঁর বান্দার প্রতি পবিত্র কোরআন নাজিল করেছেন যা সত্য অসত্যের মধ্যে পার্থক্য করে দেয়।

এ সূরা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় হিজরতের পূর্বে এমন সময় নাজিল হয়েছে যখন আরবের কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করছিল, তারা ছিল গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অন্যায়-অনাচার, জুলুম-অত্যাচার এক কথায় যাবতীয় পাপাচারে লিপ্ত, তারা এ কথা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিলনা যে আল্লাহ পাক এমন এক ব্যক্তির উপর তাঁর মহান বাণী নাজিল করেছেন, যিনি তাঁর জীবনের চল্লিশটি বসন্ত তাদেরই মাঝে অতিবাহিত করেছেন, এ কথাটি তাদের নিকট যেমন বিস্ময়কর ছিল, তেমনি ছিল অবিশ্বাস্য। অথচ এটিই ছিল দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং চিরসত্য। পৌত্তলিকরা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিলনা, তাদের হাতে বানানো মূর্তিই ছিল তাদের উপাস্য, মিথ্যা ছিল তাদের নিকট প্রিয়। আর সত্য ও সুন্দর ছিল তাদের নিকট অপ্রিয়, এমনি অবস্থায় আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি সূরায়ে ফোরকান নাজিল করেছেন। যেহেতু পবিত্র কোরআনই সত্য-অসত্য, হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করে দেয়, তাই আলোচ্য আয়াতে পবিত্র কোরআনকে ফোরকান বলা হয়েছে, আর যেহেতু এ সূরায় হক্ব ও বাতিল সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে এবং সত্য-অসত্যের মধ্যে বিশেষ ভাবে পার্থক্য দেখিয়ে দেয়া হয়েছে, তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে ফোরকান। এ সূরায় তৌহিদ, রেসালত এবং কেয়ামত সম্পর্কীয় বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার পাশাপাশি যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়তকে অস্বীকার করত, তাদের যাবতীয় সন্দেহ খন্ডন করা হয়েছে। ইতিপুর্বে বিভিন্ন যুগে প্রেরিত আম্বিয়ায়ে কেরামকে যারা অস্বীকার করেছে এবং তাঁদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করেছে, তাদের ভয়াবহ পরিণামের উল্লেখও করা হয়েছে এ আয়াতে, যাতে করে পবিত্র কোরআনকে যারা অস্বীকার করে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়তকে যারা অবিশ্বাস করে, তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং শেরক বা পৌত্তলিকতা থেকে বিরত থাকে।১

এবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে এ সূরা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে।১

এ সূরা প্রসঙ্গে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ সূরায় বিশেষভাবে তৌহিদ, রেসালত এবং কেয়ামতের কঠিন দিনের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, এর পাশাপাশি নেককার মোমেনদের কিছু বৈশিষ্ট্যও বর্ণিত হয়েছে।২

১। তফসীরে হাক্কানী, পারা-১৮, পৃষ্ঠা -৪৯ ২। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬৮

আল্লামা আলুসী বোগদাদী (রঃ) এ সূরা সম্পর্কে লিখেছেন, অধিকাংশ তফসীরকারগণ একমত যে এ সূরা মক্কায় নাজিল হয়েছে।

ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন, তিন আয়াত ব্যতীত সাতাত্তর আয়াত বিশিষ্ট এ সূরা খানি মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় অবতীর্ণ হয়েছে। ঐ তিন আয়াত মদীনা মোনাওয়ারায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর জাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, এ সূরার প্রথমাংশ মক্কা শরীফে নাজিল হয়েছে, আর অবশিষ্টাংশ মদীনা মোনাওয়ারায় অবতীর্ণ হয়েছে।১

তফসীরুল কোরআন

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۝١

অত্যন্ত বরকতময়, মহা মহিম সেই আল্লাহ পাক যিনি তাঁর বন্দা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী পবিত্র কোরআন অল্প অল্প করে নাজিল করেছেন বিশ্ববাসীকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে।

তফসীরকারগণ লিখেছেন যে تبارك শব্দটি শুধু আল্লাহ পাকের জন্যেই ব্যবহৃত হয় কেননা, অধিকতর বরকত, সার্বিক কল্যাণ শুধু আল্লাহ পাকেরই দান।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ শব্দটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, যাবতীয় বরকত এবং কল্যাণ আসে শুধু আল্লাহ পাকের তরফ থেকে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ)ও আলোচ্য শব্দটির এ ব্যাখ্যাই করেছেন। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী এ শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, তিনি তাঁর গুণাবলীতে সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি সর্বোচ্চ স্থানে আসীন, যেহেতু এ শব্দটি অধিকতর বরকত অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাই জাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো যিনি শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, যিনি মহান মহিমময়।

الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ

তিনিই তাঁর বান্দা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি (ধীরে ধীরে) অল্প অল্প করে পবিত্র কোরআন নাজিল করেছেন। পবিত্র কোরআনকে আলোচ্য আয়াতে ফোরকান বলার দু'টি কারণ রয়েছেঃ

(এক) পবিত্র কোরআনই এমনি একটি গ্রন্থ, যা ন্যায়-অন্যায়, হক্ব ও বাতিলের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য করে দেয়, এ মহান গ্রন্থই আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম

১। তফসীরে রুহুল মা'আনী, খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা-২৩০

কুদরত হেকমত, তাঁর মহিমা, তাঁর দয়া মায়া সহ অন্যান্য গুণাবলীর বিবরণ উপস্থাপিত করে, আর পবিত্র কোরআনেই রয়েছে মানব জাতির হেদায়েত লাভের মহান শিক্ষা।

(দুই) সমগ্র পবিত্র কোরআনকে এক সঙ্গে নাজিল করা হয়নি, বরং বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রেক্ষিতে, অল্প অল্প করে নাজিল করা হয়েছে। তাই কোরআনে করীমকে ফোরকান বলা হয়েছে।

প্রিয়নবী (দঃ) একমাত্র কামেল বন্দা

على عبده (তাঁর বান্দার প্রতি) এ শব্দটিও এ পর্যায়ে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। عبد শব্দের অর্থ বন্দা। আল্লাহ পাক এ স্থলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে এ শব্দটি ব্যবহার করে তাঁর উচ্চ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন কেননা, সমগ্র মানব জাতিই আল্লাহর বান্দা, তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা হলেন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তিনি যে পরিপূর্ণ, খাঁটি এবং কামেল বান্দা তার পরিচয় রয়েছে এ শব্দটিতে, তিনি যে আল্লাহ পাকের সর্বাধিক বন্দেগী করেছেন এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তাঁর বন্দেগীই যে সর্বাধিক পছন্দনীয় হয়েছে, এ কারণেই তাঁকে এ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় হল এই, সমগ্র কোরআনে করীমে অনেক নবী রসূলগণের উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু এই উপাধি আল্লাহ পাক একমাত্র প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন।

যদিও হযরত ঈসা (আঃ)-এর সম্পর্কেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তবে তা প্রত্যক্ষভাবে নয়; বরং পরোক্ষভাবে, হযরত ঈসা (আঃ) নিজের মুখে এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। পবিত্র কোরআনের অন্যত্রও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে আল্লাহ পাক এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যেমন সূরায়ে বণী ইসরাঈলের প্রথম আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

سُبْحَانَ الَّذِىٓ أَسْرٰى بِعَبْدِهٖ

এ আয়াতে ইতিহাসিক মেরাজের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। মানব জাতির ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনার বিবরণেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে عبد বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাই আল্লাহ পাকের প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ বন্দা তিনিই। আল্লাহ পাকের বন্দেগীর হক্ব তিনিই আদায় করেছেন, তাই তিনি কামেল বন্দা। আর তিনিই মানব জাতিকে আল্লাহ পাকের বন্দেগীর জন্যে সর্বাধিক

অনুপ্রাণিত করেছেন, তাই এটি শুধু তাঁরই বৈশিষ্ট্য।

لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا

যেন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে পথ-প্রদর্শক হন, অথবা এর অর্থ হল আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ পবিত্র কোরআন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে পথ-প্রদর্শক হয়।

সূরায়ে ফোরকানে যেহেতু অবাধ্য, কাফেরদের সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, এবং তাদের শোচনীয় পরিণামের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তাই আলোচ্য আয়াতে শুধু نذيرا (ভয় প্রদর্শক) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মোমেনদের জন্যে সুসংবাদ দাতা এবং কাফেরদের জন্যে ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে আগমন করেছেন, এমনিভাবে, পবিত্র কোরআনে মোমেনদের উদ্দেশ্যে সুসংবাদ এবং কাফেরদের জন্যে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে।

আলোচ্য বাক্যাংশের للعالمين শব্দটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত ও রেসালত সর্বকালের সকল মানব এবং জ্বীন জাতির জন্যে। তাঁর পূর্বে এ উচ্চতর মর্যাদা আর কোন নবী রসূলকে প্রদান করা হয়নি। হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে রয়েছে বিশেষ ঘোষণা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার পূর্বে যত নবী রসূল প্রেরিত হয়েছেন, তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়ের নিকটই প্রেরিত হয়েছেন, আর আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সমগ্র মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে। যেমন পবিত্র কোরআনেও আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

হে রসূল! আপনি ঘোষণা করুন, হে মানব জাতি! আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহর তরফ থেকে রসূল হিসেবে আগমন করেছি। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শুধু নবী নন, বরং বিশ্বনবী এবং শুধু তাঁর যুগের জন্যে নবী নন, বরং সর্বকালের সকল মানুষ ও জ্বীনের জন্যে তিনি নবী ও রসূল।

اِلَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ সেই আল্লাহ পাক যিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে

বিশ্বনবী করে প্রেরণ করেছেন, তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য হল বিশাল বিস্তৃত এই আসমান ও জমীনে তাঁরই একচ্ছত্র আধিপত্য ও মালিকানা রয়েছে, আসমান জমীনের স্রষ্টাও তিনি, মালিকও তিনিই। এর সব কিছুই তাঁর কর্তৃত্বাধীন।

وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا

মহান আল্লাহ পাকের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি নিজের জন্যে কোন সন্তান গ্রহণ করেননি; (যেমন খ্রীষ্টানরা এ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে যে হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ পাকের পুত্র (নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক)।

মূলতঃ আল্লাহ পাক সকল দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত; সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর কোন দৃষ্টান্তও নেই। অতএব, সন্তান গ্রহণের দুর্বলতা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে।

وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ

তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন শরীক নেই। যেমন, অগ্নিপূজকরা এ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে। তারা বলে, দু'জন স্রষ্টা রয়েছেন, একজন কল্যাণের, আরেকজন অকল্যাণের। কল্যাণের স্রষ্টাকে তারা 'ইয়াজদান' বলে, আর অকল্যাণের স্রষ্টাকে 'আহরামান' বলে (নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক)।

এ আয়াতাংশে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, আল্লাহ পাকের ক্ষমতায়, তাঁর আধিপত্যে কোন শরীক নেই, তিনি এক, অদ্বিতীয়, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ

আল্লাহ পাকই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, সব কিছুকে তিনিই অস্তিত্ব দান করেছেন।

فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا

এবং প্রত্যেককে পরিমাপ করে ঠিক করে দিয়েছেন।

অর্থাৎ প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে আল্লাহ পাক একটি নির্ধারিত পরিমাপে সৃষ্টি করেছেন। যে উদ্দেশ্যে যাকে সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে প্রয়োজনীয় গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্যও দান করেছেন। প্রত্যেক সৃষ্টির জন্যে আল্লাহ পাক যে সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তার বাইরে যাওয়ার কোন ক্ষমতা কারোই নেই। প্রত্যেক সৃষ্টির প্রতি অর্পিত কর্তব্য পালনে অবহেলা করারও কোন সুযোগ কারো নেই।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) আলোচ্য বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, সৃষ্টি মাত্রেরই উদ্দেশ্য মোতাবেক আল্লাহ পাক তাঁর মধ্যে যোগ্যতা দান করেছেন। যেমন মানুষকে দান করেছেন ধী-শক্তি।

অথবা এ বাক্যটির অর্থ হলো, প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক প্রত্যেক সৃষ্টির জন্যে পৃথিবীতে তার অবস্থানকাল, কার্যক্রম এবং তার রিজিক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهٖٓ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُونَ
وَلَا يَمْلِكُونَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا
وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُورًا ﴿٣﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ
اِفْكُ ِۨافْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚ فَقَدْ جَآءُوْ
ظُلْمًا وَّزُوْرًا ﴿٤﴾ وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ
تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ﴿٥﴾ قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٦﴾

তরজমা

(৩) আর তারা তাঁর পরিবর্তে উপাস্য স্বরূপ গ্রহণ করেছে অপরকে, যারা কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারেনা, বরং তারা নিজেরাই অন্যের সৃষ্টি, তাদের নিজেদের ভাল-মন্দের উপর তাদের কোন অধিকার নেই এবং জীবন-মৃত্যু ও পুনরুত্থানের উপরও তাদের কোন ক্ষমতা নেই।

(৪) আর কাফেররা বলে, এটি এক মিথ্যার ঝড় ব্যতীত আর কিছুই নয়, নিজেই তা এনেছেন এবং অন্যান্য লোকেরা তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে। এভাবে তারা অবশ্যই জুলুম ও মিথ্যায় উপনীত হয়েছে।

(৫) আর তারা আরো বলে, এসব হলো প্রাচীন কালের উপকথা যা তিনি

লিখিয়ে রেখেছেন, সকাল সন্ধ্যা তাঁই তাঁর নিকট লিখিত হয়ে থাকে।

(৬) (হে রসূল!) আপনি বলুন, যিনি আসমান জমীনের যাবতীয় রহস্য সম্পর্কে অবগত, তিনিই তা (পবিত্র কোরআন) নাজিল করেছেন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের এবং মাহাত্মের কথা ঘোষণা করেছেন। তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনিই নিখিল বিশ্বের একমাত্র অধিপতি, তিনিই সর্বগুণাকর, সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান। অনন্ত অসীম করুণাময় তিনি, তাঁর জ্ঞানের শেষ নেই, তাঁর ক্ষমতার কোন সীমা-পরিসীমা নেই, কিন্তু এতদসত্ত্বেও অপরিণামদর্শী লোকেরা তাঁর পরিবর্তে তাদের হাতে বানানো মূর্তিকে উপাস্য বানাবার ধৃষ্টতা দেখায়, তাই আলোচ্য আয়াতে তাদের অন্যায় আচরণ ও মূর্খতার কথা বর্ণিত হয়েছে। এরশাদ হয়েছে,

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ

আর তারা তাঁর পরিবর্তে উপাস্য স্বরূপ গ্রহণ করেছে অপরকে যারা কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারেনা, বরং তারা নিজেরাই অন্যের সৃষ্টি।

অর্থাৎ মক্কার কাফেররা সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের পরিবর্তে এমন কিছুকে উপাস্য বলে গ্রহণ করেছে যাদের কোন কিছু সৃষ্টি করার আদৌ কোন ক্ষমতাই নেই। অন্য কিছুকে সৃষ্টি করার তো প্রশ্নই ওঠেনা; বরং তাদের নিজেদের অস্তিত্ব পর্যন্ত অপরের দান। যারা তাদের পূজারী, তারাই তাদের উপাস্যগুলোর প্রস্তুতকারী।

وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا

দ্বিতীয়তঃ এই তথাকথিত উপাস্যরা তাদের ভক্ত পূজারীদের ভাল-মন্দ কিছুই করার ক্ষমতা রাখেনা এমনকি, নিজেদের ভাল-মন্দ কিছু করার ক্ষমতাও তাদের নেই, একটি মাছির ডানা পর্যন্ত যেমন তারা সৃষ্টি করতে পারেনা ঠিক তেমনিভাবে তারা এত অক্ষম, অসহায় যে তাদের উপর একটি মাছি এসে বসলে তাকে তাড়াতেও তারা হয় অপারগ।

وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ③

এবং জীবন-মৃত্যু ও পুনরুত্থানের উপরও তাদের কোন ক্ষমতা নেই অর্থাৎ কাফেরদের এই উপাস্যরা এত অপদার্থ যে কাউকে জীবনও দিতে পারেনা, কারো মৃত্যুও ঘটাতে পারেনা আর পরকালে পুনরুত্থান তো তাদের কল্পনাতীত ব্যাপার। এতদসত্ত্বেও মানুষ কোন্ বুদ্ধিতে, কোন্ যুক্তিতে এমন অসহায় বস্তুকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে? ১

মূলতঃ সৃষ্টি করা এবং মৃত্যুমুখে পতিত করা এবং শিংগার এক ফুঁকে সমগ্র মানব জাতিকে পুনর্জীবন দিয়ে কেয়ামতের ময়দানে উপস্থিত করা এক আল্লাহ পাকেরই কাজ, আর কারো নয়। তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রিজিকদাতা, তিনিই সকলের এবাদতের একমাত্র হক্বদার।১

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ ِۨافْتَرٰىهُ

আর কাফেররা বলে, এটি এক মিথ্যার ঝড় ব্যতীত আর কিছুই নয়, নিজেই তা এনেছেন এবং অন্যান্য লোকেরা তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে।

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের একটি মূর্খতার কথা বলা হয়েছে, আর সেই মূর্খতা ছিল স্বয়ং আল্লাহ পাক সম্পর্কে। আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের আরো একটি মূর্খতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের এ মূর্খতা হলো সাইয়্যেদুল মুরসালীন, খাতেমুন নাবিয়্যীন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে। কাফেররা বলতো যে পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের কালাম নয়, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কায়েকজন ইহুদীর সাহায্যে এ গ্রন্থটি রচনা করিয়েছেন এবং মানুষের মধ্যে তাকে আল্লাহর কালাম বলে প্রচার করছেন (নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক)।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا

(এবং কাফেররা বলে)

আলোচ্য আয়াতের এ বর্ণনা শৈলী এ কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে যে যারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করেনা, তারা যেমন কাফের, ঠিক তেমনি যারা প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতে বিশ্বাস করেনা, তারাও কাফের। কোন ব্যক্তি আল্লাহ পাককে মানে অথচ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল, একথা মানেনা, সে-ও মোমেন হয়না। আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনা মোমেন হওয়ার জন্যে পূর্বশর্ত।

১। তফসীরে কবীর, খন্ড- ২৪, পৃষ্ঠা-৪৮

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৮, পৃষ্ঠা-৮৮

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, আবদুল কায়েস গোত্রের একটি প্রতিনিধি দলের ব্যাপারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমরা কি জান এক আল্লাহকে মেনে নেয়ার তাৎপর্য কি? প্রতিনিধি দল বললেন, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলই এ সম্পর্কে জানেন। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের রসূল, এ কথার সত্যতার প্রতি স্বাক্ষ্য প্রদান করাই হলো আল্লাহ পাককে মেনে নেয়ার তাৎপর্য।

إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ إِفْكٌ

এটি মিথ্যার ঝড় ব্যতীত আর কিছুই নয়।

هَٰذَآ

অর্থাৎ কাফেররা বলে, এই কোরআন যা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পেশ করছেন, তা মিথ্যা ব্যতীত আর কিছুই নয়। হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজেই তা কয়েকজন লোকের সাহায্যে রচনা করেছেন।

وَأَعَانَهُۥ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ

আর এ কাজে অন্য কিছু লোক সাহায্য করেছে।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে قَوْمٌ অর্থ ইহুদীদের একটি দল। হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, একজন হাবশী গোলাম ছিল, তার নাম ছিল ওবায়েদ এবনুল হাসার। সে গণক ছিল। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, মক্কায় তদানীন্তন কালে কয়েকজন গোলাম ছিল তাদের নাম হলো যবর, ইয়াসার আদাস, মুশরেকরা মনে করতো, তারাই পবিত্র কোরআন রচনা করার ব্যাপারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করতো (নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক)।

فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا ④

নিঃসন্দেহে তারা অত্যন্ত অন্যায় এবং মিথ্যা কথা বলেছে।

وَقَالُوٓا۟ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ

আর কাফেররা বলেছে এসব হলো প্রাচীন কাহিনী। নজর এবনে হারেস নামক এক কাফের এ কথাটি বলতো।

اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তা লিখিয়ে নিয়েছেন, সকাল সন্ধ্যায় তাঁকে তা শোনানো হতো।

قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

কাফেরদের এ ভিত্তিহীন কথার জবাবেই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ হে রসূল! আপনি বলুন, কাফেরদের এ মন্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অমূলক এবং বানোয়াট। পবিত্র কোরআন কোন মানুষের কথা নয়; মানুষ যত জ্ঞানী-গুণীই হোক না কেন, এমন বিস্ময়কর কালাম রচনা করা মানুষের সাধ্যাতীত। এটি সেই মহান আল্লাহ পাকের কালাম যিনি আসমান জমীনের সকল রহস্য সম্পর্কে অবগত, যিনি মানুষের স্রষ্টা ও পালনকর্তা, যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি মহাজ্ঞানী, যিনি মানুষের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সব কিছুই পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করেছেন। পবিত্র কোরআনে এমন দুর্লভ, দুর্ভেদ্য রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যা মানুষের কল্পনাতীত।

অতএব, পবিত্র কোরআন সম্পর্কে এমন উদ্ভট মন্তব্য করা কারোর জন্যেই উচিত নয়।

إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

অর্থাৎ এই কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং পবিত্র কোরআন সম্পর্কে যে আপত্তিকর মন্তব্য করেছে তার জন্যে কঠিন কঠোর শাস্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে এবং তাদের উপর আযাব আপতিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে, 'কিন্তু যেহেতু আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান, তাই তাদের প্রতি তিনি আযাব নাজিল করেন না, তথা তাদের জন্যে নির্দিষ্ট আযাবকে তরান্বিত করেন না।

وَقَالُوْا
مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ ط
لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا ﴿٧﴾ اَوْ يُلْقٰٓى
اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ
اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ﴿٨﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ
الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ﴿٩﴾ تَبٰرَكَ الَّذِيْٓ
اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ﴿١٠﴾ بَلْ كَذَّبُوْا
بِالسَّاعَةِ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿١١﴾

তরজমা

(৭) তারা বলে, এ কেমন রসূল? আমাদের ন্যায় পানাহার করে, হাটে-বাজারে চলাফেরা করে, তাঁর নিকট কোন ফেরেশতা কেন অবতীর্ণ করা হলো না যে তাঁর সঙ্গে ভয় প্রদর্শনকারী রূপে থাকত।

(৮) অথবা তাঁকে বিরাট ধন-ভান্ডার কেন দেয়া হয় না, কিংবা তাঁর নিকট কোন বাগান নেই কেন? যা থেকে তিনি আহার সংগ্রহ করতে পারেন, পাপীষ্ঠরা আরো বলে, তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করে বসেছো।

(৯) (হে রসুল!) লক্ষ্য করুন, তারা আপনার কি উপমা দেয়, তারা হয়েছে পথভ্রষ্ট, তারা আর কখনো সঠিক পথ পাবেনা।

(১০) কত মহান তিনি, যিনি ইচ্ছা করলে (হে রসূল!) আপনাকে দান করতে পারেন এর চেয়ে উত্তম বাগান, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নির্ঝরমালা এবং তিনি তৈরী করে দিতে পারেন আপনার জন্যে প্রাসাদ সমূহ।

(১১) কিন্তু তারা কেয়ামতকে অস্বীকার করেছে, আর যে কেয়ামতকে অস্বীকার করে, আমি তার জন্যে তৈরী করে রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নি।

তফসীরুল কেরাআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহের ন্যায় এ আয়াতেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের ব্যাপারে কাফেরদের কয়েকটি প্রশ্নের উল্লেখ করা হয়েছে, কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়তে বিশ্বাস করতনা, তাই বিভিন্ন সময় নতুন নতুন প্রশ্নের অবতারণা করত। এরশাদ হয়েছেঃ

وَقَالُوا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ ط

আর তারা বলে, এই রসূলের কি হয়েছে, তিনি তো আমাদের ন্যায় পানাহার করেন, হাটে-বাজারে ঘোরাফেরা করেন, এমন ব্যক্তি আল্লাহর রসূল কি করে হবেন? আমরাও খাওয়া-দাওয়া করি, হাটে-বাজারে আসা-যাওয়া করি, তিনি এ প্রয়োজনের উর্দ্ধে নন, তাহলে আমাদের এবং তাঁর মধ্যে পার্থক্য কোথায়? যদি কোন পার্থক্যই না থাকল, তাহলে তাঁকে কিভাবে আল্লাহর রসূল মেনে নেব? যদি তিনি সত্যি-সত্যি আল্লাহর রসূল হতেন, তবে জীবিকা উপার্জনের ঝঞ্চাট থেকে মুক্ত থাকতেন, ফেরেশতাদের ন্যায় খাওয়া-দাওয়ারও কোন প্রয়োজন থাকত না।

لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا ۝٧

তাঁর নিকট কোন ফেরেশতা কেন অবতীর্ণ হয়নি যিনি ভয় প্রদর্শক হিসেবে থাকতেন এবং মানুষকে ভয় প্রদর্শন করতেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে তাঁর নবুওয়তের দাবীর সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ হাজির থাকতেন এবং লোকেরাও ঐ ফেরেশতার ভয়ে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতো।

اَوْ يُلْقٰٓى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّأْكُلُ مِنْهَا

আর যদি কোন ফেরেশতা অবরতণ নাই করেন তবে অন্ততঃ তাঁর নিকট কোন গায়েবী ধন-ভান্ডার থাকত আর তা তিনি মানুষকে দান করতেন, যদি তা-ও না হয়, তবে অন্ততঃ জীবিকা নির্বাহের ব্যাপারে তাঁর নিকট দু'একটি বাগানও যদি থাকত এবং সে বাগানের ফল তিনি আহার করতেন এবং জীবিকা নির্বাহের ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতেন, তাহলেও তো তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যেত।

وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ۝٨

এরপর ঐ পাপীষ্ঠরা মুসলমানদেরকে বলেছে যে তোমরা এমন এক ব্যক্তির অনুসরণ করছো, যার বুদ্ধিভ্রম ঘটেছে, অথবা তিনি যাদুগ্রস্ত হয়েছেন এমন অবস্থায় আমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনতে পারিনা।

اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ

হে রসূল! আপনি লক্ষ্য করুন, এ দূরাত্মা কাফেররা আপনার সম্পর্কে কত বাজে কথা বলছে, মূলতঃ তারা আপনাকে স্বীকার করতে পারছেনা, তাদের কু-প্রবৃত্তি এ ব্যাপারে তাদেরকে বাধা দিচ্ছে। অথচ আপনাকে না মানার কোন সংগত কারণও তারা খুঁজে পাচ্ছেনা, তাই কখনও একথা বলছে, কখনও অন্য কথা বলছে, কখনও আপনাকে তারা যাদুকর বলছে, কখনও কবি আর কখনও পাগলও বলছে, এসবই তাদের মতিভ্রমের পরিণতি।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এর দ্বারা একথা সুস্পষ্ট যে কাফেরদের কথায় অনেক গরমিল রয়েছে, যেহেতু তারা দিশেহারা, পথভ্রষ্ট, তাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কথা বলেছে। فضلوا প্রকৃত অবস্থা এই যে তারা সত্য পথ থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের সত্যতা উপলব্ধি করার যোগ্যতা তারা হারিয়ে ফেলেছে।

فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ۝٩

তাই তারা কখনো হেদায়েতের পথ পাবেনা, তাদের পরিণাম ভয়াবহ, তাদের কঠোর শাস্তি অবধারিত কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে হেদায়েতের পথ অনায়াসে তারা লাভ করতে পারত এবং দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের সাফল্য তাদের দোরগোড়ায় এসেছিল, কিন্তু তারা তা হেলায় হারিয়েছে, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের সৌভাগ্যকে তারা নিজেরাই দুর্ভাগ্যে পরিণত করেছে। নবী পানাহার করেন কি-না, এটি নবুওয়তের সত্যতার প্রমাণ নয়, তাদের কর্তব্য ছিল নবুওয়তের সত্যতার প্রমাণ দেখে নবীর প্রতি ঈমান আনা। নবী সর্বদাই মানুষ হন, জ্বীনও নন ফেরেশতাও নন। নবী নিস্পাপ হন, নবীর প্রতি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ওহী অবতীর্ণ হয় এবং নবীর সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহ পাক তাঁকে অলৌকিক ক্ষমতা বা মোযেজা দান করেন। এসব কিছুই প্রিয়নবী হযরত রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট ছিল, কিন্তু যারা ভাগ্যাহত, তারা সত্য পথ গ্রহণ করেনি, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করে নিজেদেরকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছে।

تَبٰرَكَ الَّذِيْٓ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا ...

কত মহান তিনি, যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে দান করতে পারেন এর চেয়ে উত্তম বাগান যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নির্ঝরমালা এবং তিনি তৈরী করে দিতে পারেন আপনার জন্যে প্রাসাদ সমূহ।

শানে নজুল

এবনে জরীর এবং এবনে হাতেম ও এবনে আবি শায়বা হযরত খায়সামা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলা হয়েছে, হে রসূল! যদি আপনি ইচ্ছা করেন তবে আমি আপনাকে পৃথিবীর সম্পদ এবং গায়েবী ভান্ডারের চাবি সমূহ দান করি আর আখেরাতে আপনার জন্যে যে অনন্ত অসীম নেয়ামত রয়েছে, তা এ কারণে এতটুকু কম হবেনা। আর যদি আপনি ইচ্ছা করেন তবে আমি সেই নেয়ামতকে আখেরাতের নেয়ামতের সঙ্গে একত্রিত করে দিতে পারি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জবাব দিয়েছেন, আমি এখানে এ নেয়ামত চাইনা, আমার জন্যে আখেরাতে উভয় নেয়ামত একত্রিত করা হোক। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

تَبَارَكَ الَّذِيْ

(কত মহান তিনি, যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে দান করতে পারেন এর চেয়ে উত্তম বাগান।)

যেহেতু কাফেররা বলেছে, নিদেনপক্ষে যদি তাঁর নিকট একটি বাগানও থাকত এবং তার ফল-ফুলারী তিনি আহার করতেন এবং নিজের জীবিকার ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারতেন, তবুও না হয় আমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনতাম। কিন্তু কাফেররা জানেনা যে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ধন-ভান্ডার দান করার কথা বলেছেন, তিনি তা গ্রহণ করেননি।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে স্বর্ণের পাহাড় আমার সংগে চলমান থাকত। একজন ফেরেশতা আমার নিকট এসেছেন এবং বলেছেন, আপনার প্রতিপালক আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং এরশাদ করেছেনঃ আপনি ইচ্ছা করলে আপনাকে নবী এবং বন্দা করে রাখি, আর ইচ্ছা করলে আপনাকে নবী এবং বাদশাহ্ বানিয়ে দেই। আমি তখন জীব্রাঈলের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম, জীব্রাঈল আমাকে ইশারা করল, আপনি নিম্নগামী থাকুন। তখন আমি বললাম, আমি নবী এবং বন্দা থাকতে চাই। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এরপর থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন কিছুর উপর হেলান দিয়ে খাবার গ্রহণ করতেন না এবং বলতেন আমি গোলামদের ন্যায় আহার করি এবং গোলামদের ন্যায় বসি।

ইমাম আহমদ (রঃ) এবং ইমাম তিরমিজি (রঃ) হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

আল্লাহ পাক মক্কাকে আমার জন্যে স্বর্ণে রূপান্তরিত করার কথা বলেছিলেন কিন্তু আমি আরজ করেছি, হে আমার প্রতিপালক! আমি একদিন পেট ভরে খেয়ে তোমার শোকরগুজার হতে চাই, আর একদিন না খেয়ে সবর অবলম্বন করতে চাই।

যাহোক, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইচ্ছা করেই তাঁর জীবনের এ পথ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কাফেররা তা জানত না বলেই তাঁর দারিদ্র্যের প্রতি কটাক্ষ করে তারা আপত্তিকর মন্তব্য করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে।

প্রিয়নবী (দঃ)—কে সান্ত্বনা

আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেছেন, হে রসূল!

بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ

এই কাফেররা শুধু আপনাকে মিথ্যাজ্ঞান করেনি; বরং তারা মিথ্যাজ্ঞান করেছে কেয়ামতের কঠিন দিনকে, তাদের এ অন্যায়–অনাচারের এবং তাদের ধৃষ্টতা এবং দুষ্কৃতির কঠিন শাস্তি তারা কেয়ামতের দিন ভোগ করবে। তাই তাদের এসব আস্ফালন এবং অন্যায় অযৌক্তিক কথার প্রতি আপনি গুরুত্ব দেবেন না, কেননা, দোজখের কঠিন শাস্তি তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا

আর যে কেয়ামতকে অস্বীকার করে, আমি তার জন্যে আগুন তৈরী করে রেখেছি।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, سعير একটি দোজখের নাম। যারা কেয়ামতকে অস্বীকার করে, অবিশ্বাস করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে, তাদের জন্যে দোজখের কঠিন শাস্তি অবধারিত।

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ سَمِعُوا۟ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ⑫
وَإِذَآ أُلْقُوا۟ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا۟ هُنَالِكَ
ثُبُورًا ⑬ لَّا تَدْعُوا۟ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَٰحِدًا وَٱدْعُوا۟ ثُبُورًا
كَثِيرًا ⑭ قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِى وُعِدَ
ٱلْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَمَصِيرًا ⑮ لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ
خَٰلِدِينَ ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْـُٔولًا ⑯

তরজমা

(১২) দোজখের অগ্নি দূর থেকে তাদেরকে দেখা মাত্র (আক্রোশে ফেটে পড়বে) তার ক্রুদ্ধ গর্জন তারা শ্রবণ করবে।

(১৩) তাদেরকে যখন কয়েকজন কয়েকজন করে একত্রে বেঁধে দোজখের সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা মৃত্যুকে ডাকবে।

(১৪) (তাদেরকে বলা হবে) আজ তোমরা একটি মৃত্যুকে ডেকোনা, বরং অনেক মৃত্যুকে ডাক।

(১৫) হে রসূল! আপনি জিজ্ঞাসা করুন; এটিই কি ভাল? অথবা পরহেজগারদের চিরদিন থাকার জন্যে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা ভাল? সে জান্নাত হলো তাদের প্রাপ্য প্রতিদান এবং প্রত্যাবর্তনের স্থান।

(১৬) সেখানে তারা যা চাইবে, তাই রয়েছে তাদের জন্যে, তারা সেখানে চির দিন থাকবে বলে আপনার প্রতিপালকের অবশ্য পূরণীয় ওয়াদা রয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়তকে মানে না, তারা আসলে কেয়ামতের কথাও অবিশ্বাস করে। আর যারা কেয়ামতকে অবিশ্বাস করে তাদের শাস্তির জন্যে আল্লাহ পাক দোযখ তৈরী করে রেখেছেন। আর এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে দোযখের অবস্থা।

اِذَا رَاَتْهُمْ

যখন দূর থেকে দোযখের অগ্নি তাদেরকে দেখবে তখন দোযখ আক্রোশে ফেটে পড়বে। দোযখের ক্রুদ্ধ গর্জন এবং হুংকার তারা শ্রবণ করবে। ঐ ভয়াবহ দৃশ্য এবং ক্রুদ্ধ গর্জনেই তাদের অবস্থা কাহিল হয়ে যাবে।

আল্লামা বগভী লিখেছেন, একটি বর্ণনায় আছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার ব্যাপারে ইচ্ছা করে কোন মিথ্যা কথা বলে, তার কাজ হল দোযখের আগুনের দুই চক্ষুর মধ্যে নিজের স্থান নিদৃষ্ট করে নেয়া। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন অগ্নিরও কি চক্ষু থাকবে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তোমরা কি শ্রবণ করনি, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন,

اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ

(দোযখের অগ্নি দূর থেকে দেখা মাত্র তার ক্রুদ্ধ গর্জন তারা শ্রবণ করবে)।

مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ

(দূর থেকে)

এ কথাটির ব্যখ্যায় কালবী (রঃ) বলেছেন, একশ' বছরের পথের দূরত্ব থেকে। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, পাঁচশত বছরের দূরত্ব থেকে।

سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا ﴿١٢﴾

অর্থাৎ দোযখীরা দোযখের ক্রুদ্ধ গর্জন এবং হুংকার শুনতে পাবে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, দোযখ থেকে একশত বছরের পথ দুরত্বে থাকতেই পাপীষ্ঠদের উপর দোযখের নজর পড়বে, তখন দোযখ গর্জন করতে থাকবে এবং হুংকার দিতে থাকবে, আর তা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ

তাদেরকে যখন কয়েকজন কয়েকজন করে একত্রে বেধে দোজখের সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা মৃত্যুকে ডাকবে।

সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্য হল অধিকতর শাস্তি বিধান করা, কেননা,

প্রশস্ত স্থানে সামান্য হলেও আরাম হয়।

এবনে আবি হাতেম ইয়াহইয়া এবনে উসায়েদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তিনি এরশাদ করেন, শপথ সেই পবিত্র সত্তার, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ। কাফেরদেরকে দোজখে এভাবে ঠেলে দেয়া হবে যেমন দেয়ালের মধ্যে তারকাটা।

এবনে জরীর, এবনে হাতেম এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে যাদেরকে চিরদিন দোজখে থাকতে হবে, তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করার হুকুম যখন হবে তখন তাদেরকে লৌহ নির্মিত সিন্দুকে বন্ধ করা হবে এবং তার উপর তারকাটা বসিয়ে দেয়া হবে, এরপর ঐ সিন্দুকগুলোকে অন্য সিন্দুকের ভেতর বন্ধ করা হবে। এরপর তাদেরকে দোজখের তলদেশে নিক্ষেপ করা হবে। তাই তাদের কেউ একে অন্যকে আযাব ভোগ করতে দেখবে না।

আবু নাইম এবং বায়হাকীও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

مُقَرَّنِيْنَ

অর্থাৎ ঘাড়ের সঙ্গে তাদের হাত বাধা থাকবে এবং জিঞ্জিরে আবদ্ধ থাকবে।

ثُبُوْر

অর্থাৎ ধ্বংস। এ ব্যাখ্যা করেছেন তফসীরকার জাহ্যাক (রঃ)। দোযখীরা দোযখের শাস্তি শুরু হওয়ার সংগে সংগে আক্ষেপ করবে মৃত্যুর জন্যে। যদি তাদের মৃত্যু হত তবে কত ভাল হত। কিন্তু মৃত্যু তাদের কোন দিন হবে না। এজন্যেই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, একটি মৃত্যু নয়, একটি ধ্বংস নয়; বরং বহু ধ্বংস কামনা কর। দোযখের আজাবের অসহ্য যন্ত্রণার কারণেই তারা মৃত্যু কামনা করবে আর কামনা করলেই তাদের মৃত্যু হবেনা; বরং তাদের প্রতি আযাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

আহমদ, বাজ্জার, এবনে আবি হাতেম বায়হাকী হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সর্ব প্রথম ইবলিস শয়তানকে অগ্নির পোষাক পরিধান করানো হবে। সে ঐ লেবাসকে তার ভ্রুর উপর রেখে চিৎকার আরম্ভ করবে, হায়! আমার ধ্বংস, হায়! আমার ধ্বংস, এবং মৃত্যু কামনা করবে। আর তখনি তাদেরকে বলা হবে, "এক মৃত্যু নয়, অনেক মৃত্যু কামনা কর। কিন্তু এই মৃত্যু কামনার কারণে দোযখের কঠিন আযাব থেকে তাদের রেহাই হবে না।

قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ

পূর্ববর্তী আয়াতে দোযখের আযাবের বিবরণের পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, হে রসূল! আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, আল্লাহ পাকের অবাধ্য নাফরমানদের শাস্তি সম্পর্কে যে বিবরণ এই মাত্র তোমরা জানতে পারলে তা ভাল? নাকি ঈমানদার, পরহেজগার লোকদের জন্যে চিরশান্তির কেন্দ্র জান্নাতের যে ব্যবস্থা আল্লাহ পাক রেখেছেন, তা ভাল? আল্লাহ পাক যা ওয়াদা করেন, তা অবশ্য পূরণ করেন।

আলোচ্য আয়াতের الْمُتَّقُوْنَ শব্দের অর্থ হলো যারা শেরক, কোফর থেকে আত্মরক্ষা করে, প্রকৃত মোমেন হয়, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা না করে, বরং তার পরিপূর্ণ অনুসারী হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এই শব্দটি যেহেতু কাফেরদের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই এ ব্যাখ্যা করা সমিচীন হবে।

جَنَّةُ الْخُلْدِ

এ শব্দটি এ কথার প্রমাণ বহন করে যে জান্নাত চিরস্থায়ী হবে, এবং জান্নাতবাসীগণ চির সুখী হবে।

كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَّمَصِيْرًا

আর ঐ জান্নাত হলো নেককার মুমেনদের নেক আমলের শুভ পরিণতি, আর তা হল তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের এলমে একথাই রয়েছে, অথবা লওহে মাহফুজে মোমেনদের নেক আমলের ফলশ্রুতি স্বরূপ জান্নাত লিপিবদ্ধ রয়েছে, অথবা এর ব্যাখ্যা হল এই যে যেহেতু আল্লাহ পাক মোমেনদের জন্যে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন, আর আল্লাহ পাকের ওয়াদা এমন সুনিশ্চিত যেন তা পূরণ হয়েই গেছে। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে كَانَتْ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ অতীত কালের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ خٰلِدِيْنَ

সেখানে তারা যা চাইবে, তাই রয়েছে তাদের জন্যে, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে অর্থাৎ প্রত্যেকে তার মর্যাদা অনুসারে জান্নাতে নেয়ামত ভোগ করবে, আর তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।

মোত্তাকী পরহেজগার লোকদের জন্যে সব কিছুই রয়েছে জান্নাতে, আর জান্নাতের অনন্ত অসীম নেয়ামত দুনিয়ার জীবনের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হবে না; বরং হবে চিরস্থায়ী।

كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُوْلًا

হে রসূল! এটি হলো আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি যা অত্যন্ত পাকা প্রতিশ্রুতি, যার ব্যতিক্রম হবেনা কখনও।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে আল্লাহ পাকের উপর কারো প্রতি কোন কর্তব্য নেই, কিন্তু আল্লাহ পাক যা ওয়াদা করেন, তা অবশ্যই পালন করেন, তাতে কোন রকম ব্যতিক্রম বা পরিবর্তন হয়না, তিনি যদি তাঁর দয়ায় কোন কথা দিয়ে থাকেন, তবে কখনও তার ব্যতিক্রম করেন না, মোমেনদের জন্যে জান্নাত প্রদান করা তাঁর অনুগ্রহ মাত্র, আর এর প্রতিশ্রুতি যখন তিনি দিয়েছেন তখন তা অবশ্যই সুনিশ্চিত হয়েছে।

مَسْئُوْلًا

অর্থাৎ তাঁর নিকট লোকেরা প্রার্থনা করে, তাঁর নিকট মানুষ আশা করে। তাঁর মহান দরবারে মানুষ দোয়া করে, আর দয়া করে তিনি সে দোয়া কবুল করেন।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ
حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে দান কর দুনিয়াতে কল্যাণ এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর। আর দোযখের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর, আমীন।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ
وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ
عِبَادِيْ هٰٓؤُلَآءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ ﴿١٧﴾ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ
مَا كَانَ يَنْۢبَغِيْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَ
لٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوْا قَوْمًا
بُوْرًا ﴿١٨﴾ فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَ فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا
وَّلَا نَصْرًا وَمَنْ يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيْرًا ﴿١٩﴾
وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ
الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ
لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُوْنَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ﴿٢٠﴾

তরজমা

(১৭) এবং সেদিন তাদেরকে এবং আল্লাহ ব্যতীত তারা যাদের পূজা করত সকলকে তিনি একত্রিত করবেন, এরপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, তোমরাই কি আমার বান্দাহদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলে? অথবা তারা নিজেরাই পথ হারা হয়েছে?

(১৮) তারা বলবে, পবিত্র ও মহান তুমি, তোমার পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করার সাধ্য আমাদের ছিলোনা। কিন্তু তুমিই তাদেরকে এবং তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে ভোগ-সম্পদ দান করেছিলে, অবশেষে তারা তোমার কথাই ভুলে গেছে এবং পরিণত হয়েছে এক ধ্বংস প্রাপ্ত জাতিতে।

(১৯) তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন যে তোমাদের এ উপাস্যরা তোমাদেরকে তোমাদের কথায় মিথ্যা প্রমাণিত করেছে, অতএব, তোমরা শাস্তি প্রতিরোধ করতে পারবেনা এবং সাহায্যও পাবেনা। যে তোমাদের মধ্যে সীমা লংঘন করবে, আমি তাকে কঠিন শাস্তি আস্বাদ করাব।

(২০) আর হে রসূল! আপনার পূর্বে যে সব নবী রসূলগণকে আমি প্রেরণ করেছি, তারা সকলেই তো আহার করত এবং হাটে বাজারেও যাতায়াত করত। হে মানব জাতি! আমি তোমাদের একে অন্যকে পরস্পরের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ করেছি, তোমরা সবর অবলম্বন করবে কি? আপনার প্রতিপালক সব কিছুই লক্ষ্য করছেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে পরহেজগার মোমেনদের উদ্দেশ্যে চিরস্থায়ী জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। আর এ আয়াতে কেয়ামতের দিন মুশরিকদেরকে যে তিরস্কার করা হবে তার উল্লেখ রয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ

হে নবী! আপনি কাফেরদের সম্মুখে সেদিনের কথা স্মরণ করুন, যেদিন আল্লাহ পাক এই কাফেরদেরকে এবং তাদের বাতিল উপাস্যদেরকে একত্রিত করবেন এবং বাতিল উপাস্যদের পূজারীদের সম্মুখে জিজ্ঞাসা করবেন, তোমরাই কি আমার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলে? যে তারা আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কিছুর পূজা করেছে, শেরক, কুফর করেছে, নাকি তারা নিজেরাই পথ হারা হয়েছে?

قَالُوا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِيْ لَنَآ

এ প্রশ্নের জবাবে উপাস্যরা বলবে, পবিত্র তুমি, হে আল্লাহ! তুমি মহিমময়, তুমি ব্যতীত অন্য কাউকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করার সাধ্য আমাদের ছিল না। খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ) কে এবং ইহুদীরা হযরত ওজাইর (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলতো (নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক)। তাই তারা এ প্রশ্নে আশ্চর্যান্বিত হয়ে এ জবাব দেবে। এমনিভাবে যে সব মূর্তিকে কাফেররা পূজা করতো, তাদেরকে আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন বাকশক্তি দান করবেন, তারাও একই জবাব দেবে। যার সার সংক্ষেপ হলো আমরা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করিনি, তারা নিজেরাই নিজেদের দোষে এবং তাদের প্রবৃত্তির বশে পরিচালিত হয়ে নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছে। তারা কোন নছিহত শ্রবণ করেনি, কোন কল্যাণকামী ব্যক্তির কল্যাণ কামনায় আকৃষ্ট হয়নি।

وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ

তাদেরকে এবং তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে যে ভোগ-সম্পদ দান করেছো, তাতে তারা মুগ্ধ-মত্ত-মাতওয়ারা হয়েছিলো, তোমার কথা তারা ভুলে গিয়েছিলো, তুমি মহান দাতা, তোমার দান অনন্ত অসীম, তারা তোমার দান নিয়ে মুগ্ধ ছিলো, আর দাতাকে ভুলে গিয়েছিলো। তোমার প্রদত্ত সুখ-সম্পদের অসদ্ব্যবহার করেছে তারা এবং অন্যায় অনাচারে লিপ্ত রয়েছে।

فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ

আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তখন পাপীষ্ঠদের সম্বোধন করে বলা হবে, তোমরা যাদের পূজা অর্চনা করতে, তোমাদের মুখের উপর তারা কি জবাব দিয়েছে শুনলে তো? অতএব, আজ তোমরা আল্লাহর আযাবকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না, আর তোমাদের কোন সাহায্যকারীও পাবে না। অতএব আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার তোমাদের কোন ব্যবস্থা নেই।

وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١٩

আর তোমাদের মধ্যে যে জুলুম করে তথা আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করে।

এখানে জুলুম অর্থ শেরক, কেননা শেরক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম তাকে আমি কঠিন শাস্তি ভোগ করিয়েই ছাড়ব। আর তা হল দোজখের কঠিন শাস্তি- যে শাস্তি থেকে তারা কখনো রেহাই পাবেনা। সেখান থেকে পলায়ন করাও সম্ভবপর হবে না। আর যদি আলোচ্য আয়াতের জুলুম অর্থ শেরক, কুফর সহ অন্যান্য পাপাচারও হয় তবে পাপ অনুযায়ীই হবে শাস্তি। শেরক ও কুফরের শাস্তি তো চিরস্থায়ী দোজখ, কিন্তু যদি পাপীষ্ঠ মোমেন হয় তবে কিছুদিন দোজখে শাস্তি ভোগ করার পর ঈমানের বরকতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শাফাআতে দোজখ থেকে তাকে নাজাত দেয়া হবে। যেহেতু কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দারিদ্র্যের কারণে বিদ্রুপ করেছিল, তাই আল্লাহ পাক তাদের এ মূর্খতা-প্রসূত আপত্তিকর মন্তব্যের জবাব দিয়েছেন।

এবনে জরীর, সায়ীদ এবং একরামার সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে মোশরেকদের বিদ্রুপের জবাবেই আল্লাহ পাক নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল করেছেন।

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ

আর হে রসূল! আপনার পূর্বে যে সব রসূল আমি প্রেরণ করেছি, তারা সকলেই তো আহার করত এবং হাটে বাজারেও যাতায়াত করত।

প্রিয়নবী (দঃ)–কে সান্ত্বনা

আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেছেন, হে নবী! আপনি নূতন কোন নবী নন, ইতিপুর্বেও আমি অনেক নবী রসূল প্রেরণ করেছি, তারা সকলে মানুষই ছিলেন, তারা পানাহার করতেন; প্রয়োজনে হাটে বাজারেও যেতেন। আর তা নুবওয়তের শানের বরখেলাফও নয়। অতএব, আপনি যদি পানাহার করেন বা প্রয়োজন হাটে–বাজারেও গমন করেন, তাতে আপনার নবুওয়তের ব্যাপারে সন্দেহ করার কোন যুক্তি নেই।

অতএব, দূরাত্মা কাফেরদের আপত্তিকর মন্তব্যে দুঃখিত হওয়ারও কোন ন্যায্য কারণ নেই।

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ط

আর আমি তোমাদের একে অন্যকে পরস্পরের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ করেছি। সম্পদশালীকে দরিদ্র ব্যক্তির জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ করা হয়েছে কেননা, দরিদ্র ব্যক্তি বলে আমার এমন সম্পদ কেন হলো না? এমনিভাবে অসুস্থ ব্যক্তির জন্যে সুস্থ ব্যক্তিকে পরীক্ষা স্বরূপ করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'ফেতনা' শব্দটি পরীক্ষা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যাকে আল্লাহ পাক সম্পদ দান করেছেন, তার জন্যে এটি পরীক্ষা। কেননা, দানের সদ্ব্যবহার না করা হলে এবং দানের শোকর গুজার না হলে এই দানই হবে অবশেষে বিপদের কারণ। আর যে দারিদ্র্য–প্রপীড়িত, তার সবরের পরীক্ষা হচ্ছে, সে এ অবস্থায় সবর অবলম্বন করে কি–না তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত লোকদের ব্যাপারে। কোন উচ্চবিত্ত লোক ইসলাম গ্রহণ করতে যখন ইচ্ছা প্রকাশ করত, তখন দেখত নিম্নবিত্ত লোক আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। তখন এ ব্যক্তি চিন্তা করত, যদি আমি ইসলাম গ্রহণ করি তবে এ নিম্নবিত্ত লোকেদের পেছনেই থাকতে হবে, তাই সে তার ইচ্ছা পরিবর্তন করতো। এভাবে এ ব্যক্তির পরীক্ষা হয়ে যেত। এ ব্যাখ্যা করেছেন তফসীরকার কালবী (রঃ)। তফসীরকার

মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে আবুজেহেল, ওলীদ এবনে আতাবা, আস এবনে ওয়ায়েল এবং নজর এবনে হারেস সম্পর্কে। তারা দেখত, হযরত আবু জর (রাঃ), হযরত এবনে মাসউদ (রাঃ) হযরত আম্মার (রাঃ), হযরত বেলাল (রাঃ) হযরত শোয়ায়েব (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম মুসলমান হয়েছেন। উপরোল্লিখিত কাফেররা বলত, যদি আমরা এখন মুসলমান হই তবে এদের সমান হতে হবে। তাই এটি ছিল তাদের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ কোরায়েশ গোত্রের লোকেরা মুসলমানদের একথা বলে বিদ্রুপ করত, যারা ইসলাম কবুল করেছে, তারা অনেকেই আমাদের গোলাম এবং নিম্নবিত্ত লোক। তাই আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে সম্বোধন করে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

أَتَصْبِرُونَ

সবর অবলম্বনের তাগিদ

আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করেছেন, কাফেরদের এসব আপত্তিকর কথায় তোমরা কি সবর অবলম্বন করবে? যদি সবর অবলম্বন কর তবে সওয়াব পাবে। আর যদি সবর অবলম্বন না কর তবে কষ্ট আরো বেড়ে যাবে, অতএব সবর অবলম্বন করাই কর্তব্য।

কোরআনে করীমের একাধিক স্থানে সবর অবলম্বনের তাগিদ করা হয়েছে। সাফল্য অর্জনের অন্যতম পন্থা হিসেবে সবরের পথ-নির্দেশ করা হয়েছে। এমনকি, পবিত্র কোরআনে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে আল্লাহ পাক সবর অবলম্বনকারীদের সঙ্গে রয়েছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক সবর অবলম্বনকারীদের সঙ্গে রয়েছেন। শুধু তাই নয়; প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিশেষভাবে তাগিদ করে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

হে রসূল! যেভাবে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন রসূলগণ ইতিপূর্বে বিপদাপদে সবর অবলম্বন করেছেন, আপনিও সেভাবে সবর অবলম্বন করুন।

মূলতঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সুদীর্ঘ তেরটি বছর মক্কায়ে

মোয়াজ্জমায় সবর অবলম্বনের যে আদর্শ পেশ করেছেন তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজেও পাওয়া যাবেনা। তিনি একবার বলেছিলেন,

مَا أُوذِيَ نَبِيٌّ مَا أُوذِيتُ

আমাকে যত কষ্ট দেয়া হয়েছে, অন্য কোন নবীকে এত কষ্ট দেয়া হয়নি।

যাহোক, পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা হল সবর। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনিন্দ্য-সুন্দর আদর্শও হল সবর। আর বর্তমান যুগে এ গুণটির অভাব অনেক বেশী। পরবর্তী আয়াতে এ সম্পর্কে রয়েছে আরো তাগিদ।

وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

আর আল্লাহ পাক সকলের আচরণই লক্ষ্য করছেন। কে সবর অবলম্বন করছে, আর কে করে না তা তিনি দেখছেন। প্রত্যেকের আচার অনুযায়ীই হবে তার বিচার।

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ১৫ই নভেম্বর ১৯৯৩ইং মোতাবেক ৩০শে জমাদিউল আউয়াল ১৪১৪ হিঃ রোজ সোমবার বাদ মাগরিব তফসীরে নূরুল কোরআনের অষ্টাদশ খন্ডের রচনা সমাপ্ত হলো। হে আল্লাহ! তোমার বিশেষ রহমতে কবুল কর তফসীরে নূরুল কোরআনকে এবং একে সুসম্পন্ন করার তওফিক দান কর। আর এ মহান কাজকে তোমার এ অধম বান্দার জন্যে সহজ করে দাও, সমগ্র পৃথিবীতে তফসীরে নূরুল কোরআন পৌছিয়ে দাও। যাবতীয় ভুল-ত্রুটি ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! এর বরকতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উসিলায় তোমার রহমত এবং মাগফেরাত দান কর। তফসীরে নূরুল কোরআনের রচনা এবং প্রকাশনায় যারা আমাকে সাহায্য করছে, তাদের জন্যেও তোমার মহান দরবারে রহমতের দোয়া করি। হে আল্লাহ! আমার পিতা-মাতাকে জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চ মকাম দান কর। তফসীরে নূরুল কোরআনের পাঠক বৃন্দের প্রতি রহমত নাজিল কর। হে আল্লাহ! দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে আমাদেরকে কল্যাণ দান কর, তোমার প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আমাদের অগণিত দরুদ ও সালাম পৌছিয়ে দাও, আমীন।

লেখক পরিচিতি

মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম ১৯৩২ সালে কুমিল্লা জেলার বরুরা থানাস্থ বাঘমারা মিয়া বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম আলহাজ্জ মওলবী মোহম্মদ আলী মিয়া সাহেব একজন সুফী সাধক, অত্যন্ত বড় আবেদ, পরহেজগার, দানশীল ও সমাজসেবী ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন স্থানীয় রহমতগঞ্জ মাদ্রাসায়। ১৯৫৫ সালে ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় তিনি ৫ম স্থান অধিকার করেন। সরকারী বৃত্তি পেয়ে পরবর্তী দু'বছর তিনি হাদীস শাস্ত্রে গবেষণা করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে তিনি দেশ-বিদেশে ইসলামের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই আর্ন্তজাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি প্রথম হজ্জ সুসম্পন্ন করেন। ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ সরকারের প্রেরিত উলামা ডেলিগেশনের নেতা হিসেবে তিনি ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া সফর করেছেন। তিনি ইতিমধ্যে ৪০ খানারও অধিক গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁর 'বিশ্ব সভ্যতায় পবিত্র কোরআনের অবদান' শীর্ষক গ্রন্থখানি তিনটি জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।

বাংলা ভাষায় মৌলিক ও বিস্তারিত তফসীর গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁর দীর্ঘ প্রায় দু' যুগের নিরলস সাধনা অবশেষে পূর্ণতা লাভ করেছে। তাঁর রচিত 'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর সর্বশেষ (৩০তম) খন্ড সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি বাংলা ভাষায় ইসলামী গ্রন্থ রচনায় যেমন তৎপর রয়েছেন, তেমনি ইসলামের প্রচার-প্রসারেও নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। বাংলা ভাষা ছাড়াও তিনি উর্দু ও আরবীতে বক্তৃতা করেন। এ ছাড়াও তিনি লালবাগ শাহী মসজিদের ইমাম ও খতীব, মাসিক আল বালাগ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর বোর্ড অব গভর্ণর্সের সদস্য, ইসলমিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ একাডেমিক কমিটির সদস্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত গ্রন্থ রিভিয়্যু কমিটির চেয়ারম্যান, আল বারাকা ব্যাংক লিঃ এর শরীয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান, আল-নাহিয়ান ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দূ ও ফার্সী বিভাগের অধ্যাপক সিলেকশন কমিটির সদস্য সহ বহু মাদ্রাসা, মসজিদ ও সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত রয়েছেন। তিনি ঢাকা রেডিও ও টেলিভিশন থেকে নিয়মিত পাবত্র কোরআনের তফসীর বর্ণনা করেন। তিনি দ্বীন ইসলামের প্রচারের কর্মসূচী নিয়ে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ পৃথিবীর বহু দেশ সফর করেছেন। তিনি তাঁর মৌলিক রচনার জন্যে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পুরস্কারে' (১৯৮৯) সম্মানিত হয়েছেন।

ইসলামের সেবায় নিবেদিত বিশ্বের যে তেরজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদকে (১৪১৩ হিঃ) ১২ই রবিউল আউয়াল উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি আর্ন্তজাতিক সম্মেলনে মিশরের প্রেসিডেন্ট স্বর্ণ পদক (ফার্ষ্ট গ্রেড) প্রদান করেন, তিনিও ছিলেন তাঁদের অন্যতম।